পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৪র্থ ভাগ। } আষাঢ়, শ্রাবণ, সন ১৩০৩ সাল। { ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।

নমো জগদীশ্বরায়।

" যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥ "

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

অর্থ—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদয় জগতে প্রতিষ্ঠিত আছেন; যিনি ওষধিতে (শস্য প্রভৃতি), যিনি বনস্পতিতে (বৃক্ষ প্রভৃতি) সেই দেবতাকে প্রণাম করি, প্রণাম করি।

" যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্র মরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ,
বেদৈঃ সাঙ্গ পদ ক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুর গণা দেবায় তস্মৈ নমঃ। "

(শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কং

অর্থ—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুত প্রভৃতি দেবতা গণ যাঁহার স্তব করেন; সাম গায়কেরা বেদ, সাঙ্গ, পদ, ক্রম ও উপনিষদের সহিত যাঁহার গান করিয়া থাকেন; যোগবিদেরা ধ্যানের দ্বারায় তদ্গত চিত্ত হইয়া আপনা- নকে যাঁহাতে প্রবেশ করান, এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পা- ইতে পারে না, সেই দেবতাকে প্রণাম করি।

" ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নি

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতাম[illegible]।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো [illegible]স্তে॥
নমঃপুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"
(গীতা, ১১শ অ)

অর্থ—তুমি আদিদেব পুরাতন পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম স্থিতি স্থান, জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম, তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি, তুমিই প্রপিতামহ ; তোমাকে প্রণাম, প্রণাম, সহস্রবার প্রণাম, পুনশ্চ অসংখ্য অসংখ্যবার প্রণাম, [illegible]প্রণাম। হে প্রভো! তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে প্রণাম, তোমার সকল দিকেই প্রণাম, হে অনন্ত বীর্য্য অপরিমিত বিক্রম পুরুষ! তুমি সমুদয় ব্যাপিয়া আছ এবং তোমাতেই সকল।

" নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা॥" (চণ্ডী)

অর্থ—যে দেবী সর্ব্ব ভূতে চেতনা রূপে অভিহিতা তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, [illegible]ণাম। যে দেবী সর্ব্ব ভূতে বুদ্ধি রূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, না[illegible] যে দেবী সর্ব্ব ভূতে শক্তি রূপে সংস্থিতা তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রভৃতি মহা[illegible]দেবী সর্ব্ব ভূতে শান্তি রূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, বলিতেছি। শ্রীগৌ[illegible]র্ব্ব ভূতে কান্তি (সৌন্দর্য্য) রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, বা মা ভগবতী বা অন্য কো[illegible]

তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্ব্ব ভূতে দয়া রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

"নমো দেবরায়া নমো জ্ঞান-সিন্ধু।
নমো দীননাথা নমো দীনবন্ধু॥
নমো নির্ম্মলা নির্গুণা নির্বিকারা।
নমো সর্ব্বশক্তি নমো হে উদ্ধারা॥
নমো বিশ্বকর্ত্তা নমো বিশ্বপালা।
নমো মায় বাপা নৃপালা কৃপালা॥
নমো শৌক্য কন্দ নমো বিশ্বভূপা।
নমো সচ্চিদানন্দ শান্তি-স্বরূপা॥ (গুরু নানক)

যাঁহার সত্বাতে এই নিখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি স্ব শক্তিতে এই বিশ্ব ধারণ করিয়া বিশ্ব ব্যাপার সংঘটণ করিতেছেন, সেই শক্তিশালী পরম দেবতাকে প্রণাম করি।

যিনি এই বিশ্বের পিতা হইয়া ইহার জন্ম দিয়াছেন, যাঁহার অমোঘ বীর্য্য প্রভাবে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রবৃন্দ, পৃথিবী, পর্ব্বত, জল, বায়ু, অগ্নি, উৎপন্ন হইয়াছে; যিনি আপনার তেজ হইতে পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, নর নারী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।

যাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইয়াছে, যাঁহার ব্যবস্থাতে সৃষ্টির তাবৎ বস্তু ব্যবস্থিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, সেই রাজাধিরাজ বিশ্বরাজকে প্রণাম করি।

যাঁহার উদরমধ্যে অনন্ত বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার করুণা শত সহস্র রূপে প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের শরীর ও মন রক্ষা করিতেছে, যাঁহার প্রেম-স্তন্য দিবারাত্র পান করিয়া আমরা বর্দ্ধিত হইতেছি, যাঁহার প্রেম হস্ত আমাদের মঙ্গলের জন্য সতত নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই করুণাময়ী, অন্নদায়িনী পরম মাতাকে বার বার প্রণাম করি।

যিনি অন্তরে বাহিরে সদা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন, যাঁহার জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে এই অনন্ত [illegible] রহিয়াছে, যিনি আমাদের প্রত্যেকের মনের চিন্তা ও ভা[illegible] হইতেছেন, সেই অন্তর্যামী, জ্ঞানময় পরব্রহ্মকে [illegible]

শিশিরকুমার (১৬১ পৃষ্ঠা হইতে [illegible]ন যে আমি আবল তাবল

যিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে জ্ঞানাদি শিক্ষা দিতেছেন, আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যাঁহার শিক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানা প্রকার কল্পনা জল্পনা করিয়া থাকি, যাঁহার ...শিক্ষার প্রভাবে এই বিশ্ব শিক্ষিত হইতেছে, সেই ভক্তজনাকাঙ্ক্ষিত পর...মগুরু ভগবানকে প্রণাম করি।

যাঁহার করুণা দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে সদাই ব্যস্ত, যাঁহার করুণা শোকীতাপীর অন্তরে শান্তি বিধান করিতেছেন, যিনি করুণা করিয়া শোকী তাপীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য স্বয়ং তাহাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেই শান্তি স্বরূপিণী আনন্দদায়িনী, প্রেমময়ীকে শতকোটী প্রণাম করি।

যাঁহার করুণাসাগরে এই বিশ্ব ভাসিয়া বেড়াইতেছে, যাঁহার প্রেমের চাপে জীবগণ নিয়ত নিষ্পেষিত হইতেছে, সেই প্রেমঘন, আনন্দঘন পরম জননীকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

যাঁহার পুণ্যপ্রবাহ প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে প্রবাহিত হইয়া অন্তরের পাপ মলিনতা সমস্ত ধৌত করিতেছে, যাঁহার পবিত্র হস্ত আমাদের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই পুণ্যরূপিণী পবিত্র দায়িনী জননীকে প্রণাম করি।

হে প্রভো! তুমিই আমাদের একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, তোমা ব্যতীত আর এই জগতের দ্বিতীয় কেহ নাই। তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং। তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা, পালন কর্ত্তা বিধাতা, গর্ভধারিণী মাতা; তুমিই জ্ঞান দাতা গুরু, পরামর্শদাতা বন্ধু, অভীষ্ট পুরণ কর্ত্তা স্বামী। তুমিই আমাদের সেবক, তুমিই আমাদের ইদং আবার তুমিই আমাদের অহং। তোমার মহিমা কে কীর্ত্তন করিতে পারে? হে অগম্য অপার মহান্ পুরুষ! হে একমেবাদ্বিতীয়ং জীবন্ত জাগ্রত দেবতা! হে বিশ্বপালিকা জগদ্ধাত্রী আনন্দ দায়িনী! তোমাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম, শত কোটী প্রণাম।

...ণাম

কৃপাজলং দেহি মে-...ণাম

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন। ...ম,

না...

প্রভৃতি মহ... ...ম,

বলিতেছি। শ্রীগৌ... ...ছেন,

বা মা ভগবতী বা অন্য কে...

মৃত্যুর পর।

[প্রসাদিসুর—একতালা]

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥

বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চ জনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় এ কথা জানিবার জন্য ব্যগ্র নয় কে? সকল দেশে সকল কালে সকল লোকে এই কথা জানিবার জন্য অস্থির হইয়াছে। মৃত্যুর পর কি হইবে এ কথা জানিতে পারিলে রাজা বোধ হয় তখনই তাঁহার রাজ্যখণ্ড দান করিয়া ফেলেন। এ কথা জানিতে পারিলে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বাল বিধবা বোধ হয় আর তাঁহার স্বামীর জন্য শোক করেন না। এ কথা জানিতে পারিলে, মাতা বোধ হয় স্বীয় পুত্রের অন্তিম শয্যায় বসিয়া স্বচ্ছন্দে ও প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যু লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিতে পারেন। মৃত্যুর পর কি হইব একথা জানিতে পারিলে বোধ হয় উকীল তাঁহার ওকালতী ছাড়েন, রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যান, আর সম্রাট সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এ কথা জানিতে পারিলে সংসার, সমাজ পৃথিবী আর চলে না। এই জন্যই এ কথা এত গুহ্য। এই এ কথা প্রায় সকল লোকেই জানে না আর এ কথা জানি[illegible] লোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তবে কি একথা কেহ[illegible] শিশিরকুমার তা বলি না। এ কথা অনেক লোকে জানে। মৃত্যু[illegible] (১৬১ পৃষ্ঠা হইতে এ কথা, মৃত্যুর পর আমার কি হইবে তাহা[illegible]বেন যে আমি আবল তাবল

যের কি হইবে এ কথা অনেকে জানেন—মৃত্যুর পর আত্মার অর্থাৎ তাহার নিজের কি হইবে এ কথা ও জানেন এমন লোক আছেন কিন্তু সে কেবল ভারতবর্ষেও তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইংরেজী-নবিশ আমার কথা শুনিয়া হয়ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিবেন ও পরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন "সেক্ষপীয়র বলিয়াছেন That undiscovered country from whose bourne no traveller returns তখন যাঁহারা একথা জানেন বলেন তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিব কেন? তাহারা ত বুজরুক্"। আমি বলি বাপু তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই তুমি যেমন আছ তুমি তেমনি থাক কিন্তু দেখিও যেন দুদিন পরে বিশ্বাস করিও না। তোমার সহিত তর্ক করিবার আমার শক্তি নাই, শক্তি থাকিলেও প্রবৃত্তি নাই। তবে একজন ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি যাঁহাকে অনেকে অবতার ও বলিয়া থাকেন তাঁহার একটা কথা বলি। তিনি বলিতেন যে মানুষ একেবারে বিশ্বাস না করিয়া চলিতে পারে না। তুমি অমুকের পুকুরে মাছ ধরিতে যাইবে, যাহারা মাছ ধরিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে মাছ আছে কি না, থাকিলে কি মাছ আছে ও কিরূপ উপকরণে ধরিতে হয়। যে মাছ ধরিয়াছে সে বলিল, তুমি সেইরূপ করিলে, সৌভাগ্য ভাল হয় মাছ পাইলে মন্দ হয় পাইলে না। কিন্তু গোড়ায় তুমি বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিয়াছিলে। ৺রামকৃষ্ণ পরম হংস দেব এই কথা ঈশ্বরে বিশ্বাস উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

ও সমস্ত বড় কথা যাউক। মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় সে ও অতি বড় কথা। গুরু কৃপা করিলে সকলে আপনা আপনি জানিতে পারিবেন। অনেকের হয় ত এখন ও সময় হয় নাই। আমি আজি একটা সামান্য কথার আলোচনা করিব। অনেক দিন হইল অদ্ভুতে বিশ্বাস লিখিয়াছিলাম—অনেক কথা মনে করিয়া। মনের কথা মনেতেই আছে—লেখা হয় নাই। আজি আবার লেখনী ধারণ করিলাম। শেষ হইবে কি না বলিতে পারি না। [illegible]ই হরির ইচ্ছা।

না[illegible] প্রবন্ধের এতটা অনুগ্রহ করিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা এতক্ষণে প্রভৃতি মহা[illegible]য আমি একজন "থিয়োজফিষ্ট"। আমি থিয়োজফিষ্ট বলিতেছি। শ্রীগৌর[illegible]বন্ধ পাঠ বন্ধ হয় এই ভয়ে বলিয়া রাখিতেছি যে

করিতেছি না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে তাঁহাদের হইতেই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের নব-জীবন হইয়াছে।

মৃত্যুর পর অনেকে অনেক রকম হয়েন—আমি বিশ্বাস করি অনেকে ভূত (spirit) হয়েন। ভূত আছে কি না আর ভূতটা কি পদার্থ অদ্য এই কথার আলোচনা করিব।

প্রথমেই দেখা যাউক হিন্দুরা কি বলেন? মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী আর শ্রীমদ্ ভগবদ্-গীতা হিন্দুর বিশিষ্ট আদরের সামগ্রী। ইহাতে ভূতের কোন কথা আছে কিনা দেখা যাউক।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮
শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

গীতা ১৫ অঃ ৮।৯।১০ শ্লোক

অর্থাৎ—জীব যখন শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় কিম্বা পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করে, তখন বায়ুর পুষ্পাদি হইতে সূক্ষ্মাংশ গন্ধ গ্রহণ করিয়া গমনের ন্যায় পূর্ব্ব শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকলকে লইয়া যায়। ৮

জীব, এই সকল ইন্দ্রিয়ে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বকে ও মনে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় ভোগ করে। ৯

দেহান্তর গমন কারী অথবা সেই দেহস্থিত অথবা বিষয় ভোগী কিম্বা ইন্দ্রিয়াদিগণ সংযুক্ত জীবকে মূঢ়জনেরা দেখিতে পায় না, পরন্তু জ্ঞানচক্ষু সমন্বিত ব্যক্তিরাই দেখিয়া থাকেন। ১০॥

এখন চণ্ডী দেখুন (দেবী কবচ)

সন্নদ্ধাঃ কুলিকা নাগাঃ ডাকিন্যশ্চ মহাবলাঃ।
অন্তরীক্ষচরা ঘোরাঃ শাকিন্যশ্চ মহাবলাঃ॥
গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। ... শিশিরকুমার
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবা ... (১৬১ পৃষ্ঠা হইতে
... বন যে আমি আবল তাবল

মা স্বয়ং বলিয়াছেন—

রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্।

* *

রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম ॥

সোজা সংস্কৃত বলিয়া অনুবাদ করিলাম না। কিন্তু ব্যাপার বড় ভয়ঙ্কর। শুধু ভূত নয় দলকে দল আছে রকম রকম আছে—ডাকিনী, শাকিনী, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ভৈরব। অবিশ্বাস-বীর পাঠক বলিবেন ব্যাপারটা কি ? এত আছে নাকি ? এ যে ত্রাহি মধুসূদন ব্যাপার। যখন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেই এই ব্যাপার তখন সাধক চূড়ামণি রাম প্রসাদ যে ভূতের মর্ম্ম বিলক্ষণ জানিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কত আনন্দে ভূতের কথা লিখিয়াছেন দেখুন—

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা

এলোকেশে কে শবে এলোরে বামা।
নখরনিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘনতনু, মুখ হিমধামা ॥
নব নব সঙ্গিনী, নবরস রঙ্গিনী, হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হতরিপু সমা ॥
ভৈরব ভূত প্রমথ গণ, ঘনরবে রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম্ ববম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা ॥
ভবভয় ভঞ্জন হেতু কবিরঞ্জন, মুঞ্চতি করম সুনামা।
শ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ॥

সাধকপ্রবর দেব রামপ্রসাদ শব সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁর শব-সাধনার গান শুনুন—

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালী
বব বম্ বাজাইয়া গাল ॥
ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পার্শ্ব শূন্যাগারে
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।

না... প্রভৃতি মহা... বলিতেছি। শ্রীগৌ... বা মা ভগবতী বা অন্য কো...

অর্দ্ধচন্দ্র শির ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে
আপাদ লম্বিত জটাজাল॥

শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥

যেজন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্রসিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে
কালীর চরণ করে ঢাল॥

পাঠক মহাশয় এমন মনে করিবেন না যে ভূতপ্রেত গুলা শিব ও দুর্গার গণ তাই শাক্তের আদরের সামগ্রী বৈষ্ণবের ধর্ম্মের সহিত উহাদের কোন সংশ্রব নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই শ্রাদ্ধ মানিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধটা কি? ভূতের বা প্রেতের আহারীয় দ্রব্যাদি দিয়া প্রীতি সম্বর্দ্ধন করা। ফরাশিশ দার্শনিক কোমৎ শ্রাদ্ধ মানিতেন। এখন বোধ হয় ইংরাজী-নবিশের শ্রাদ্ধ মানিতে আপত্তি হইবে না।

ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ
পূর্ব্বিণেভির্দ্দত্তা স্মভ্যং দ্রবিণে হ ভদ্রং রৈঞ্চ নঃ
সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত

ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি।

শিশিরকুমার
ওঁ অপহতা স্থরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ (১৬১ পৃষ্ঠা হইতে
ন যে আমি আবল তাবল

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ। ওঁ
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীর্মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ
পার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো
বনস্পতির্মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু
নঃ॥ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥

* *

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম, ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্
ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-নৈর্বান্ন সিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি, তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ
শেষোক্ত মন্ত্র দুইটীর অর্থ বলিতেছি।

মদীয় বংশে লৌকিকাগ্নি দ্বারা কিম্বা যে প্রাণিগণ যে কোন প্রকারে দগ্ধ হইয়াছেন অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণাদির অসদ্ভাবে সমান পিণ্ডোদক ভজনা করেন নাই এবং দুর্ভিক্ষ মবকাদি মরণ জন্য দাহকে লাভ করেন নাই, তাঁহারা মদ্দত্ত বিকিরণ (বিক্ষিপ্ত) অন্ন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গাদিতে গমন করুন।

এবং যে জীবগণের মাতৃ পিতৃ প্রভৃতি শ্রাদ্ধদাতা বান্ধবগণ কেহই বিদ্যমান নাই, তাঁহাদিগের তৃপ্তি লাভের নিমিত্ত আমি পৃথিবীতে অন্নদান করিতেছি, তাঁহারা এই অন্ন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করুন।

আর সংস্কৃত উদ্ধার করিবার আবশ্যকতা নাই। শ্রাদ্ধকারী আরো বলেন—"পিতা আপনি এই মদ্দত্ত জল দ্বারা শুদ্ধিলাভ করুন। যাঁহারা এই শ্রাদ্ধ কর্ম্মে আপনার পশ্চাৎ ভোজন করেন, এবং আপনি যাঁহাদিগের পশ্চাৎ ভোজন করেন, তদনুযায়ী তাঁহাদিগের ও আপনাব এই অন্ন। হে-পিতৃগণ মদ্দত্ত পিণ্ড লাভ করিয়া আপনারা হর্ষযুক্ত হউন এবং মৎকর্ত্তৃক [illegible] প্রদত্ত স্বীয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়া বৃষের ন্যায় বলশালী হউন।
না [illegible]
[illegible] (বিপ্রদেহস্থ হইয়া ভোজন করেন বলিয়া) এবং পিতৃদেহ
প্রভৃতি মহা [illegible]
[illegible] বলিয়া অমৃত অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্মশীল ও সত্যশালী পিতৃগণ!
বলিতেছি। শ্রীগৌ [illegible]
[illegible] হউক কিম্বা অকৃতই হউক উহা রক্ষা করুন
বা মা ভগবতী বা অন্য কো [illegible]

তৃপ্তি লাভ করিয়া দেবগণ যে মার্গ দ্বারা গমন করেন, সেই প্রসিদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া আপনারা স্বস্থানে গমন করুন।

পুণ্য ভূমি গয়াক্ষেত্রে শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয়—প্রেতশীলায় পিণ্ডদান করিলে জীবের প্রেতত্ব নষ্ট হয় এসমস্ত বিষয় আর বিস্তার করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই।

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে মৃত্যুর পর জীব অপর একটি দেহ ধারণ করেন। ইংরেজীতে সে দেহকে spirit বলে। Spirit শব্দের অর্থ বায়ু (spirare, to breathe)। আর আমরাও বলি ভূত হাওয়া মাত্র। এই যে হাওয়ার জীব, শ্রাদ্ধের মন্ত্রে দেখা যাইতেছে, ইহার থাকিবার স্থান আছে, পৃথিবীর জীবের ন্যায় লিপ্সা প্রভৃতি সকলই আছে। এখন গীতার শ্লোকের সহিত মিলাইয়া লউন। সকলই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে। মৃত্যুর পর ও জীব ইন্দ্রিয় লইয়া যায়, তদ্দ্বারা ও "মনে" অবস্থান করিয়া বিষয় ভোগ করে। আর মূঢ়জনেরা অর্থাৎ তুমি আমি জড়চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেখিতে পায় না, পরন্তু জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থাৎ যোগী, ঋষি, সাধক প্রভৃতি ব্যক্তিরা দেখিতে পান। জড়চক্ষে কেন দৃষ্টি হয় না আর যোগীরা বা সাধক গণ কেন দেখিতে পান, তাহা বড় গুহ্য কথা। পাঠকের জানিবার চেষ্টা থাকিলে বা সাধন মার্গ অবলম্বন করিলে বা গুরু কৃপায় পরে বুঝিতে পারিবেন। এখন এমন এক শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই উহার মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে তাহা বুঝা যায়। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নবশাখ ইহা যদি না মান, মৌলভী, মুন্সী, সেক্, অথবা ডিউক, মার্কুইস্, কমন, বেগার ইহা ধরিয়া বুঝিতে পার। ভিন্ন শ্রেণী স্বীকার করিলেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ধর্ম্ম স্বীকার করা হইল। স্থূলকথায়, দেব-প্রতিম উচ্চ শ্রেণীর আত্মা হইতে ক্রমশ নামিয়া বিভিন্ন আলোকপ্রতিম দেহ, আবার তথা হইতে নামিয়া আসিয়া স্থূল-দেহধারী প্রেত পর্য্যন্ত এখন মনে মনে কল্পনা করা যাইতে পারে। যাহা কল্পনা করিতে বলিতেছি তাহা কিছুদিন পরে স্বয়ং দেখিয়া আবার সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন।

এই যে স্পিরিটের তত্ত্ব ইহাই ইংরাজীতে স্পিরিচুয়া[illegible] শিশিরকুমার ও আমেরিকায় ইহার হু হু করিয়া উন্নতি হইতেছে[illegible] ১৬১ পৃষ্ঠা হইতে না মানিলে হিন্দুধর্ম্ম মানিবার যো নাই। [illegible]বেন যে আমি আবল তাবল

জানিতে পারিয়াছিলেন, আর সেই জন্যই তাঁহাদের উদ্ভাবিত সাধন মার্গ তাঁহাদিগকে ঈশ্বর সমীপে লইয়া গিয়াছে। জগতের যত কার্য্য তাহা সমস্তই অশুদ্ধ-আত্মা জীব গনের দ্বারা বা শুদ্ধ-আত্মা আত্মাগণের দ্বারা সংসাধিত হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়াই আর্য্য ঋষিগণ প্রাত্যহিক কার্য্য হইতে দুরূহ সমাজ শাসন সাম্রাজ্য সংস্থাপন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য এবং নৈতিক জগতের অদ্ভুত সৃষ্টি দেব-সম্মিলন পর্য্যন্ত সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা নিজ দোষে অন্ধ হইয়া দেখিতে না পাইয়া অকারণ অবিশ্বাসকূপে মণ্ডূক হইয়া আছি। শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী আমেরিকায় ৪ সহস্র ব্যক্তিকে হিন্দু করিয়াছেন শুনিলে পাঠক মহাশয় চমকাইয়া বোধ হয় এই প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার বা ৺রাজকৃষ্ণ মিত্রের শোকবিজয় পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইবেন। পাঠক মহাশয়, ভূতের অস্তিত্ব কেবল বিশ্বাস করিয়া থাকিতে হইবে না স্বয়ং ভূত দেখিতে পাইবেন। একটা কথা ভাবুন। সকল দেশের, কি সভ্য কি অসভ্য, ভাষায় ভূত পরিচায়ক একটা শব্দ আছে। আর আবহমান কাল সকল দেশের লোক ভূত ভূত করিয়া আসিতেছে। এরূপ কল্পনা দেশে দেশে কালে কালে কেন হইল? ভিত্তি কি কিছুই নাই?

বলিয়াছি ভূত বা স্পিরিট না মানিলে হিন্দু হইবার যো নাই। স্থূলত শাক্ত বৈষ্ণব লইয়া দেশ। উভয় তন্ত্রের উভয় গ্রন্থে অর্থাৎ চণ্ডী ও গীতায় ভূত দেখাইয়াছি, উভয়ে শ্রাদ্ধ মানে, বুঝাইয়াছি, শক্তিসাধক রামপ্রসাদের কথা বলিয়াছি, বৈষ্ণবের কথা বলা হয় নাই, বলিতেছি। বৈষ্ণবেরা "আবেশ" মানেন। ইহার অর্থ কি? যেমন ভূতে পায় তেমনি উচ্চদরের শুদ্ধ-আত্মা বা দেবতা পাইলে যে ভাব হয় তাহাকে "আবেশ" কহে। এই "আবেশ" বা "ভাবাবেশ" না মানিলে বৈষ্ণব হইবার যো নাই। ভূতে পাওয়া না বলেন স্পিরিট পাওয়া বলিতে হইবে। অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণ অবতার বলেন, অনেকে অংশ-অবতার বলেন, আবার অনেকে একজন উচ্চ ভগবদ্ভক্ত বলেন। যিনি যাহাই বলুন কেহই তাঁহাকে চোর, অসরল, বুজরুক্ বলেন না। [illegible]রুকি করিবার স্থল তখন নদীয়া ছিল না। অদ্বৈত সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মহা[illegible]ত্মা পণ্ডিত গণ যাহা দেখিয়াছেন এখন সেই আবেশের কথা বলিতেছি। শ্রীগৌরা[illegible]ঙ্গের ভাবাবেশ হইত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বা বলরাম বা মা ভগবতী বা অন্য কো[illegible] দেব দেবী গৌরাঙ্গের দেহে অধিষ্ঠান করিতেন।

গৌরাঙ্গ তখন গৌরাঙ্গ থাকিতেন না, তিনি, তিনি হইতেন। কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া গেলে আবার প্রকৃতিস্থ হইতেন। ভূত স্পিরিট শুদ্ধাত্মা দেবতা না মানিলে এই রহস্য ভেদ করিবার যো নাই। আবেশ সরিয়া গেলে গৌরাঙ্গ স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিতেন "আমি কি ঘুমাইয়া ছিলাম" "আমি ত কোন প্রলাপ বকি নাই" ইত্যাদি। শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইলে তিনি স্বয়ং বিষ্ণু খট্টায় বসিতেন ও আপনাকে ভগবান বলিয়া পরিচয় দিতেন। সহজ অবস্থায় গৌরাঙ্গ বিষ্ণু খট্টায় বসিতে পারিতেন না বা আপনার মাতা শচী দেবীর মাথায় বা অদ্বৈতের মাথায় পা দিতে পারিতেন না। এই আবেশ বা ভাবাবেশের কথা প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। তাহা উদ্ধার করিবার স্থান, ও সময় নাই। একটি নমুনা দিলাম

অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্য ভাবে।
ক্ষণেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশি পুনঃভাঙ্গে॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এদিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিল প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খট্টায় যেন না জানিয়া॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিল প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়া॥. (চৈতন্য ভাগবত)

* *

কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা।
তখন বুঝায় যেন শ্রীদর্ভের বালা॥
ভাবাবেশে যখন অট্ট অট্ট হাসে।
মহা চণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥

* *

মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তনপান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হয়ে॥ ঐ

এইরূপ গৌরাঙ্গ লীলা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (১৬১ পৃষ্ঠা হইতে ১৯০ পৃষ্ঠা দেখ)। পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমি আবল তাবল

বকিতেছি না। কিন্তু এরূপ বলাতে পাঠকের মন উঠিবে না ও তৃপ্ত হইবে না, অথচ আমার ও এত পৃষ্ঠা পুস্তক এই স্থলে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা বা অধিকার নাই। কিন্তু বলরামদাসের ন্যায় রসিক লোকে চক্ষের উপর রসভঙ্গ হওয়া সহ্য করিতে পারিবেন-না বলিয়াই মনে করি। অতএব মানসে শ্রীপাদ বলরামের অনুমতি লইয়া 'পরকীয় পরকায়ার রস মোক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম। " মহাভারতে দেখিবেন, যুধিষ্ঠির বনবাসী বিদুরের পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলে তিনি তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিলেন, চাহিয়া আপন দেহ ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে আমাদের শাস্ত্রে পরকায়া প্রবেশ শক্তির কথা সর্ব্ব স্থানে উক্ত আছে। সে কথার অর্থ এই। এই দেহটি একটি গৃহ মাত্র আর অভ্যন্তরে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা বাস করেন। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা প্রাণ পান আর দেহ দ্বারা তিনি অর্থাৎ জীবাত্মা জড় জগতের সহিত পরিচয় করেন। জীবাত্মা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শ্রবন দর্শনাদি করিয়া জড় জগৎ হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একটি স্বতন্ত্র জীব সৃষ্ট হয়েন। এই পৃথকীকৃত জীবটি তাহার দেহরূপ গৃহ ভঙ্গ হইলে অন্য স্থানে গমন করেন। সে স্থান তাঁহার দেহেন্দ্রিয়ের গোচর নহে কিন্তু জীবাত্মার গোচর। এই গেল সর্ব্বসাধারণ নিয়ম।

কিন্তু এমন ও হইতে পারে যে পৃথকীকৃত জীবাত্মার এ জগতে কোন কর্ম্ম করিতে বাকি আছে, কি ইচ্ছা আছে, তাঁহার দেহ নাই। তখন তাঁহার অন্যের দেহের সাহায্য লইতে হয়, ইহাকে বলে "ভূতে পাওয়া" বা সাধু ভাষায় "আবেশ" * * দেহশূন্য জীব মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু সর্ব্বদা পারে না কখন কখন পারে। * * স্ত্রীলোকের বিরোধশক্তি অল্প। কোন একটি দেহশূন্য জীবে হঠাৎ তাহার দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া আর ছাড়িল না। সেই দেহশূন্য জীবের প্রেতভূমি ভাল লাগে নাই। * * সে যে দেহ আশ্রয় করিয়াছে উহা ছাড়িবে কেন? অতএব তাহাকে নানা উপায়ে দেহ হইতে বিতাড়িত করিতে হয়। তাহাকে বলে ভূত ঝাড়ান। [illegible] দেহ ভঙ্গ হয় তখন জীব দেহশূন্য হইয়া অন্য স্থানে গমন করে। কখন যোগ [illegible]ধন শক্তিতে কেহ বা দেহ হইতে আপনার আত্মা বাহির করিতে পারেন, আ[illegible]র উহা দেহে প্রবেশ করাইতে পারেন। যখন তাঁহার আত্মা দেহ হইতে বাহির করেন তখন তাহার দেহ মরিয়া পড়িয়া থাকে,

আবার যখন তাঁহার আত্মা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সে দেহ বাঁচিয়া উঠে। এইরূপে যোগী বলে কোন মনুষ্য দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়া অন্য দেহে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাকেই বলে পরকায়াপ্রবেশ। *

এ সমস্ত নিগূঢ় বিষয় বুঝাইতে তর্কের শক্তিতে কুলায় না। * সাধন ভজন কর ও সাধু সঙ্গ কর। তখন অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে যাহা তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি দেখিতে পাওনা, তাই বলিয়া যাহারা বলে দেখিতে পাই তাহাদের কথা দম্ভের সহিত উড়াইয়া না দিয়া, স্বভাবের প্রকৃতি ধরিয়া শ্রীভগবানের অপরূপ মনুষ্যসৃষ্টি অনুশীলন ও অনুসন্ধান কর। * * পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে সমুদয়ের ভিত্তিভূমি এই আবেশ। বাইবেলে এই আবেশের কথা আছে। মহম্মদ স্বয়ং আবিষ্ট হইতেন বুদ্ধদেব ও হিন্দুদের ত কথাই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় এই আবেশের কথা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় দেখিলাম যে এই পরকায়া প্রবেশের কথা সর্ব্ব শাস্ত্রে যেরূপ লেখা আছে এবং আমেরিকাতে যে সমুদয় কাণ্ড হইতেছে তাহারই প্রমাণ উহাতে রহিয়াছে। গৌরাঙ্গলীলার প্রমাণ গুলি দেখিলে সে গুলি যে সত্য তাহা আপনা আপনি মনে বিশ্বাস হয়।

(১ম) ঘটনা গুলি শুনিলেই বুঝা যায় উহা কল্পনার কথা নহে

(২য়) গৌরাঙ্গলীলা যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা সাধু

(৩য়) যাঁহারা ঐ লীলা লিখিয়াছেন তাঁহারা শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং তিনি অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা লিখিতে কখনও সাহস পাইতেন না।

অমিয় নিমাই চরিত হইতে, দেখিতে দেখিতে অনেকটা উদ্ধার করিয়া ফেলিলাম। তা যাউক, কথাটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

* এখন পাঠক মহাশয় বোধ হয় স্পিরিট কি ভূতে আপনার আর অবিশ্বাস নাই। শিশির বাবু যাহা বলিয়াছেন আমি ও প্রথমে প্রকারান্তরে বলিয়াছি সাধন ভজন করুন তাহা হইলেই সব হইবে। সাধন ভজনের জন্য শ্রীগুরুদেবের প্রয়োজন। ভগবানের এমনি মহিমা আমায় "গুরু দাও" বলিয়া কাতরে প্রাণ মনে ডাকিতে পারিলেই কিছু দিন পরে বাটিতে বসিয়া গুরু দেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বনে, পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিতে যাইতে হয়

না। ইহাব ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আসুন পাঠক, এক্ষণে এই অদ্ভুত ব্যাপার, স্পিরিট বা ভূত বা দেহশূন্য জীব বা শুদ্ধাত্মা, যিনি সৃষ্টি ক...ছেন তাঁহাকে ও শ্রীগুরুদেবকে কোটী কোটী প্রণাম কবিয়া প্রবন্ধ শেষ ক...। সব কথা বলা হইল না। সময় পাইলে বলিব। গীতায় আরম্ভ করিয়াছি, গীতায় শেষ করিলাম

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

গীতা ৯ম অঃ ২৫ শ্লোক।

অর্থাৎ—(মৃত্যুর পর)—

দেবযজ্ঞপরায়ণ বা দেবার্চ্চণাকাবিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃযজ্ঞ-পরাযণ বা শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃগণকে অর্চ্চনাকারিগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, ভূতযজ্ঞপরায়ণ বা ভূত পূজাকারীগণ ভূত লোক প্রাপ্ত হন, আর আমাপরায়ণ বা পবমাত্মনিষ্ঠগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীভগবান স্বয়ং—ভূত মানেন, আর আপনি মানিবেন না?

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

অনুরোধ।

১

কে তুমি দেবতা নাকি
কেন ধীরে চাহিছ ?
করুণ নয়নে কেন
এত সুধা ঢালিছ ?

২

জগতে আমার নাই
'আপনার' বলিতে,
আমার ব্যথায় হেথা
নাহি কেহ কাঁদিতে ?

৩

যার পাশে যাই আমি
করুণার আশেতে,
সে দেয় ভাঙ্গিয়া প্রাণ
উপেক্ষার আঘাতে।

৪

উত্তপ্ত নিশ্বাসে তায়
বুক যায় ফাটিয়া,
মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে
আঁখি যায় ভাসিয়া।

৫

কেহত বারেক তাহা
ফিরিয়াও চাহেনা,
আপনা আপনি কাঁদি
পেয়ে বড় বেদনা।

৬

তুমি কেন কাছে এলে
প্রেমস্নেহ লইয়া,
তুমিকি প্রাণের ক্ষত
দিবে মোর মুছিয়া ?

৭

বড় অভাগিনী আমি
তাই দয়া করিয়া,
এসেছ কি দিতে মোরে
স্নেহ প্রেম ঢালিয়া ?

৮

চাহিনা ও প্রেম স্নেহ
যাও তুমি লইয়া,
রেখনা আমায় আর
মায়া ডোরে বাঁধিয়া।

৯

তোমারি মতন হায়
একদিন আসিয়া,
সে দিছিল স্নেহ প্রেম
নীরবেতে ঢালিয়া।

১০

তারপর কোথা গেল
মোরে একা ফেলিয়া,
তাহারি বিরহে আমি
সদা মরি কাঁদিয়া।

১১

তুমিও তাহার মত
প্রেম স্নেহ ঢালিয়া,
পাছে গো চলিয়া যাও
অভাগীরে ভুলিয়া,

১২

তোমার ও প্রেম তাই
ভয়ে নিতে চাহিনা,
নিয়ত কেঁদেছি আর
কাঁদিতে যে পারি না।

১৩

না না না-দাও গো দাও
প্রেম স্নেহ ঢালিয়া,
তব প্রেম স্নেহে যাব
সব জ্বালা ভুলিয়া।

১৪

প্রেমপ্রীতি দিয়া সদা
পূজিব ও চরণ,
তুমি যেন ফেলি' মোরে
যেওনাক কখন।

১৫

এসেছ স্নেহের আশে
জানি ভাল বাসিতে,
ভালবাসা দিব, কিন্তু
রেখ মোরে চিতেতে।

১৬

এই অনুরোধ মোর
রেখ যেন ভুলনা।
সে মোরে ফেলিয়া গেছে
তুমি যেন যেওনা।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

বিয়োগবেদনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাল্যের সরলতা।

বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে মনে এক মহা চিন্তা উপস্থিত হইল—যদি মনের মত স্ত্রী না হয় তবে ত আজীবন কষ্ট পাইতে হইবে, ভবিষ্যতে এই লতিকা যদি বিষলতায় পরিণত হয় তবে ত আমার সর্ব্বনাশ হইবে। কেহ কেহ বলিলেন সদ্বংশের কন্যা কখনও অসৎ হয় না, তোমার ভাবনা কি? আমারও সে সংস্কার ছিল, তথাপি মনের ভাবনা সম্পূর্ণ গেল না। এক এক বার মনে হইতে লাগিল কেন ভাবিতেছি; বিধাতা যাহা করেন তাহাই হইবে, তিনি আমাকে কখনই ভাসাইয়া দিবেন না। তথাপি দুর্ব্বল মন সুস্থির হইল না, ভাবনাশূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না।

একদিন অপরাহ্ণে একাকী ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। কোন উদ্দেশ্য নাই, অথচ চলিতেছি, চলিতে আনন্দ বোধ হইতেছে। বুদ্ধির অগম্য প্রদেশে, চিন্তার অভাবনীয় রাজ্যে যখন অন্তরাত্মা কি যেন পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন আপনা হইতে ছুটিতে থাকে, মিলন হইবে কি না তাহা জানে না অথচ মিলনের পথে চলিতে থাকে। এ পথে ত পূর্ব্বে কখনও আসি নাই, আজ কেন এ পথ কতই পরিচিত কতই তৃপ্তিকর বোধ হইতেছে। বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া কল্পনা ছুটিতেছে, উল্লাস ও উৎসাহে মন ভাসিতেছে। যাও মন! একবার জীবনের চিরসঙ্গিনীকে দেখিয়া আইস। ঐ ময়ূরাক্ষী নদী স্বচ্ছতোয়া কেমন আনন্দ প্রবাহে বহিয়া যাইতেছে; উহারই তটে সন্ধ্যাসমাগমে তোমার প্রাণপ্রতিমাকে দেখিতে পাইবে, অথবা ঐ যে তালপুকুরে কত পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে তাহারই [illegible] তোমার প্রেমপদ্মকে বিকশিত দেখিবে। বিলম্ব করিওনা—ঐ দেখ সন্ধ্যার ছায়া আসিতেছে, অচিরাৎ বিশ্বচরাচর গ্রাস করিবে, তোমার মনোরথ বিফল হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে কোথা হইতে কল্পনা আসিয়া মনকে ভাসাইয়া লইয়া যায় আমি কি সেই কল্পনায় ভাসিয়া যাইতেছি? [illegible]

উল্লাসে চিত্ত উল্লসিত হয়, আমি কি তাহাতেই প্রমত্ত হইয়াছি? মিলনের আশায় মন অবিরাম ছুটিতে থাকে আমি কি সেই মিলনের প্রত্যাশায় প্রেমতরঙ্গে ভাসিতেছি? জানি না কেন আজ এত উৎসাহে জীবন পূর্ণ হইতেছে।

আমি উৎসাহভরে চলিতেছি, ক্রমাগত চলিতেছি। সম্মুখে তালপুকুর, তাহারই তীরে আসিয়া বসিলাম। এ কি দৃশ্য! এ বালিকা কে? এমন সুন্দর গঠন ত কখন দেখি নাই। শ্যাম বর্ণে এত শোভা কোথা হইতে আসিল? স্বাস্থ্যের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্যই কি তুমি অবতীর্ণা হইয়াছ? গৌরবর্ণ—চম্পকনিন্দিত বর্ণ—না হইলেও মন হরণ করা যায় ইহাই কি দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছ? না, না তোমার ঐ মুখ খানিতে স্বর্গের আভা দেখাইবার জন্য তুমি আসিয়াছ। সরলতা ও কোমলতার খনি! তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আমি তোমার ঐ মুখ খানি দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করি। যাও—তুমি কেন দাঁড়াইবে? আমি তোমার চিত্র হৃদয়ফলকে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছি—সেই মুখখানি এখনও আমার নয়নপথে ভাসিতেছে।

সহসা পার্শ্বে দেখিলাম এক বৃদ্ধা উপস্থিত। "বাবা! তুমি কে? এখানে বসিয়া কেন?"

আমি। আমি অনেক দূর হতে এসেছি, রেতে আর কোথায় যাব, এখানে কেউ অতিথ করে কি?

বৃদ্ধা। কেন বাবা! চৌধুরীরা বড় লোক, উহাদের বাড়ী যাও, খুব আদর করিয়া রাখিবে।

আমি। চৌধুরী মহাশয় কোথায়?

বৃদ্ধা। তিনি ডুমকায় চাকরী করেন। বাড়ীতে সকলেই আছে।

আমি। চৌধুরীরা বড়ই কৃপণ, উহাদের নাম কেহ করে না। উহারা কি আমাকে থাক্‌তে স্থান দিবে?

বৃদ্ধা। সে কি বাবা! চৌধুরীদের নাম কল্লে সে দিন আর দুঃখ কষ্ট থাকে না। উহাদের মত লোক কি আর আছে? আমরা [illegible] দুঃখী উহাদের খেয়ে মানুষ।

আমি। গিন্নী নাকি বড়ই দুর্দ্দান্ত—কর্ত্তা গিন্নীতে মোটেই বনে না।

বৃদ্ধা। রাম! রাম! রাম! ও কথা মুখেও আনিও না। কর্ত্তা

সদাশিব আর মা ঠাকুরাণ যেন অন্নপূর্ণা। অমন সুখের সংসার কোথায়ও দেখি নাই।

আমি। কর্ত্তা সদাশিব তাহা শুনেছি, তবে গিন্নী বড় কুঁড়ে—কিছুই দেখা শুনা করেন না, এই জন্য কর্ত্তা এত টাকা আনিলেও সংসার কুলাইতে পারেন না।

বৃদ্ধা। সে কি বাবা! কে এমন দুর্নাম রটিয়েছে? তাহার কখনও ভাল হইবে না। অমন পাকা গিন্নী কি আর আছে? আমার বয়স এই তিনকুড়ি দশ বছর হয়েছে আমরা মাচ্ বেচ্‌তে কত জায়গায় যেয়ে থাকি। এ বাড়ীর গিন্নীর মত গিন্নী কোথায়ও দেখি নাই। এত বড় সংসার সামলান কি কম কথা?

আমি। তুমি বুঝি ঐ বাড়ী চাকরী কর তাই এত সুখ্যাতি করিতেছ?

বৃদ্ধা। না বাবা! তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার কোন অভাব নাই। তুমি বামনের ছেলে—ভদ্রলোকের ছেলে, তোমাকে কি মিথ্যা বলিতে পারি? কোন শত্রু মিছে করে তোমার কাছে দুর্নাম রটিয়েছে।

আমি। দেখ আমি বামনের ছেলে, আমার কাছে মিছা কথা বলিও না। আমি শুনিয়াছি—চৌধুরী মহাশয়ের কন্যারা বড় চঞ্চলা তাহাদের এত দোষ যে তাহারা দুদিনও স্বামিঘর করিতে পারে না।

বৃদ্ধা। (জীব কেটে) ছি! বাবা ও কথা মুখেও আনিওনা। ভাল বাপ মার ছেলেপিলেরা কি মন্দ হয়? ওদের মত লক্ষ্মী কি আর আছে?

আমি। ছোটটী শুনেছি বড়ই দুষ্ট, বড়ই রাগী। পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-দের সঙ্গে খেলিয়া বেড়ায়।

বৃদ্ধা। (জীব কেটে) রাধামাধব! যে এ কথা বলেছে তাহার মাথায় বজ্র-পাত হবে। ওদের বাড়ীর আদব কায়দা দেখ্‌লে চোখ জুড়ায়। ছোট কন্যাটীর সম্বন্ধ কলিকাতার একটী ভাল জামাইয়ের সঙ্গে হচ্চে। কন্যাটী যেমন ভাল, তাহাতে উহার নিশ্চয়ই ভাল হবে। ঐ যে কন্যাটী এই মাত্র গেল—তুমি কি তাকে দেখ নাই? বড় লক্ষ্মী, বড় শান্ত।

সহসা শরীর কণ্টকিত হইল, আনন্দমাখা মধুর ভাবে চিত্ত পূর্ণ হইল। যে মূর্ত্তি নয়নের এত তৃপ্তি বিধান করিয়াছিল তাহারই সঙ্গে

আমার বি[illegible]হের প্রস্তাব চলিতেছে; ইহাতে উল্লাসের সীমা রহিল না। বৃদ্ধার [illegible] আর কথা বলিবার ইচ্ছা বা আবশ্যকতা রহিল না। মনের উ[illegible] ও উৎসাহে ফিরিয়া আসিলাম। সেই মুখ খানি সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলাম। নয়ন নিমীলিত করিলে সে মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল ভাবে প্রতিভাত হইল। আজ প্রেমরাজ্যে আমি প্রথম যোগী বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দ পাইলাম মনে হইল আমি এ সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিব।

সেইদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম—যেন ময়ূরাক্ষী নদীতীরে বসিয়া আছি। সহসা ভীষণ শব্দে প্রবাহ আসিয়া অনন্ত বালুকারাশি ভাসাইয়া লইয়া গেল, প্রবল স্রোতে নদীকূল প্লাবিত হইল। কত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ভাসিয়া চলিতেছে। দেখিলাম স্রোতে একটী বালিকা ভাসিয়া যাইতেছে। অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া সেই প্রবাহে যাইয়া পড়িলাম। অনেক কষ্টে বালিকাকে ধরিয়া তীরে তুলিলাম এবং নানা প্রকার যত্নে তাহার চৈতন্যবিধান করিলাম। সংজ্ঞা লাভ করিয়া যখন বালিকা উঠিয়া বসিল, তখন দেখিলাম এ যে সেই মানস-মোহিনী পূর্ব্বপরিচিতা মূর্ত্তি, অমনি আগ্রহ সহকারে হৃদয়ে ধারণ করিলাম কিন্তু বালিকা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া হাসিতে হাসিতে অন্তরীক্ষে বিলীন হইয়া গেল। আমিও কাঁদিয়া উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কে জানিত যে এইরূপ কত রাত্রি বসিয়া কাঁদিতে হইবে? কে জানিত যে এইরূপ শোকস্বপ্নে আকুল হইয়া রজনী যাপন করিতে হইবে? এত আশাপূর্ণ বুক যে সহসা ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহা কখনও মনে হয় নাই। বিষাদে ডুবিয়া যে এত হাবু ডুবু খাইতে হইবে তাহা জানিলে ময়ূরাক্ষীর প্রবাহ হইতে সে প্রেমমূর্ত্তি তুলিয়া আনিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতাম না। সে স্বপ্নের অর্থ যদি তখন বুঝিতাম তবে সে পথে গমন করিয়া আজ এত ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে হইবে কেন?

অবোধ আমি তখন মনে করিলাম এই বালিকাই আমার পত্নী হইয়া আমাকে সুখী করিবে ইহা বিধাতার বিধান। বিধাতার আদেশে [illegible] আশার অতীত ফল লাভ করিলাম—প্রেমপ্রতিমার মূর্ত্তি দর্শনে [illegible] হইলাম। ইহাতেও পাছে বুঝিতে না পারি এই জন্য স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হইল—প্রেমপ্রবাহ হইতে তোমার হৃদয়রত্নকে তুলিয়া লও তাহা হইলে

এ মর্ত্ত্যধামের দুঃখের অতীত ভূমির অধিকারী হইতে পারিব। তাহাই বিশ্বাস করিয়া মনে মনে স্থির করিলাম এই বালিকাকেই বিবাহ করিব।

পরদিন ঘটক আসিলেন। আজ পাত্রী দেখিবার দিন। দাদা বলিলেন "নিজে দেখে শুনে বিবাহ করাই উচিত। তুমি যখন ছোট ছিলে, তোমার কাপড় কিনিতে হইলে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছি, তুমি যে কাপড় পছন্দ করিয়াছ তাহাই কিনিয়া দিয়াছি। আজ যে জিনিস ঘরে আনিব তাহার উপর তোমার জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিবে, অতএব তুমি নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া মনোনীত কর, তোমার অমত হইলে বিবাহ দিব না।" অগ্রজের আদেশে নিজেকেই দেখিবার জন্য যাইতে হইল। আমি যে পূর্ব্ব দিন দেখিয়া আসিয়াছি, সে কথা লজ্জাক্রমে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ঘটককে বলিলাম প্রকৃত পরিচয় দিওনা—বরের বন্ধু এই কথা বলিও।

আমি আগে আগে চলিতে লাগিলাম; ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলাম "কেমন ঐ বাড়ী না?" ঘটক মহাশয় স্তম্ভিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "নিশ্চয়ই এই বিবাহ হইবে এবং এই বিবাহে তুমি সুখী হইবে। দেখ তোমার অন্তরাত্মা কেমন ঠিক্ পরিচয় করিয়া দিতেছে। পূর্ব্ব জন্মে যে পত্নী ছিল, ইহজন্মেও সেই পত্নী হইবে ইহা শাস্ত্রের কথা। আমরা তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারি না কিন্তু অন্তরাত্মা সময়ে সময়ে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়।" আমি ভক্তি ভাবে ঘটকের পদধূলি মস্তকে লইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলাম।

পাত্রী দেখা হইল। সেই প্রীতিময়ী মূর্ত্তি যেন কত শোভাই ধারণ করিয়াছে, দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ঘটক আমার নিষেধ না মানিয়া প্রকৃত পরিচয় সকলকেই দিয়াছিলেন এই জন্য বিশেষ যত্ন ও আদর দেখিলাম। সে কথা তখন জানিতাম না, এই জন্য বিশেষ লজ্জা পাইতে হয় নাই।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। বীরসিংহপুরের কালীমন্দিরে আরতি হইতেছে। দেবী সাক্ষাৎ বরপ্রদায়িনী মহাশক্তিশালিনী বলিয়া তদঞ্চল-বাসিগণের বিশ্বাস। কত নরনারী ভক্তিভাবে মা মা বলিয়া ডাকিতেছে। বিশ্বজননী প্রীতিনয়নে ভক্তদলের দিকে তাকাইয়া আছেন। সহসা মায়ের নয়ন অন্য দিকে ফিরিল কেন? ও কে মন্দিরের মধ্যে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

দেবীর দিকে তাকাইয়া করযোড়ে কি প্রার্থনা করিতেছ? তুমি বালিকা তোমার আবার কি প্রার্থনা আছে? তোমার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ কেন? ঐ হৃদয়ের ভিতর কি উচ্ছ্বাস বহিতেছে? ঐ দেখ দেবী প্রসন্নবদনে তোমার দিকে তাকাইয়া আছেন। এই বেলা তোমার অভিলাষ জানাও, তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। হায় সে কথা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তুমি কতবার গৌরব করিয়া কহিয়াছ "আমি মা কালীর কাছে আরাধনা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। যে দিন তুমি দেখিতে গিয়াছিলে সেই দিন আমি কালীবাড়ী গিয়া দেবীকে বলিয়াছিলাম "মা! আমার ভাগ্যে যেন এই স্বামী জুটে। যদি ইনি আমার স্বামী না হন তবে আমি নিশ্চয়ই ময়ুরাক্ষীতে ডুবিয়া মরিব। মা আমাকে কাঁদাইওনা।" দেবী করালবদনা! তুমি প্রসন্না হইয়া বালিকার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলে, তোমারই প্রসাদে আমাদের মিলন হইয়াছিল, আজ মা তুমি আমার প্রেমময়ীকে গ্রাস করিয়াছ, কত দিনে এ অভাজনকে গ্রাস করিয়া উভয়ের পুনর্ব্বার মিলন করিবে। আমার এ প্রার্থনা কি শুনিবে না?—প্রেমময়ি! এই অপদার্থ জীবকে পাইবার জন্য একদিন তুমি কত কি প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহাকে পাইয়া চিরদিনই আনন্দ প্রকাশ করিয়াচ, আজ ত্যাগ করিয়া যাইতে কি কিছুই মমতা হইল না? যদি এত শীঘ্র ত্যাগ করিয়া যাইবে তবে তাহার জন্য আবার আরাধনা কেন? বুঝিয়াছি—আমি অসার জীব জানিলে তুমি আমাকে পাইবার জন্য কখনও এত ব্যাকুল হইতে না। এতদিন পরে আমাকে অপদার্থ জানিয়া কি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে? আমার প্রতি তোমার মমতা থাকিলে অবশ্যই বিদায়কালে একবিন্দু অশ্রুত্যাগ করিয়া যাইতে। হাসিতে হাসিতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলে ইহাতেই আমি যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছি। তুমি যদি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে তবে আমার মনে তত ক্ষোভ হইত না। জীবনে যাহাকে এত স্নেহাদর করিতে, অন্তিম কালে তাহাকে উপেক্ষা করায় যে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছি, যদি কখনও দেখা হয় তবে [illegible] দেখাইয়া মনের ক্ষোভ নিবৃত্ত করিব, ইহজীবনে তাহা নিরাকৃত হইবে না।

মধুময়ী গীতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নবম অধ্যায়—রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ।

উপাসনা জ্ঞানযোগে ভগবান কি কি ভাবে অনুভূত হন—দেবপূজায় পুনর্জ্জন্ম এড়ান যায় না—যে যেরূপ পূজা করে সে সেইরূপ লোক প্রাপ্ত হয়। —অভেদ জ্ঞান—ভক্তের বিনাশ নাই—শূদ্র ও নারীও মুক্তিপায়—কথন্ ভগবান দর্শন দেন। ইত্যাদি।

শ্রীভগবান কহিলেন:—

অর্জ্জুন, পরম গুহ্য উপাসনা জ্ঞান,
দোষ দৃষ্টি হীন তুমি, কব প্রবিধান;
জানিলে অশুভ দূর হইবে তোমার। ১
অতি গুহ্য জ্ঞান এই সর্ব্ব বিদ্যা সার;
অক্ষয় ফলদায়ক, সুখসাধ্য হয়,
পবিত্র প্রত্যক্ষ, ধর্ম্ম সঙ্গত নিশ্চয়। ২
এ ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা যার, না জানি আমায়
সংসার মরণ পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। ৩
অব্যক্ত জগৎব্যাপী আমি সর্ব্বকালে,
আমাতে সকল, আমি নির্লিপ্ত সকলে। ৪
ধারক পালক আমি, নির্লিপ্ত আবার,
ঐশ্বরিক যোগ মোর দেখ চমৎকার। ৫
সর্ব্বব্যাপী মহাবায়ু আকাশে যেমন,
ভূতগণ অসংযুত আমাতে তেমন। ৬
প্রলয়ে বিলয় পায় আমার মায়ায়,
সৃষ্টি কালে সৃষ্টি পুনঃ করি সমুদয়। ৭
আমার প্রকৃতি যোগে পূর্ব্ব কর্ম্ম বশে,
পুনঃ পুনঃ ভূতগণ জন্মে অনায়াসে। ৮

অনাসক্ত উদাসীন আমি ধনঞ্জয়
সে কর্ম্মে করিতে নারে আবদ্ধ আমায়। ৯
অধিষ্ঠাতা আমা হতে প্রকৃতি আমার,
ব্রহ্মাণ্ড প্রসব পার্থ করে বারম্বার। ১০
তামসী রাজসী মোর প্রকৃতি ধরিয়া,
মূর্খগণ বৃথা আশা বৃথা কর্ম্ম নিয়া,
আমায় অবজ্ঞা করে দেহধারী জ্ঞানে,
সর্ব্বভূত মহেশ্বর-তত্ত্ব নাহি জানে! ১১, ১২
দৈবী-প্রকৃতির বসে স্থিরচিত্ত গণ
জগৎ-কারণ মোরে করেন ভজন। ১৩
স্তোত্র মন্ত্র কীর্ত্তন বা নিয়ম করিয়া,
কেহ বা আমায় পূজে স্থিরা ভক্তি দিয়া। ১৪
জ্ঞানীতে অভেদ ভাব কিম্বা দাসজ্ঞান,
ব্রহ্ম-রুদ্র-রূপে কেহ করে মোর ধ্যান। ১৫
পঞ্চযজ্ঞ আমি পার্থ, যজ্ঞ অগ্নিষ্টোম,
শ্রাদ্ধ-অন্ন মন্ত্র আমি, ঘৃত, অগ্নি, হোম। ১৬
পিতা মাতা ধাতা আমি পিতামহ আর,
আমি বেদ, আমি জ্ঞেয়, পবিত্র ওঙ্কার। ১৭
জগৎপালক আমি মঙ্গলনিধান,
আমি প্রভু, আমি সাক্ষী, আমি ভোগস্থান।
রক্ষক সুহৃদ্ স্রষ্টা আলয় বিলয়,
জগতের বীজ আমি অনন্ত অক্ষয়। ১৮
হে অর্জ্জুন, সূর্য্য রূপে আমি তাপকারী,
বারি বরষণ পুনঃ আকর্ষণ করি;
আমিই জীবন মৃত্যু, স্থূল সূক্ষ্ম যত। ১৯
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি বেদ বিধিমত,
উপাসনা করি মোর বেদকর্ম্মিগণ,
সোমপানে ইন্দ্রলোকে স্বর্গভোগী হন। ২০

ভুঞ্জিয়া বিপুল স্বর্গ হয় পুণ্যক্ষয়,
গ্রহণ করেন জন্ম, মর্ত্ত্যে পুনরায় ;
পুনর্ব্বার বেদ ধর্ম্ম করি আচরণ,
করেন কামনাসূত্রে গমনাগমন। ২১

বাঞ্ছা ছাড়ি উপাসনা করে যে আমার,
আমিই বহন করি মোক্ষভার তার। ২২

ভক্তিভরে পূজে যা'রা অন্যদেবতায়,
আমাকেই পূজে কিন্তু বিধি শুদ্ধ নয়। ২৩

যজ্ঞভোক্তা ফলদাতা আমি সুনিশ্চয়,
স্বরূপ না জানি মাত্র পুনর্জন্ম পায়। ২৪

দেবার্চ্চনাকারিগণ দেবলোকে যান,
পিতৃগণার্চ্চনাকারী পিতৃলোক পান ;
ভূতলোক প্রাপ্ত হয় ভূতপূজকেরা ;
আমাকেই প্রাপ্ত হন আত্মনিষ্ঠ যাঁরা। ২৫

পত্র পুষ্প ফলে জলে ভক্তিতে আমায়
পূজিলে, গ্রহণ আমি করি সমুদয়। ২৬
দান যজ্ঞ যাহা কর, যাকিছু অশন,
সমস্ত আমাতে পার্থ কর সমর্পণ ; ২৭
তা'হলে হইবে মুক্ত শুভাশুভ হ'তে,
সন্ন্যাসযোগেতে মুক্ত হইবে আমাতে। ২৮
দ্বেষ্য প্রিয় নাই মোর, যেই ভক্ত হয়,
সে আমাতে থাকে, আমি তাহাতে নিশ্চয়। ২৯
অতি দুরাচার যদি অভেদ ভাবিয়া,
পূজে মোরে, সাধু সেই, সুদৃঢ় বলিয়া। ৩০
দুরাচার জন করি আমার ভজন,
শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হন, শান্তি প্রাপ্ত হন।
নিঃসন্দেহে বল তুমি বল ধনঞ্জয়,—
কখনো আমার ভক্ত প্রনষ্ট না হয়। ৩১

পাপবংশে জন্ম যার, বৈশ্য শূদ্র নারী,
মুক্তি পায়, ধরে যদি মোরে ভক্তি করি। ৩২
পুণ্যবান ব্রাহ্মণ কি ভক্ত রাজর্ষিরা,
কি বিচিত্র, আমায় যে পাইবেন তাঁরা?
তেঁই বলি, এ অনিত্য মর্ত্ত্যলোকে আসি,
আমার ভজনা পার্থ কর দিবানিশি। ৩৩
মদ্ভক্ত, মদ্গতচিত্ত, উপাসক হও,
নমস্কার কর মোরে, যোগ পথ লও।
হেন মতে আমাতেই সমাহিত মন
হইলেই, আমি আসি দিব দরশন। ৩৪

ইতি রাজগুহ্য যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।
(৺বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত)

আমি কে?*

প্রিয় দর্শন! বলিতে পার আমি কে? সংসারকাননে আসিয়া নানা-রূপ রঙ্গভঙ্গে বিচরণ করিতেছি—আমি কে? এই যে মায়ামুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিতেছি, আপন মনে নাচিয়া গাইয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেছি—আমি কে? এই যে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আয়ুঃক্ষয় করিতেছি, আবার পরক্ষণে উন্নতির পথে আরোহণ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, ক্ষণে উঠিতেছি, ক্ষণে পড়িতেছি, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে যাইতেছি, সাগর মন্থন করিতে চাহিতেছি, বিদ্যুদ্দাম ধরিবার উপক্রম করিতেছি, অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হইতেছি,—আমি কে? এই যে দাসত্বের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে, মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে, [illegible]

*এই প্রবন্ধের কিয়দংশ লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত "দিবাকর" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রের অকালে তিরোভাব হওয়ায় প্রবন্ধ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে আমূল পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া নূতন প্রবন্ধ স্বরূপে মন্থন-ভাবে প্রকাশিত হইল।

জগৎ ব্যাপারের কার্য্যাদি অবলোকন করিতেছি, ক্ষণে হাসিতেছি, ক্ষণে কাঁদিতেছি—আমি কে? এই যে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দিবসরজনী অবিশ্রান্ত-ভাবে ঘুরিতেছি, শরীরকে শরীর, জীবনকে জীবন জ্ঞান করিতেছি না—আমি কে? এই যে নিজ অভীষ্ট সাধনোদ্দেশে তোষামোদপ্রিয় বড় লোকদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি, তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য হয়কে নয়, এবং নয়কে হয় করিতেছি,—আমি কে? এই যে অভিমানের ভার স্কন্ধে লইয়া বক্ষস্ফীত মস্তক উন্নত করিয়া বেড়াইতেছি—আমি কে?

একদা নৈদাঘ সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন সূর্য্যদেব অস্ত-গুহায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, যখন তাহার স্বর্ণময় মূর্ত্তি পশ্চিমাকাশের প্রান্তদেশে কাঁপিতেছিল, সেই সময়ে আমি মৃদুমলয়ানিল সেবনোদ্দেশে ভাগীরথীতীরে পরিভ্রমণ করিতেছি; ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম ভাগীরথীর প্রশান্ত বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা সঞ্চালন করিতে করিতে সমীরণ অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া আমার গাত্রে স্পর্শ করিল; তাহার সুশীতল স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর শীতল হইল। যাহার জন্য এই স্রোতস্বিনীর তটে এতক্ষণ ঘুরিতেছিলাম, সে অবশেষে দেখা দিয়া আমার হৃদয় শান্ত করিল; নানা স্থান হইতে নানা সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভ আহরণ করিয়া আনিয়া আমার নাসারন্ধ্রে ঢালিয়া দিল, আমার মন প্রাণ পুলকিত করিল। আমি তখন ভাগীরথীর সৈকত ভূমে স্বীয় উত্তরীয় বিস্তার করিয়া তদুপরি উপবেশন করিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল; শুক্ল ত্রয়োদশীর শশী গগন-মণ্ডলে হাসিতে লাগিল; নির্ম্মল নৈশ নীলাকাশে নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত হইয়া শশী হাসিতে হাসিতে কাঁপিতেছিল; চন্দ্রকিরণে পৃথিবী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। আমি তখনও সেই জনশূন্য স্থানে উপবিষ্ট আছি, একাকী সুধাময় সুধাকরের সুধা পান করিতেছি, একাকী সমীরণের সুশীতল স্পর্শে সুখানুভব করিতেছি, একাকী কল্লোলিনী ভাগীরথীর কল্লোলধ্বনি শুনিয়া হৃষ্ট হইতেছি, একাকী প্রকৃতির রমনীয় বেশ নিরীক্ষণ করিয়া স্পর্শনেন্দ্রিয় পুলকিত করিতেছি। প্রকৃত পক্ষে এই সময় আমার বড়ই সুখময় বলিয়া বোধ হইল। এই সুখময় সময়ে বালুকাময় শয্যা দুগ্ধ-ফেননিভ কোমল কুসুমশয্যা অপেক্ষা প্রিয়তর বোধ হইল এই সুখময় সময়ে সেই শয্যায় অর্দ্ধশয়ন করিয়া আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম; নিদ্রাদেবী

আসিয়া তাহার মোহন মন্ত্রে আমার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করিল, কর্ণ বধির করিল, বাহ্যজ্ঞান অপহরণ করিল। নিদ্রা কি সুখহন্তারক—পরসুখ কাতর। আমি সেই নির্জ্জন পুলিনে একাকী কত সুখ অনুভব করিতেছিলাম—নিদ্রার চক্ষে তাহা সহ্য হইল না। নিদ্রা আমার সুখে বাদ সাধিল। নিদ্রা ভাগীরথীস্রোতের কুলকুল ধ্বনি আর আমাকে শুনিতে দিল না, শশীর সুন্দর মুখের হাসি আর আমাকে দেখিতে দিল না, সিন্ধুবাত সেবনের শান্তি অনুভব করিবার শক্তি বিলোপ করিল। আমি তৎকালে একাকী ভাগীরথী-তীরে, সৈকতভূমে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

আমি সেই নির্জ্জন প্রদেশে চাঁদিনী যামিনী যোগে প্রহরৈক সময়ে ঘুমাইতে ঘুমাইতে কি দেখিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা আশ্চর্য্য! দেখিলাম এক মনোহরকান্তি দেবরূপী যুবাপুরুষ শুভ্র বসন পরিধান এবং কণ্ঠদেশে নানা সুগন্ধ-পুষ্পের মাল্য ধারণ পূর্ব্বক আমার সম্মুখে আগমন করতঃ গম্ভীর নির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন—"দেখ যুবক! তুমি আপনাকে ভুলিতেছ, তুমি কে তাহা তুমি জানিতেছ না। তোমার শরীর "তুমি" নহ; শরীর তোমার আধার, তুমি আধেয়; শরীর তোমার রথ, তুমি রথী। তোমার শরীরাভ্যন্তরে যে আত্মা বাস করেন, সেই আত্মাই তুমি। সেই তুমি, সেই আত্মা শরীররূপ বিমানে আরোহণ করিয়া কোন অভিলষিত স্থানে গমন করিতেছ, তুমি অনন্তধামের যাত্রী মনত্র। তুমি এই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছ; যাত্রীর উপযুক্ত কার্য্য না করিয়া, প্রকৃত পথে পদ সঞ্চালন না করিয়া বিপথে পদবিক্ষেপ করিতেছ। সাবধান! যে মানব আত্ম-বিস্মৃত হয় সে অশেষ কষ্ট পায়।"

সাধু পুরুষের বাক্যাবলী কর্ণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, অন্তঃকরণ সজোরে বাজিতে লাগিল, মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল, শরীর-শোণিত শীতল হইয়া গেল, নিদ্রা সভয়ে ও সবেগে পলায়ন করিল। আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম যে আমি ভাগীরথীর সৈকতভূমে পড়িয়া আছি; আর জনপ্রাণী তথায় নাই; চারিদিক নিঃশব্দ নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে শিবাগণ অশিব চিৎকার করিতেছে। কিঞ্চিদ্দূরে মৃতদেহ দাহের নিদর্শন সমূহদড়ি, কলসী, জীর্ণ-বস্ত্র, অর্দ্ধ-দগ্ধ কাষ্ঠ ও অঙ্গারের স্তূপ আতঙ্কিত করিতে লাগিল; তদুপরি অনতি দূরে

তাহারা কাতর কণ্ঠে "হরিনাম সত্য", "হরিনাম সত্য" উচ্চারণ করিতে করিতে ভীষণ অগ্নি জ্বালিয়া দিল; বুঝি তাহারা মৃতদেহের সৎকার করিতে আসিয়াছে। আমার অন্তঃকরণে ভীতি সঞ্চারিত হইল, আতঙ্কে প্রাণ শিহ-রিয়া উঠিল, আমি সত্বর তথা হইতে গৃহে চলিয়া আসিলাম।

নিদ্রার সময়ে যে ব্যক্তি আমার নিকট আবির্ভূত হইয়া আমাকে সাবধান করিলেন, তিনি কে জানিবার জন্য আমার প্রাণ বড় উৎসুক হইল। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলাম তিনি কে। তিনি আমার পরম সুহৃৎ, ঐ সুহৃৎ সঙ্গে করিয়াই আমি শ্মশানসম এই সংসারক্ষেত্রের মধ্য দিয়া শরীররূপ বিমানে আরোহণ করিয়া চলিয়াছি—জীবন তরণীর হাল পরিচালনা করিতেছি। তিনি আমার মন্ত্রী, শুভানুধ্যায়ী। আকাশ-স্পর্শী হিমালয় শৃঙ্গে, দুস্তর সাগরবক্ষে, হিংস্রপ্রাণিসমাকীর্ণ জঙ্গলে, অসূর্য্য-স্পর্শ গহ্বরে, শত্রুপরিবেষ্টিত বিদেশে, বিভীষিকাময় শ্মশান প্রদেশে, যখন যেখানে গমন করি, তখনই সেখানে আমার এই চিরবিশ্বস্ত সুহৃৎ আমার পশ্চাদনুগমন করেন; পাছে আমি বিপদে পতিত হই, এই আশঙ্কায় আমার সঙ্গে সঙ্গে ঝিলে বিলে সর্ব্বস্থানে গমন করেন, অধিক কি, তাঁহার বসতি আমার হৃদয়ান্তঃপুরে, তিনি দিবানিশি আমার অন্তরাকাশে বিচরণ করেন, ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করেন না। পাঠক! বুঝিয়াছ এ সুহৃৎ কে? ইনি বিবেক। প্রত্যেক মানবের অন্তরে ইনি বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে অসৎকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। এই বিবেকই সত্যনিষ্ঠ সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যসুখ পরিহার পূর্ব্বক বনবাসী হইয়া পিতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রণোদিত করিয়াছিল। এই বিবেকই কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডববীর অর্জ্জুনকে জ্ঞাতিবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রথমতঃ নিরস্ত করিয়া-ছিল। এই বিবেকের প্ররোচনাতেই দৈত্যকুলের শিশু প্রহ্লাদ পিতার নিদারুণ নির্য্যাতন সত্ত্বেও হরিনাম মহাধন পরিত্যাগ করেন নাই। বালক থিওডোপার্কার সরোবরে পদ্মপুষ্প আহরণ করিতে গিয়া তাহার পার্শ্বে এক কচ্ছপ দেখিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপে তাহার নিধন সাধনে উদ্যত হইলে এই বিবেকই তাহাকে সেই পাপ-কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল। প্রশ্ন উঠিতে পারে যদি মনুষ্য মাত্রেরই অন্তরে বিবেক-মন্ত্রী বিরাজিত আছে, তবে পৃথিবীতে অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পাপের অভিনয় হয় কেন?

আমাদিগের ন্যায় পাপীর ভার পৃথিবী বহন করেন কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে বিবেকের বাণী সকলে শুনেন না। গুরুজনের সদুপদেশে কি সকলেই কর্ণপাত করে? মানুষ প্রথমতঃ যখন পাপ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন কত ইতস্ততঃ করে; পাপের মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া প্রথম প্রথম যখন পাপ অনুষ্ঠান করে তখন তাহার অন্তরে কত যাতনা উপস্থিত হয়। তাহার পর ক্রমশঃ পাপানুষ্ঠানে অভ্যাস হইয়া গেলে তাহার আর সে অগ্রপশ্চাৎভাব ও যাতনা থাকে না। গীতায় লিখিত আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন "অগ্নি যেমন ভস্মরাশিতে আচ্ছাদিত হইলে তাহার কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয় না, মুকুর মলিনতা পূর্ণ হইলে তাহাতে যেমন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ অনবরত পাপানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা বিবেকবুদ্ধি আচ্ছাদিত হইলে তাহার শক্তি অনুভূত হয় না।" ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যেক মানব আপনার জীবনে দেখিতে পাইবেন।

এক্ষণে দেখা যাউক আমি কে? আমি দেহ, না দেহ হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ? অনেকে বলিয়া থাকেন যে আমার দেহ ও আমার আমিত্ব অর্থাৎ আত্মা এতদুভয় এক পদার্থ। তাঁহারা বলেন যে দেহের সহিত আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এইরূপ অনাত্মবাদিদিগের মত পুরাকালে ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। বিঘোর নাস্তিক চূড়ামণি বৃহস্পতি মুনি ভাস্কর ভাষ্যের ব্রহ্মসূত্রে বলিয়া গিয়াছেন—"যেমন কিণ্বাদির সমষ্টিতে মদশক্তির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি এই ভূতচতুষ্টয় দেহাকারে পরিণত হইলে চৈতন্য ও চিন্তার উদ্ভব হইয়া থাকে।"* অনেকে এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। গ্রীসদেশে আদিম অবস্থাতে সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদ পেরিক্লিশের গুরু আলেক্‌সেগোরস বলিয়াছিলেন—"Nothing properly speaking is born or dies; birth is the composition of elements, death the dissolution of them."† অর্থাৎ, ন্যায়তঃ কহিতে গেলে কোন বস্তুই জন্মগ্রহণ করে না বা মৃত হয়

*ভাস্কর ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫৩

†Quoted by the Rev. F.D.Maurice, Encyclopœdia of Mental Philosophy.

কয়েকটি ভূত-সংশ্লিষ্টে জন্ম এবং তাহাদের বিশ্লেষণে মৃত্যু হয়। সুবিখ্যাত আরিষ্টটলের ডাইসিয়ারকাস নামক জনৈক শিষ্য এইমতাবলম্বী ছিলেন।* ইহাদিগের মত যে ভ্রমসঙ্কুল তাহা একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মানবাত্মা জড়পদার্থ নহে, রথের সহিত রথীর যেরূপ সম্বন্ধ, দেহের সহিত আত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। শরীর ক্ষণ-বিধ্বংসী, আত্মা কল্পান্তস্থায়ী ইহা স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলেই বিশেষ রূপে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এ বিষয় আমরা কেবল মাত্র কথায় বলিয়া নিশ্চিন্ত হইব না, প্রমাণ সহকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আত্মা যদি দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ মীমাংসিত হয়, তাহা হইলে যতদিন আমরা আত্মার বিনাশের অন্যবিধ কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিব, ততদিন দেহের পতনে আত্মার মরণ কথনই মনে করিতে পারিব না।

মুণিবর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদে বলিয়াছেন, অন্যত্রমনা অভূবন্না দর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রোষমিতি মনসাহ্যেব পশ্যতি মনসাশৃণোতি। কামঃ সঙ্কল্প বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যে তৎসর্ব্বে মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসাবিজানতি।† অর্থাৎ, আমি অন্যত্রমনা হইলাম, আর দেখিতে বা শ্রবণ করিতে পাই না, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে কেবল মনের দ্বারা দর্শন শ্রবণ, স্পর্শন আদি হয়। কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয় এই সমস্ত মনের কার্য্য। এই কারণে পৃষ্ঠ-দেশ স্পর্শিত হইলে, চক্ষুর দ্বারা তাহা দেখিতে না পাইলেও কেবল মনের দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়।

সুবিখ্যাত তত্ত্বদর্শী শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন যে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপের প্রতি কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। মন বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ। বোধ করি সকলেই অবগত আছেন যে অনেক সময়ে ব্যক্তি বিশেষকে "তুমি কি এই বস্তু দেখিতেছ" বা "এই কথা কি শুনিতেছ" এইরূপ প্রশ্ন করিলে প্রত্যুত্তর করেন যে তাহার মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন তিনি ইহা দর্শন বা শ্রবণ করিতে পারেন নাই। এতদ্দ্বারা

*Vide Colebrooke's Miscellaneous Essays. Vol I. p.405.

†বৃহদারণ্যক। তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চম ব্রাহ্মণ।৩

ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যেরূপ শব্দাদি গ্রহণ সমর্থ চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সংযুক্ত হইলেও যাহার অনুপস্থিতিতে সেই চক্ষুঃশ্রোত্রাদি দ্বারা রূপ শব্দাদির জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না এবং যাহার উপস্থিতিতে সেই জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তাহা একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা মন বা অন্তঃকরণ বা আত্মা, তাহাই সমুদয় ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণের উপযোগী। সকলেই মন বা আত্মার দ্বারা দর্শন শ্রবণাদি করিয়া থাকে। চক্ষুর অগোচরে পৃষ্ঠদেশ কোন পদার্থ সংস্পৃষ্ট হইলে উহা কোন্ পদার্থ দ্বারা স্পৃষ্ট হইল তাহা মন বা চিদ্স্বরূপ আত্মা দ্বারাই জানা যায়। এমতাবস্থায় মনের বা আত্মার অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্রতা মূঢ় ভিন্ন কেহ অস্বীকার করিতে সাহসী হইবে না। যদ্যপি এই বিবেক শক্তি-সম্পন্ন মন বা আত্মা না থাকিত, তাহা হইলে কেবল ত্বকের দ্বারা করস্পর্শ যষ্টিস্পর্শ ইত্যাদি স্পর্শবোধ কি প্রকারে হইত ? এই নিমিত্ত বিবেক প্রতিপত্তির কারণ মন বা আত্মা নিঃসংশয় বিদ্যমান আছে ইহা বিশেষ রূপে জানা যাইতেছে। আমরা স্থূল কথায় মন ও আত্মাকে এক পদার্থ বলিয়াছি। সূক্ষ্মরূপে ধরিলে মন ও আত্মা এক পদার্থ নহে। মন হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠতর বস্তু। কিন্তু সে সূক্ষ্মতত্ত্বে আমরা প্রবেশ করিব না। আমাদিগের "আমিত্ব" দেহ হইতে স্বতন্ত্র ইহা প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গ্রীসদেশীয় চিরস্মরনীয় অসাধারণ তত্ত্বদর্শী অপরাজিত সূক্ষ্মবিচারশক্তি সম্পন্ন সক্রেটীশ তদীয় প্রিয় শিষ্য আলসিবাইডিসকে শরীর ও আত্মার স্বতন্ত্রভাব বুঝাইবার জন্য যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা-যায় যে শরীর যন্ত্রবিশেষ এবং আত্মা যন্ত্রী। যিনি ব্যবহার করেন আর যাহা ব্যবহৃত হয় এতদুভয় এক পদার্থ হইতে পারে না চর্ম্মকার তাহার অস্ত্রাদি ব্যবহার করে, বীণাবাদক বীণা বাজায়; চর্ম্মকার কি তাহার অস্ত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে ? বীণাবাদক কি তাহার বীণা হইতে স্বতন্ত্র নহে ? সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে যিনি ব্যবহার করেন আর যাহা ব্যবহৃত হয় এতদুভয় স্বতন্ত্র পদার্থ। চর্ম্মকার যেমন যন্ত্রের দ্বারা ত্বক ছেদন করে, সেইরূপ হস্তের দ্বারাও ছেদন করিয়া থাকে, কর্ম্মকালে হস্তও চক্ষুর ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি ব্যবহার করে আর যাহা ব্যবহৃত হয় এই দুই স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব চর্ম্মকার ও বীণা-

বাদক তাহাদিগের হস্ত ও চক্ষু হইতে পৃথক। সেইরূপ মনুষ্য আপনার শরীর ব্যবহার করিয়া থাকে; শরীর মনুষ্য নহে, কিন্তু শরীর মনুষ্যের। মনুষ্য ও শরীর সুতরাং এক হইতে পারে না। মনুষ্য তবে কি? যিনি শরীর ব্যবহার করেন তিনিই মনুষ্য। শরীরকে কে ব্যবহার করে? মন শরীরের অভ্যন্তরে যে চিদস্বরূপ আত্মা বিরাজ করেন সেই আত্মা। সেই আত্মাই মনুষ্য।*

বৈদান্তিকেরা বলেন—"চিন্তা ও সংজ্ঞাদি মানসিক ধর্ম্ম, শরীরের গুণ নহে, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহারা স্থগিত হয়, অথবা শরীর তথন অবস্থিতি করে। মৃত্যুর পরক্ষণে রূপলাবণ্য প্রভৃতি শারীরিক গুণ উপলব্ধ হয়, কিন্তু চিন্তা ও স্মৃতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণের উপলব্ধি হয় না। শারীরিক কার্য্য সত্বে আধ্যাত্মিক গুণ সমুদয়ের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু একের বিনাশের সঙ্গে অপরের বিনাশ প্রতিপন্ন হয় না।†

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে লিখিত আছে—"God created man in his own image, in the image of God created he him—male and female created he them" পরমেশ্বর স্বীয় স্বরূপের অনুরূপ করিয়া মানবকে সৃষ্ট করিয়াছেন। উপাসক অধিকার ভেদে এবং সাধক ভক্তির আবেগে পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা করিলেও তিনি যে নিরবয়ব ও অশরীরী, ইহা সকল শাস্ত্রই প্রচার করে। উপনিষদে আছে—"অস্থূল মনণ্বহ্রস্ব মদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায় মতমোৎবায়্নাকাশ মসঙ্গমরস মগন্ধ মচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমনাত্রম।" অর্থাৎ তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতম, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক; তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক প্রাণবিহীন, মুখবিহীন, কাহারও সহিত তাহার উপমা হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি নিরবয়ব ও অশরীরী এবং রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি জড় পদার্থের ভাব তাঁহাতে নাই। এই অশরীরী পরমাত্মা স্বীয়

*Vide Sir William Hamilton's Lectures on Metaphysics. Vol I.p. 106.

†শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫৪

স্বরূপে জীবাত্মাকে সৃজন করিয়াছেন বলিলে এই বুঝায় যে জীবাত্মাও নিরবয়ব ও অশরীরী, সুতরাং দেহ হইতে স্বতন্ত্র। শরীর আমার, জীবাত্মাই আমি।

জীবাত্মার সহিত শারীরিক সমুদয় অঙ্গের সম্বন্ধ কঠোপনিষদে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"আত্মানং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেবত্ত।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়নাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষুগোচরান।
আত্মেন্দ্রিয় মনোবুক্তোভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥*

অর্থাৎ, জীবাত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ। ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, বিষয় বলিবার পথ, আর ইন্দ্রিয় মনাদি যুক্ত জীবাত্মাই ভোক্তা। এতদ্দ্বারাও শরীর ও আত্মার স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুন পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা প্রভৃতি যুদ্ধেচ্ছু স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে, তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের নিধন সাধনে নিজের অপারগতা প্রকাশ করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগাধ্যায়ে তাঁহাকে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেও প্রতিপন্ন হয় দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ।

ভগবান বলিয়াছেন,—

ন ত্বেবাহং জাতুনাসং ন ত্বংনেমে জলাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বেবয়মতঃ পরম্॥†

অর্থাৎ, আমি যে কখনও ছিলাম না এমন নয়; সেইরূপ তুমি ছিলে না এমন নয়; এই রাজগণও ছিলেন না এমন নয়; ইহার পরে আমরা সকলে থাকিব না এমন নয়।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র না মুহ্যতি॥‡

*কঠোপনিষদ, তৃতীয় বঃ ৩।৪-শ্লোক।
†শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়, ১২ শ্লোক।
‡মদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৩ শ্লোক

অর্থাৎ, দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থাভেদ মাত্র; অতএব পণ্ডিতেরা তাহাতে মোহিত হন না।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥*

অর্থাৎ, যিনি এই সকল অর্থাৎ দেহাদি ব্যাপিয়া আছেন, সেই আত্মস্বরূপকে অবিনাশী জানিও। কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য স্যোক্তা শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥†

অর্থাৎ, নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্বর। হে ভারত! যুদ্ধ কর।

য এনং বেত্তি হন্তারাং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥‡

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহাকে অর্থাৎ আত্মাকে হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে তাহারা উভয়েই জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হতও হয়েন না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ঃ পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥§

অর্থাৎ, ইনি (আত্মা) কখনও জন্মেন না বা মরেন না; অথবা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবেন না। ইনি জন্ম রহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীরের বিনাশ হইলেও ইনি হত হন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭ শ্লোক।
† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮ শ্লোক।
‡ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯ শ্লোক।
§ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী ॥*

অর্থাৎ, যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥†

অর্থাৎ, শস্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, সলিল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে এবং সমীরণ ইহাকে বিশুষ্ক করিতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয় মদাহ্যোঽয় মক্লেদ্যোঽ শোষ্যএব চ।
নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থাণুর চলোঽয়ং সনাতন ॥‡

অর্থাৎ, ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য এবং ইনি অশোষ্য ; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব, সদা একরূপ এবং অনাদি।

উপরোক্ত শাস্ত্র বচন সমূহ ও তত্ত্বদর্শী মহোদয়গণের যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে শরীর ও আত্মা এক নহে ; আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র। আমি আমার শরীর নহি ; কিন্তু শরীর আমার। এই জরা, বার্দ্ধক্য ও মরণশীল শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার ;—আমার হস্ত, আমার পদ, আমার চক্ষু, আমার কর্ণ, আমার নাসিকা, ইত্যাদি সকলই আমার। অধিকারী ও অধিকৃত যদ্যপি এক জিনিস না হয়, তবে আমি ও আমার শরীর এক হইব কেন ? মৃত্যুর পর মৃতদেহের সৎকার হইয়া থাকে জীবিতাবস্থায় আমাদিগের যেমন দেহ, মৃত্যুর পর ও সৎকারের পূর্ব্বে আমাদিগের সেই দেহই বর্ত্তমান থাকে ; তবে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী, দারা সুত "কোথা গেলিরে" বলিয়া কাতরে ক্রন্দন করিয়া গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করে কেন ? দেহ যদি আমি হইতাম, তাহা হইলে ত আমি মৃত্যুর পরেও দেহরূপে বর্ত্তমান থাকি, তবে এত শোকের উচ্ছ্বাস হয় কেন ? ইহার একমাত্র উত্তর—দেহ আমি নহি ; কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে

*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়। ২২ শ্লোক।
†শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৩ শ্লোক।
‡শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৪ শ্লোক।

যে চিদ্‌স্বরূপ বর্ত্তমান থাকে, তাহাই আমি। সেই চিদ্‌স্বরূপ চলিয়া গেলেই দেহের পতন ও মৃত্যু। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী পিঞ্জর ভেদ করিয়া চলিয়া গেলে পিঞ্জর যেমন শূন্য পড়িয়া থাকে, দেহ পিঞ্জর ভেদ করিয়া আত্মাপক্ষী চলিয়া গেলেও তদ্রূপ দেহপিঞ্জর শূন্য পড়িয়া থাকে। আমি ও শরীর দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। শরীর আধার আমি আধেয়। শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত চিদ্‌-স্বরূপ আত্মাই আমি। দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া আত্মা কোথায় যায়? কর্ম্ম-ফলে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পুনরায় এই পাপ-পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কি না? সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলে স্বর্গ নরক ভোগ করে কি না? প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এই স্থানেই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল সিংহ।

শোকসঙ্গীত।*

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

যাতনা সহেনা প্রাণে (আমি) মরি ভাবনায়
প্রাণের পূর্ণেন্দুদেব আজ সবে ছেড়ে যায়॥

বিধি তোর কি হলো বিধি, অকালে হরিলি নিধি,
কাঁদে সবে নিরবধি, আকুল হৃদয়।

হেন বাদ কেন সাধিলি, অমৃতে বিষ মিশালি,
ভাল মতে দাগা দিলি হয়ে নিরদয়॥

পুত্র শোকে বৃদ্ধা রাণী হয়েছে রে পাগলিনী,
যেন মণি হারা ফণী মরম ব্যথায়।

সাধ্যা সতীর পতি হরে অনাথিনী কর্‌লি তারে,
অন্তরে গুমরে মরে হয়ে নিরুপায়॥

পুত্র কন্যা শোকে সারা হয়েছে সব জেন্তে মরা,
তারা হারা হয়ে তারা, হেরে শূন্যময়।

আনন্দে থাক পূর্ণেন্দু করে গেলি নিরানন্দ,
কাতরে কহিছে নন্দ অন্তর জ্বালায়॥

*বাঁশবেড়ের রাজা পূর্ণেন্দু দেব রায় মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষে।
মৃত্যু ১১ই শ্রাবণ, ১৩০৩ সাল।

হেমবাবু।

THE EPITAPH.

Large was his bounty, and his soul sincere ;
Heaven did a recompense as largely send :
He gave to misery all he had, a tear ;
He gained from Heaven, 'twas all he wished, a friend.
No farther seek his merits to disclose,
Or draw his frailties from their dead abode,
(There they alike in trembling hope repose ;)
The bosom of his Father and his God.

হুগলীর হেমবাবু, উকিল হেমবাবু, হালিসহরের হেমবাবু, অনাথের হেমবাবু, খৃষ্টীয়ানদিগের হেমবাবু, "চিত্তবৃত্তিনিরোধের" হেমবাবু—আর ধরাধামে নাই।

যেখানে সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের জন্মস্থান; যেখানে রামপ্রসাদের সাধনার পঞ্চমুণ্ডী আসন, তাহার অনতিদূরেই হেমবাবুর জন্মস্থান। হেমবাবুর পিতামহ একজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন, হেমবাবুর পিতা গুরুগিরি করিতেন। পাঠশালার গুরু নহেন। শিষ্য যজমান লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

বালক হেমের অত্যন্ত মেধা ছিল। চুঁচুড়া তখন মিশনরী প্রধান স্থান—স্কটলাণ্ডের ফ্রীকার্কদিগের একটি প্রধান আড্ডা। ম্যাকাই, ফাইফ্ বোমান্ তখন মঠধারী। হেমচন্দ্র পড়িতেন ও মাষ্টারী করিতেন। পারদর্শিতা সহকারে হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি একে একে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

নৌকা করিয়া প্রতিদিন হালিসহর হইতে যাতায়াত করিতেন। গুপ্ত অধ্যাপনায় যাহা পাইতেন তাহা সংসারে দিতেন। বাইবেলে হেমচন্দ্রের বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং মঠধারীগণ নিশ্চয়ই জানিতেন একদিন না এক দিন হেমচন্দ্র যীশুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইবেন। একটি গুরুবংশে জন্ম, কত

লোকের গুরু, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, অতি সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি যুবক, ধীশক্তি সম্পন্ন অথচ বাইবেলে ও হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শী এ হেন হেমচন্দ্র মিশনরীগণের নয়নের মণি ছিলেন—এমন কি এই অঞ্চলে হেমবাবু মিশনরীগণের আশা ভরসার একমাত্র স্থল। তবে জোর করিয়া ব্যাপ্টাইজ করিবার চেষ্টা করিলেও হেমের বুদ্ধি কৌশলে মনে করিয়াছিলেন যে ফল সুপক্ক হইলেই আপনি খসিয়া পড়িবে। সে সময়ে যাঁহারা হেমবাবু ও বোমান সাহেবের পরিচয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা এই বলিয়া আশ্চর্য্য হয়েন, যে হেমবাবু কি করিয়া সেই ব্যাপ্টাইজ-বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন তাহা চিন্তা করিবার সামগ্রী। চুঁচুড়ার একজন মঠধারী সর্ব্বদা বলিতেন যে Grace of God আসিলে আর থাকিবার যো নাই—ব্যাপ্টাইজ হইতেই হইবে। সে যাউক। তখন ক্রীশ্চন হইলে লাভ হইত। ও দিকে কৃষ্ণবন্দ্যো, লালবিহারী কালীচরণ প্রভৃতি ক্রীশ্চন হইতেছেন আর হেমের আশাভরসার জলন্ত ছবি মঠধারীগণ দিনদিন হেমচন্দ্রের সম্মুখে আঁকিতেছেন। তবুও হেমচন্দ্র পীড়াপীড়ীর সময় বলিতেন "যে এখন ও আমার Grace of God আসে নাই দেখিতেছি—তা আমার দোষ কি? আমি কি করিব?" মঠধারী এ কথার উত্তর আর দিতে না পারিয়া নিরস্ত হইতেন। মিশনরীরা জানিতেন হেমচন্দ্র নিশ্চয়ই ব্যাপ্টাইজ হইবেন।

হেমচন্দ্র ফিলজফীতে এম এ উপাধি পাইলেন ও আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পরীক্ষায় পাস হওয়ার পর মঠধারী অতি সহৃদয়তা সহকারে যাহাতে কাছারী ও মাষ্টারী দুই-ই চলে তাহার বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। তবে স্কুলের বেতন কমিয়া গেল। সাড়ে দুপুরের পর হেমচন্দ্র কাছারীতে আসিতেন। তখন বিখ্যাত দাতা ৺শিবনাথ রায় মহাশয় হুগলীর একজন প্রসিদ্ধ উকীল। নিজ গুণে অথচ হেমচন্দ্র ইংরেজী-নবিশ বলিয়া রায় মহাশয় তাঁহাকে সেরেস্তায় লইলেন। ইং ১৮৬৭ সালে হেমচন্দ্র উকীল হয়েন। প্রিন্সেপ সাহেব যখন হুগলীর জজ তখনই হেমচন্দ্রের ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কালে হেমচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর উকীল হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র অতি দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন, বেতনের জন্য পীড়াপীড়ী ছিল না। সুতরাং যেরূপ কাজকর্ম্ম তদনুযায়ী টাকা পাইতেন না। সহস্র মুদ্রার উপর মাসিক আয় হেমচন্দ্রের অনেক দিন হইল হইয়াছিল। হৃদয় ও

মস্তকের যে সমস্ত গুণ থাকিলে মনুষ্য জনসমাজে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন হেমচন্দ্রের সে সমস্ত প্রচুর পরিমাণে ছিল। কিন্তু মস্তকের গুণ হেমচন্দ্রের নশ্বরতা ঘুচাইতে পারিবে না—ঘুচাইবে তাঁহার হৃদয়। আমি সেই জন্যই এই জীবনীর অবতারণা।

হেমচন্দ্র বাইসটী সন্তানের পিতা—মৃত্যুকালে দুইটি মাত্র কন্যা জীবিতা। একটি অপোগণ্ড পৌত্র আছে। হেমচন্দ্র কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই বরং ঋণগ্রস্ত হইয়াই গিয়াছেন। তবে হেমচন্দ্রের অকৃত্রিম বন্ধু ছিল। উচ্চ আশা ছিল না। বাজে হুজুগে মাতিতেন না। কংগ্রেসকে দেশেব শত্রু বলিতেন। কখন কোন সভাসমিতিতে যোগ দেন নাই। কলিকাতাব প্রদর্শনী দেখেন নাই। অনবাবি মাজিষ্ট্রেট যৌবনে হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-শক্তি ছিল ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। সুন্দব গল্প বলিতে পারিতেন। একজন পাকা সামাজিক লোক ছিলেন। প্রত্যহ পিতাব সহিত একপাত্রে ভোজন কবিতেন। হিন্দুয়ানি মানিয়াও কিন্তু হৃদযে কৃশ্চান ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত শুনিয়া ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিয়া কাঁদিতে পারিতেন। তিনি না জানিতেন এমন বিষয় নাই।—ফ্যাসনী-জীবনী এইখানে শেষ কবিলাম।

যে প্রচলিত প্রণালীতে ইংবেজী জীবনী লেখা হয় তাহা এবং ইংরেজী ইতিহাস লেখা হয় তাহা অস্মদ্দেশে ছিল না এবং নাই বলিযা অনেকে দুঃখ প্রকাশ কবেন। হিন্দুরাজগণের সময়ের এইরূপ ইতিহাস বা জীবনী নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ কবা একটা বীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দুর আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা কবিলে দেখা যায় যে যাহা আছে তাহা ঠিকই আছে আর হিন্দুব পক্ষে ইংবেজী ধরণেব ইতিহাস বা জীবনী লেখা সম্ভব হইতে পারিত না। দেখিবেন বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী ইতিহাস বা জীবনী লেখার প্রথার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। মেকলে সাহেব দেখাইলেন যে তখনকার ইতিহাস লেখাব প্রথা ভুল। তাই তিনি নূতন ধরণ দেখাইলেন আর সেই পথেই গ্রীণ, ফ্রুড, ক্রীম্যান প্রভৃতি বিচরণ কবিয়াছেন। ইংলণ্ডে ইতিহাস-বিজ্ঞান এখন আর শুষ্করাজাবলীর নাম নহে বা বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহের সন তারিখ নহে কিম্বা অনেক লোকের স্বতন্ত্র জীবনীর সমষ্টি নহে। সেইরূপ হেলপস্ প্রভৃতি দেখাইলেন যে জীবনী লেখারও বিজ্ঞান আছে। আর তারপরই আরনল্ডের জীবনী, নেপোলিয়নের জীবনী প্রভৃতি পুস্তক

ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইতিহাস সুতরাং হইয়াছে কোন সময়ের সমাজের ও সাহিত্যের ইতিহাস। জীবনী হইয়াছে ব্যক্তি বিশেষের সংসারের ইতিহাস, তাঁহার বন্ধুগণের ইতিহাস, যে যে কার্য্য কলাপে তাঁহার বৃত্তি নিচয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার আখ্যায়িকা। এই ওজন লইয়া পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলা আবশ্যক। সে কথাটা এই। হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই—অহিন্দু ভাবেন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থ, হিন্দু ভাবেন জীবনের উদ্দেশ্য পরমার্থ। যখন জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগৎসংসার মায়া প্রপঞ্চ, জলবিম্ববৎ, আর নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া রজোগুণাত্মক জন্মান্তর ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে হইবে, যখন শত কোটী লিপ্সা ও বাসনার একটী একটী ধরিয়া আগুন জ্বালিয়া দিতে হইবে, যখন আমিত্ব নষ্ট করিতে হইবে—তখন পাশ্চাত্য প্রথার ইতিহাস কি জীবনী এ দেশে সম্ভব হইতে পারে না। এ দেশে যাহা সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহা আছে—রামায়ণ, মহাভারত রূপ যুগ ইতিহাস আছে। পুরাণ আছে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষের উপাখ্যান আছে। যে উদ্দেশ্য সংসাধন-কল্পে ঐ সকলের সৃষ্টি তাহা প্রতি ছত্রে জ্বলিতেছে। দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া মুনি ঋষিগণ ঐরূপ ব্যাবস্থাই করিয়াছিলেন। আর যখন জীবনী পড়িয়া আমিত্বের পুষ্টি করিতে হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর কর্ম্ম জগতে individualityর ছাপ রাখিয়া যাইতে হইবে তখন বাল্যে যে ভুবাল চরিত হীন চরিত পড়িতে হইবে তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ। ইংলণ্ডে ইতিহাসের রুচির যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহা কোথায় গিয়া থামিবে কে বলিবে? যাঁহারা রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি বিশ্বাস করেন না তাঁহারা কিসের জোরে রোমের ইতিহাস মিসরের ইতিহাস বিশ্বাস করেন? রামায়ণ মহাভারত বিশ্বাস করিব না বলা, কেবল গায়ের জোরের কথা দাঁড়াইবে।

পূর্ব্বকথিত আদর্শ লইয়া জীবনী লেখা যখন ইংলণ্ডের রীতি হইয়াছে তখন বঙ্গদেশেও যে তাহার অনুকরণ হইবে তাহা নিশ্চয়। যাঁহারা যোগীন্দ্র বসুর মাইকেলের জীবনী বা বেহারীলাল সরকারের বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।

দেখা যাইতেছে, খাঁটি হিন্দু নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিবেন, গোপনে সৎকর্ম্ম করিবেন—এই হইল হিন্দুর শাস্ত্রশাসন। পূর্ণাদর্শ যে দেশে মানুষরূপে

বিচরণ করিয়াছে সে দেশের তুলনা কোথায় দাঁড়াইবে? রামের ন্যায় পিতৃসত্য পালন, লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতৃস্নেহ, যুধিষ্টিরের ন্যায় সত্যনিষ্ঠা, অভিমন্যুর ন্যায় গুরুবাক্যমান্য, সাবিত্রীর ন্যায় সতীত্ব, কর্ণের ন্যায় দান, এ পোড়া দেশে ছিল। এ ঘোর কলিকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্যায় সে সব হিন্দু-জনোচিত দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি বৃত্তিনিচয় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—যাহা কিছু কিছু আছে, তাহা খনির তিমির গর্ভে। তাই আমরা আজ হিন্দুর নব-জীবনের দিনে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া নিরাশার ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ফেলি আর আদর্শের শতাংশের অংশ পাইলেও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দম্ভে বলি "ঐ দেখ"। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়—একটি এইরূপ "ঐ দেখ"। বোম্বাই অঞ্চলের নাসিক প্রদেশের ক্ষেত্তকর এইরূপ আর একটি। ইনিও উকীল ছিলেন, সম্প্রতি মরিয়াছেন। "কাছারীতে অদ্য যাহা পাইবেন তাহা আমাকে ভিক্ষা দিতে হইবে।„—"তথাস্তু"। ক্ষেত্তকর দিনে দিনে এইরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। "না" বলিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি ছিল না। কোন সহৃদয় ব্যক্তি মাসিক ৫০ মুদ্রা দান করিলে তবে ক্ষেত্তকরের নিজের সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। দধীচি দাতাকর্ণের দেশে এ কিছু বড় কথা নহে, তবে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতেই "ঐ দেখ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হেম বাবু ঐরূপ আর একটী "ঐ দেখ"।

তাই বলিতেছি, আজি ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইয়ের দিনে; আজি কাঁচুলী কামিজ শেমিজের শাল রুমাল দোশালের দিনে; কোম্পানির কাগজ ব্যাঙ্ক-শেয়ার অলঙ্কার যখন জীবের পরাগতি; মিউনিসিপাল কমিশনরী, মাজিষ্ট্রেট অনরারি, আর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বরী, যখন জীবের পরামুক্তি; ডফারিণ হাঁসপাতালের তাল বেতালগণ যখন খাতা হস্তে চক্ষে চক্ষে ঘুরিতেছেন; তখন ইংরেজী-নবিশের মস্তকের মস্তিষ্ক শীতল রাখিয়া মাসে মাসে শত শত টাকা নগণ্য অগণ্য বঙ্গ লোককে দান করা একটি বড় "ঐ দেখ"। আর ঐরূপ দান-শক্তির পরিচয় দিনে দিনে যিনি বিশ বৎসর ধরিয়া দিয়াছেন তিনি একজন মহাপুরুষ! অনাথ শিশু সন্তানের মর্ম্মব্যথার মর্ম্মোক্তি, পতিপুত্রহীনা হিন্দু বিধবার কাতর রাব, নিরন্ন বিপন্ন নিরাশ্রয় সংসার-প্রপীড়িত যুবকের দীর্ঘশ্বাস আর আপামর সাধারণ ভিক্ষুক বৃন্দের ঘোর হাহাকার যাঁর চুলী শব্দ ভেদ করিয়া গগণে উঠিতেছে তিনি একজন প্রকৃতই মহাপুরুষ! আবার

যখন শুনি এই কার্য্য তিনি ঢাক ঢোল লইয়া করিতেন না—গোপনে গোপনে করিতেন—তাঁহার বামহস্ত জানিত না যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, আবার যখন দেখি যে এই কার্য্য করিতে গিয়া দূরদর্শী বিজ্ঞ বিবেচক হেমচন্দ্র সমধিক ঋণগ্রস্থ হইয়া গিয়াছেন আর সত্য সত্যই পরিবার বর্গকে অকূলে ভাসাইয়া গিয়াছেন তখন আমরা একেবারে বিস্ময়রসে ডুবিয়া যাই আর গদগদ কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে—দেবতা!

এক নিশ্বাস বিনা হেমচন্দ্রের এই গতি!—হিন্দুমতে এই নিশ্বাস কি? পাঠক মহাশয় হেমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে যদি একবার তাহা ভাবিতে বসেন তাহা হইলেও সংসারের একটা কাজ হইবে। ভরসা করি ভাবিবেন। যাও তবে, অনাথের নাথ হেম, সেই দীনবন্ধু অনাথনাথের সহিত চির দিনের তরে মিলিত হওগে।

* * *

কালীতলার শ্মশানসৈকতে হেমবাবুর ভস্মকর্দ্দম লহরীমুখে ধারণ করিয়া দেবী সুরধনী, দিন—দিন—অনেক দিন হইল—শেষ ক্রীড়া করিয়াছেন। ভস্মকর্দ্দম আবিল জলে মিশিয়া গিয়াছে।—আজি আটান্ন বৎসর পরে দীপ চির নির্ব্বাপিত হইল।—হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখন কোথা?—প্রতিধ্বনি বলিতেছেন—কোথা?

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

কেন ভালবাস?

১

কেন ভালবাস এত
অভাগীরে বলনা?
সেত তার এক বিন্দু
ফিরাইয়া দিলনা।

২

নীরবে নীরবে তুমি
বহু দিন ধরিয়া,
এত ভাল বাসিয়াছ
কেন প্রাণ ভরিয়া?

৩

ভেবেছিনু এই হৃদে
কমলিনী ফুটিবে,
তুমি মধুকর তাহে
সুখে মধু পিইবে।

৪

কিন্তু মুক্তা হয় নাক—
পুকুরের ঝিনুকে ?
বল নাথ এত ভাল—
বাস তবু কিসুখে ?

৫

মনে করি কত বার
তব প্রেমে ডুবিয়া,
সংসারবৃশ্চিকজ্বালা
যাব ক্রমে ভুলিয়া।

৬

কিন্তু যে কেমন মন
কিবা তার বাসনা,
বুঝিতে নারিনু করি'
দিবা নিশি ভাবনা।

৭

কভু উড়ে যায় মন
শশধর কিরণে,
যাইতে যাইতে পুন
খেলে মৃদু পবনে।

৮

কভু বাধা বিঘ্ন করি
নিষেধেতে লঙ্ঘন,
নন্দনকাননে করে
অতি সুখে গমন।

৯
বুঝিতে নারিনু তায়
প্রকৃতি যে কেমন,
করিল না স্থির চিতে
কোন কায় কখন।

১০
হেন স্বেচ্ছাচারী মন
কিকরিব লইয়া ?
কত ভাবি একমনে
বিরলেতে বসিয়া।

১১
এত ভালবাসা ঢাল
মোর দগ্ধ পরাণে,
তবু মন নাহি ধায়
তব পানে উজানে ?

১২
তবু ব্যাকুলিত নয়
তব তরে কেনগো',
বসে থাকে জড়বৎ
শিলাখণ্ড যেনগো !

১৩
এত ভালবাসা তব
করি যবে স্মরণ,
কেন নাহি অবিরল
ঝরে দুটি নয়ন ?

১৪
ইচ্ছাকরে বক্ষপরে
রাখি তোমা' যতনে,
ফুকারি ফুকারি কাঁদি
ধরি দুটি চরণে।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৪র্থ ভাগ। } ভাদ্র, আশ্বিন, সন ১৩০৩ সাল। { ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ম গীত

দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগ।

জীবভাব—ভগবানই ধর্ম্মবুদ্ধি দাতা—প্রধানতঃ কি কি ভাবে ভগবান দৃষ্ট হন। ইত্যাদি।

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

পুনর্ব্বার মহাবাহো কহিব তোমায়
মম তত্ত্ব, প্রিয়জন-হিতকামনায়। ১
দেব ঋষি কেহ মোর আদি নাহি জানে,
সকলের আদি আমি, জানিবে কেমনে? ২
আদি নাই, জন্ম নাই, মহান্ ঈশ্বর,—
আমায় জানিলে পাপে মুক্ত হয় নর। ৩
বুদ্ধি জ্ঞান ক্ষমা সত্য আর অসংমোহ,
সুখ দুঃখ ভয়াভয় তুষ্টি সম দম,
অহিংসা অযশ যশ তপস্যা—সকল
প্রাণীভাব, আমাহতে জনমে কেবল। ৪, ৫
ভৃগুআদি সপ্তজন, পূর্ব্ববর্ত্তী তার
সনকাদি চারিজন মহাঋষি আর
স্বায়ম্ভুব আদি চৌদ্দ মনু—এ সকল
আমার মানসে সদ্যে জন্মিল কেবল, ৬

আমার সন্ততি তারা।—জানেন যেজন
এ মোর বিভূতিযোগ, তিনি যোগী হন। ৭

জগৎ সম্ভূত আর প্রবর্ত্তিত হয়
আমা হ'তে, জানি জ্ঞানী প্রীত মনে রয়। ৮

চিত্তেন্দ্রিয় যারা মোরে করে সমর্পণ,
করে সদা মোর কথা শ্রবণ কীর্ত্তন,
সে মোর ভক্তেরে করি হেন বুদ্ধি দান,
দুর্ল্লভ আমায় যাতে অনায়াসে পান। ১০

অযাচিত অনুগ্রহ করিবার তরে,
গুপ্ত থাকি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরে ;
তাতে করি তত্ত্ব-জ্ঞান—জ্যোতির সঞ্চার,
জ্ঞানরূপে নাশি আমি অজ্ঞানান্ধকার। ১১

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

পরব্রহ্ম তুমি কৃষ্ণ, পরম আশ্রয়,
স্বপ্রকাশ আদিদেব নিত্য সর্ব্বময়, ১২

বলেন তোমায় ব্যাস, অসিত, দেবল,
দেবর্ষি, ঋষিরা,—নিজে বলিছ সকল। ১৩

সত্য মানি যাহা তুমি কহিলে কেশব,
দেবদানবে না জানে তব আবির্ভাব। ১৪

দেবদেব বিশ্বপতে হে ভূতভাবন,
আপনিই আপনাকে আত্মজ্ঞানে জান। ১৫

সর্ব্বলোক ব্যাপ্ত যাতে বিভূতি তোমার,
কহত অশেষ রূপে বিশেষ তাহার। ১৬

হে যোগীন্দ্র, কিরূপে বা, কহ তা আমায়,
কোন কোন দ্রব্যে চিন্তা করিব তোমায় ? ১৭

কহ পুনঃ যোগৈশ্বর্য্য বিভূতি তোমার,
তব বাক্যামৃতে তৃপ্তি হউক আমার। ১৮

শ্রীভগবান কহিলেন:—

শুন তবে কুরুশ্রেষ্ঠ অন্ত নাই তার,
প্রধান যে কিছু কহি বিভূতি আমার:—১৯
হে পার্থ, নিয়ন্তারূপে ভূতের অন্তরে,
পরমাত্মা আমি ; আর নিখিল সংসারে,
হই আমি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণ, ২০
দ্বাদশ আদিত্যে বিষ্ণু, জ্যোতিতে তপন,
মরীচি মরুৎগণে, নক্ষত্রেতে শশী, ২১
বেদে সাম, দেব মধ্যে ইন্দ্ররূপে বসি।
ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, চেতনা জীবের,
রুদ্রেতে শঙ্কর, যক্ষরক্ষেতে কুবের ;
বসু মধ্যে বহ্নি আমি, গিরি মধ্যে মেরু, ২৩
পুরোহিত মধ্যে পার্থ বৃহস্পতি গুরু।
সেনানীতে কার্ত্তিকেয়, জলের সাগর, ২৪
মহর্ষির মধ্যে ভৃগু, বাক্যে একাক্ষর।*

* একাক্ষর = ওঁ

স্থাবরেতে হিমালয়, যজ্ঞে যপ যজ্ঞ,
দেবর্ষির মধ্যে আমি নারদ সুবিজ্ঞ। ২৫
বৃক্ষের অশ্বত্থ, চিত্ররথ গন্ধর্ব্বেতে,
আমিই কপিল মুনি সিদ্ধমণ্ডলিতে। ২৬
অশ্বমধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত গজে,
ধনঞ্জয়, রাজা আমি মানব সমাজে। ২৭
অস্ত্রমধ্যে বজ্র আমি, সর্পের বাসুকি,
ধেনু মধ্যে কামধেনু আমি হয়ে থাকি।
প্রজার উৎপত্তি হেতু কন্দর্প সে আমি, ২৮
জলেতে বরুণ আমি জলচর স্বামী।
অর্য্যমা সে পিতৃগণে, যমসংযমনে, ২৯
দৈত্যের প্রহ্লাদ, কাল সংখ্যাকারিগণে,
পক্ষীতে গরুড়, মৃগ মধ্যে সিংহ নাম, ৩০

বেগবানে বায়ু, শস্ত্রধারী মধ্যে রাম।
স্রোতেতে জাহ্নবী আমি, মৎস্যেতে মকর, ৩১
সৃষ্টির আদ্যন্ত মধ্যে বিশ্বচরাচর।
বাদী মধ্যে বাদ আমি, অধ্যাত্ম বিদ্যার, ৩২
সমাস সমূহে দ্বন্দ্ব, অক্ষরে অকার।
কর্ম্মের বিধাতা, চিরবহমান কাল, ৩৩
ভাবির উদ্ভব আমি, মৃত্যু সে করাল।
সপ্ত দেবতার রূপে নারী মধ্যে স্থিতি,—
কীর্ত্তি স্মৃতি মেধা ক্ষমা বাকশ্রী ও ধৃতি। ৩৪
মন্ত্রেতে গায়ত্রী, সাম মধ্যে মহা সাম,
ঋতুতে কুসুমাকর ধরিয়াছি নাম।
মাসেতে অগ্রহায়ণ, দ্যূত বঞ্চনায়, ৩৫
তেজস্বীর তেজ আমি, জয়শীলে জয়।
উদ্যমীর উদ্যম, সে সাত্ত্বিকের সত্ত্ব, ৩৬
বৃষ্ণিগণে বাসুদেব, এই মোর তত্ত্ব।
পাণ্ডবেতে ধনঞ্জয়, ব্যাস মুণিগণে,
শুক্রাচার্য্য হই আমি শাস্ত্র দরশনে। ৩৭
দমনকারীর দণ্ড, জয়েচ্ছুর নীতি,
গুহ্যগণে মৌন আমি গোপনীয় অতি।
আমিই জ্ঞানীর জ্ঞান, বীজ সর্ব্ব ভূতে, ৩৮
আমি ভিন্ন অন্যকিছু নাই এ জগতে। ৩৯
অনন্ত হে পরন্তপ, বিভূতি আমার,
সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিলাম সার। ৪০
প্রভাব সমৃদ্ধ আর শ্রীঐশ্বর্য্যযুত,
যাহা কিছু আছে মম তেজাংশ সম্ভূত। ৪১
অথবা হে ধনঞ্জয়, কি কাজ তোমার,
নানাবিধ ভাব শুনি ?—একাংশে আমার
বিশ্বচরাচর আমি করেছি ধারণ,
এখন ইয়ত্তা কর পূর্ণত্ব কেমন। ৪২

ইতি বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায়।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।
(৺বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত)

হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব।

হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চিয়ান্ এবং মুষলমান এই চারিটি প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম চতুষ্টয়ের অনেক শাখা প্রশাখা আছে। কিন্তু তৎসমুদয় সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কোন কিছু বলা অনাবশ্যক। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ কয়েকটি কথা মাত্র ইহাতে উল্লেখ করিব।

ব্যাসকীর্ত্তিত "সহস্র নাম" মধ্যে ভগবানের একটি নাম "অদ্ভুত"। তাঁহার জ্ঞান শক্তি কার্য্যাদি ধ্যানে আমাদের হতবুদ্ধি হইতে হয়। তৎসমুদয় চিন্তায় আমাদের চিত্ত বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। ভগবানের "অদ্ভুত" নামটি অতীব সঙ্গত।

য়ুরোপীয় কোন কোন কবিদ বলেন, বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে তত্ত্বজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আমরা জানিতে পারি যে ঈশ্বর অত্যাশ্চর্য্য, বিস্ময়জনক। বিজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা আমাদের বলেন "মানব! তুমি ঈশ্বরকে কিরূপে বুঝিবে। তাঁহার সৃষ্ট একটি বালি বিন্দুরও তুমি কিছুই বুঝ না।" পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ, দার্শনিকগণ ঈশ্বরের যে অভিধান প্রদান করিতেছেন, অতি প্রাচীনকালে বিজ্ঞানসম্মত সেই অতি প্রশস্ত, সঙ্গত নাম মুনিবর ব্যাসদেব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের এই একটি বিশেষত্ব।

তৎ+ন, সন্ধিতে, তন্ন। তদ্+ন, অর্থাৎ তিনি কিনা ঈশ্বর তাহা কিনা, রূপ, রসগন্ধাদি নহেন। আমাদের রক্তমাংসের চক্ষুর গোচর কোন কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নয়। তিনি বাক্যমনের অগোচর। তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া সুসাধ্য নহে। প্রখর বুদ্ধি তাঁহাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিহত, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে। য়ুরোপীয় অজ্ঞেয়বাদিদের (agnostics) ও এই কথা। তাঁহারা বলেন যে মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। আধুনিক অজ্ঞেয় বাদিদের উক্তি ভারতীয় প্রাচীন ঋষিদের উক্তির সদৃশ। হিন্দুধর্ম্মের এই আর একটি বিশেষত্ব। এই বিশেষ কথা ও বিজ্ঞানের অনুমত। আবশ্যক, যে প্রাচীন মুনি ঋষিদের কণ্ঠনিঃসৃত "তন্ন" শব্দের তাৎপর্য্য অতি গভীর। য়ুরোপীয় অজ্ঞেয়বাদিদের কথা তেমন সারগর্ভ নহে।

সমগ্র মানবজাতিকে পূজা করিবার জন্য কোমত উপদেশ দিয়াছেন।

আর বলিয়াছেন, মাতৃ-পূজা অতি গরিয়সী। কোমতের বহুকাল পূর্ব্বে, অতীব প্রাচীন সময়ে ভারতীয় মুনি ঋষিরা "সর্ব্বং খল্বিদং" বাক্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং পরব্রহ্মের পূজার আদেশ করিয়াছেন। এই সকল সূক্ষ্ম ও দূর-দর্শী যতিগণ পিতৃ পূজায় মাতৃ পূজার বিধান করিয়াছেন; গৌরীপট্ট-সংস্থাপিত বাণলিঙ্গের পূজায় পার্ব্বতী-পূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অপিচ ইঁহারা মাতৃ পূজারও পৃথক উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতৃমাতৃ-পূজাতেই মানুষের পরম মঙ্গল। এই শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, এবং পিতাই পরমা তপস্যা। পিতা প্রীত হইলে সকল দেবতারা প্রীতিযুক্ত হন। ইহা বলিতে হইবে না যে পুত্রের পিতৃ-পূজায় সাধ্বী স্ত্রী সবিশেষ সন্তুষ্টা হন এবং স্বামি-পূজায় নিজে পূজিতা হইতেছেন, এরূপ মনে করেন। ফলতঃ পিতা মাতা মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ দেব-দেবী। ইহাদের পূজায় পরব্রহ্মের পূজা হইয়া থাকে। মাতৃ পূজা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র বলেনঃ—

সহস্রেণ পিতুর্ম্মাতা গৌরবে নাতিরিচ্যতে।
পিতুরপ্যধিকা মাতা···
মাতরং পিতরং চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতানাং।
সহস্রন্তু পিতৄন্ মাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে।

সংক্ষেপতঃ এই সকল শাস্ত্র বচনের তাৎপর্য্য এই যে পিতা অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিক। হিন্দুধর্ম্মের এই তৃতীয় বিশেষত্ব।

অন্যান্য ধর্ম্মের মত হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বর পূজা মাত্রের বিধান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ভগবান ওতঃপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র সকলেতেই ব্যাপ্ত ও বর্ত্তমান, হিন্দুশাস্ত্রে ইহা সম্যক জানিয়াও হৃদ্বোধ করিয়া, প্রস্তর হইতে পর্ব্বত, নদী হইতে সাগর, ক্ষুদ্র নক্ষত্র হইতে চন্দ্র সূর্য্য, ওষধি হইতে বনস্পতি, বৃষ গাভী হইতে যতি আদির পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনে, গঙ্গায়, গাভীতে ঈশ্বর নাই, এমন কোন ধর্ম্মীই বলিতে সাহস করিবেন না। এরূপ স্থলে ত্রিপথগা ও অশ্বত্থের পূজায় কি বাধা হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা হৃদবোধে এবং তাহা ঈশ্বর জ্ঞানে

হিন্দু যথাতথা যে সে বস্তুর অর্চ্চনা করেন। তবে মনকে পূজোপযোগী করা অত্যাবশ্যক। হিন্দুধর্ম্মের এই চতুর্থ বিশেষত্ব।

বাইবেলের দশাদেশ মধ্যে একটি এই:—দেবদেবী মূর্ত্তিকে দণ্ডবৎ করিবে না কেন না আমিই তোমাদের ঈশ্বর এবং অসূয়াবান ঈশ্বর am a jealous God." এটী কখন প্রশস্ত ধর্ম্মের কথা নহে। ইহাতে অন্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিদের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান্‌রা ধর্ম্ম-বিদ্বেষশূন্য নহেন। স্বধর্ম্মী ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ক্রিশ্চিয়ানরা heathen কিনা বর্ব্বর বলেন। এ ভিন্ন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুদের infidel নাস্তিকও বলেন।

মুষলমানেরা হিন্দুদের কাফের কহেন। ইহাদেরও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বড় কম নহে। হিন্দুধর্ম্মবিলোপে ইহারা বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জেজিয়াদি কর সংস্থাপন করিয়া মুষলমান বাদসাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রভূত অত্যাচার করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশাল হিন্দু ধর্ম্মের একটি প্রকাণ্ড বলিলে ও বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ দৃষ্ট হয় নাই। তবে ইহারা বৈদিক ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন।

পবিত্র প্রশস্ত হিন্দুধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিদ্বেষ করেন না। হিংসা দ্বেষ নীচ অন্তঃকরণকেই আশ্রয় করে। বোধ হয় জাগতীয় অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম আপন গোষ্ঠিগত করিয়া লইতে পারেন। হিন্দুধর্ম্ম বলেন:—

ঋজু কুটিল নানা পথ জুষাং।
নৃণাম একো গম্যস্ত্বমসি পয়সার্মণব ইব॥

ঋজু কুটিল পথাশ্রয়ে লোকে তোমাকে (ভগবানকে) পাইবার জন্য ধাবিত। দিক্বিদিকে বিভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইয়া নদী সকল যেমন সাগর সঙ্গত হয় তদ্রূপ বিভিন্ন ধর্ম্মীরা যে পথে হউক কেন, ভদ্রাশয়ে তোমাকে (ভগবান-কে) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মাত্রের কণ্ঠে অবস্থিত "মহিম্ন" স্তবের এই অংশ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কি পর্য্যন্ত না উদারতা প্রকাশ পাইতেছে।
ভিন্ন অন্যে মানুষকে অঘ হইতে উদ্ধারে অক্ষম' ক্রিশ্চিয়ানের এই গর্ব্বিত বাক্য; যিনি মহম্মদকে গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল তাহারই জন্য স্বর্গরাজ্যে স্থান নিরূপিত হইয়াছে, মুষলমানের এই স্বার্থ প্রবৃত্ত ভক্তি, ঈর্ষা, দ্বেষ

পরিপূর্ণ। হিন্দু শাস্ত্র মুখে এরূপ কথা বাহির হয় নাই। হিন্দুও এ প্রকার বাক্য মুখে আনেন না। হিন্দু বলেনঃ—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
যেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ নরিষ্যতে॥

পিতা পিতামহ পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সৎ পথে চলিয়াছেন, তাহাই প্রশস্ত জানিয়া হিন্দু তাহাতেই বিচরণ করেন। ম্লেচ্ছ যবনাদির ধর্ম্মের নিন্দা অথবা বিদ্বেষ না করিয়া তিনি স্বধর্ম্মাচরণে জীবন যাপন করেন। হিন্দুধর্ম্মের এই পঞ্চম বিশেষত্ব।

এই পঞ্চম বিশেষত্ব সম্বন্ধে এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। গীতায় উক্ত হইয়াছেঃ—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

পর ধর্ম্ম ভয়াবহ এই বাক্যটি লইয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে হিন্দুধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করেন না, এমন নহে। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলেন নাই যে হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম অতি ভয়ানক। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মের প্রতিপালন অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, অন্য বর্ণের কিনা ব্রাহ্মণ কি শূদ্রের ধর্ম্ম তোমার পক্ষে ভয়াবহ। স্ববর্ণের কিনা পিতা পিতামহের ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার জন্যই [illegible]কে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন। অন্য কিনা ম্লেচ্ছ যবনাদির ধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই।

অন্যধর্ম্মের নিন্দা করিয়া মুষলমান ক্রিশ্চিয়ান আপন আপন ধর্ম্মের প্রচার করেন। স্বধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া ইহারা রক্ত-পাতে ও নিরত হইয়াছেন। হিন্দু এই হেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত নহেন। ওর জিনিস ভাল নয়, আমার জিনিস ভাল; ও ঠকাইবে আমি ঠকাইব না—হিন্দুর এ দোকানদারি নাই। হিন্দু জানেন যে যেরূপে ভগবানকে ডাকে, ভগবান সেই রূপেই তাহাকে দয়া করেন। আল্লা, ঈশা ভজিলে নরকস্থ হইবে, বাইবেল কোরাণ বাক্য একান্ত অসার, হিন্দু ভিন্ন অন্যের নরক নিশ্চয় এরূপ ভয়ানক কথা [illegible] বলেন না। যে কোন ধর্ম্মের আশ্রয়েই লোকের মঙ্গল, ঈশ্বর লাভ সম্ভব, হিন্দুর এই মত সত্ত্বে, তিনি ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? হিন্দু ধর্ম্ম-প্রচারের আবশ্যকতা দেখেন না। তাহা যে অনুচিত বোধ হয় হিন্দুর এই বিশ্বাস। হিন্দুধর্ম্মের এই ষষ্ঠ বিশেষত্ব।

ঐই ষষ্ঠ বিশেষত্ব সম্বন্ধে এই স্থলে একটি কথা বলিতে হইতেছে। অসতো সদ্গময় ইত্যাদি অসৎ হইতে আমাকে সতেতে লইয়া যাও, উপনিষদের বাক্যে বুঝা যায় যে বৈদিক সময়ে লোকে একাকী ঈশ্বরোপাসনা করিত। বয়ং ত্বাং স্মরাম ইত্যাদি আমরা তোমাকে স্মরণ করি, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত এই বাক্যে বুঝা যায় যে তান্ত্রিক সময়ে সম্মিলিত উপাসনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ঐই প্রচারে কিন্তু কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করা হয় নাই। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, হরি ভজিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিরত হইবার নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া দীন দরিদ্র কাঙ্গালের ন্যায় ভিক্ষা করেন। 'হরি নাম যাচে রে গোরা নগরে নগরে। যাচে নগরে নগরে যাচে প্রতি ঘরে ঘরে॥' বৈষ্ণবদের এই একটি প্রচলিত সামান্য গান। পরম ভক্ত, প্রেমিকশ্রেষ্ঠ শচীসুত স্বপ্নেও পরধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই।

অবতারোহ্যসংখ্যঃ॥ ভগবানের অবতার অসংখ্য; পুরাণ শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের এই কথা। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, সর্ব্ববেদস্থলীয় গীতায় এই উক্তি। যতদূর দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব ভগবানের শেষ এবং অতি শ্রেষ্ঠ অবতার। আর তিনি প্রেম-অবতার। স্বীয় আচরণ দ্বারা লোককে তিনি নিষ্কাম প্রেম শিক্ষা দেন। এই নিষ্কাম প্রেমে এককালে স্বার্থ এবং আমিত্ব বিলোপ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পারিষদ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছেঃ—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥

নিত্যানন্দ রায় ক্রোধ এবং অভিমানশূন্য ছিলেন। আমিত্ব জ্ঞান তাঁহাতে ছিল না। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য প্রভু বলিয়াছেনঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুতা।
অমানিনোমানদেয়ং কীর্ত্তনীযো সদা হরিঃ।

এককালে অভিমানাপারিশূন্য, যারপরনাই নম্র ব্যক্তিই কেবল ভগবানের নাম কীর্ত্তনে অধিকারী ও সক্ষম। কণামাত্র অভিমান সত্বে মানুষ ঈশ্বর পূজায় অধিকারী হন না। আমি একজন যিনি ভাবেন, ভাগবান তাহার সন্নিহিত হন না, দূরে থাকেন। সেইহেতু চৈতন্যদেব এই মূলমন্ত্র ব্যবহার

করেন। নিরহঙ্কার ভিন্ন অন্যের ঈশ্বর লাভ হওয়া দুর্ঘট। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রায়ই অভিমানী, অহঙ্কারী। সেইজন্য বিদ্যারস্থলী পাণ্ডিত্যের ভূমি নবদ্বীপে কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হন। দাঁতে কুটা করিয়া নিমাই পা[illegible] ঘরে ঘরে যাইয়া প্রেম ভিক্ষা করেন। তাঁহারই মত নম্র হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য লোককে উপদেশ দেন। বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেম এবং পদাবনত নম্রতা শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে পাণ্ডিত্যভূমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। সোঽহং জ্ঞানে ঈশ্বরকে নিকটস্থ না করিয়া বোধ হয় সুদূরস্থিত করে। আমি কিছুই নয়, তিনিই (ভগবান) সব, এই জ্ঞান, মনের এই দীন ভাব ভিন্ন, দীননাথ হরিকে পাইবার অন্য উপায় নাই। তাই একান্ত নম্রতা, আমিত্ব বিরহিত নিষ্কাম প্রেম শিক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীচৈতন্যদেব লোককে দিয়াছিলেন। যে যাহা বলুক, শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম পরম পবিত্র প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম বই আর কিছুই নহে। এই একান্ত নম্রতা ও নিষ্কাম প্রেমিকতা হিন্দুধর্ম্মের এই সপ্তম বিশেষত্ব।

শ্রীদীননাথ ধর।

পাগলিনী।

১

আমি পাগলিনী রাই,
আকুলিত চিতে,
চাহি চারিভিতে,
যদি তা'র দেখা পাই।
গাহে পিককুল,
মধুর মৃদুল,
শ্যাম-বাঁশী ভ্রমে চাই।

২

আমি পাগলিনী রাই,
নিঠুর পাষাণ
কাড়ি লয়ে প্রাণ
কোথায় গেলে কানাই,
পাগল করিয়া
দিয়াছ ছাড়িয়া
ছি ছি লাজে মরে যাই।

৩

আমি পাগলিনী রাই,
আসিব বলিয়া
গিয়াছ চলিয়া
আমি ইতি উতি চাই,
যদি আসিবেনা
কেন এ ছলনা,
কেন আশা দিলে ছাই!

৪

আমি পাগলিনী রাই,
তোমা বিনা হায়,
মরি যাতনায়,
বারেক তা বুঝ নাই।
পুরুষের প্রাণ
এমন পাষাণ
আগে কে জানিত ছাই!

৫

আমি পাগলিনী রাই,
গুরুজন মাঝে,
ব্যস্ত রহি কাযে,
তবু কি নিস্তার, পাই?
'ওই এল এল'
সদা প্রাণে ভেল,
শতবার ছুটে যাই।

৬

আমি পাগলিনী রাই,
নিরাশ হইয়া
মরমে মরিয়া
কাতরে ভূমে লোটাই।
তুমি আসিলে না
তুমি দেখিলে না
নাহি এ দুখের ঠাঁই।

৭

আমি পাগলিনী রাই,
তব ভালবাসা
নাহি করি আশা,
কেবল দেখিতে চাই,
হৃদয়ে বসাব,
প্রণয়ে পূজিব
অন্য কোন সাধ নাই।

৮

আমি পাগলিনী রাই,
ভরি প্রাণ মন,
ভকতি ব্যঞ্জন,
করিব হে সর্ব্বদাই,
এই আশা মোর,
পুর মনোচোর,
আর কিছু নাহি চাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

তুলসীদাস

অধিকাংশ হিন্দুই তুলসীদাসের নাম ও তাঁহার কৃত রামায়ণের কথা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু অনেকেই এই মহাত্মার জীবনবৃত্তান্ত অবগত নহেন। কথিত আছে যে বেণীমাধব দাস কৃত গোসাঁইচরিত্র নামক পুস্তকে তুলসী দাসের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকেই সে পুস্তকের বিষয় অবগত নহেন। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত নাভাজী নিজের রচিত "ভক্তমালা" নামক পুস্তকে সামান্য একটু তুলসীদাসের জীবনী সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

নাভাজী তুলসীদাসের সময়ের একজন বিখ্যাত ব্রজভাষিক কবি ছিলেন। সুতরাং তিনি যাহা উক্ত গোসাঁই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য। সম্বৎ ১৭৬৯ অর্থাৎ তুলসীদাসজীর মৃত্যুর ৮৯ বৎসর পরে প্রিয়াদাস নামক জনৈক কবি "ভক্তমালা"র যে টীকা লিখেন তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টভাবে তুলসীদাসের বিষয় জানা যায়।

তুলসীদাসজী সরযূপারিণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কান্যকুব্জ বলা ভ্রমাত্মক মাত্র। কনোজের ব্রাহ্মণেরা দান লওয়া বা কোন দ্রব্যের জন্য কাহারও নিকট যাচ্ঞা করা ঘৃণার্হ এবং নীচ কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তুলসী দাসজী নিজের কবিতাবলীর মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন "জায়ো কুল মংগণ" (উত্তরাকাণ্ড ৭২) অর্থাৎ যাচকের বংশে আমার জন্ম হইয়াছিল। এই নিমিত্তই তাঁহাকে সরযূপারিণ ব্রাহ্মণ বলা অবিধেয় নহে। তিনি পরাশর গোত্রিয় এবং দ্বিবেদী অর্থাৎ দোবে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৫৮১ সম্বতে মূলা নক্ষত্রে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, অশুভ নক্ষত্রে কাহারও সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিলে পিতামাতা তাহাকে সেইস্থানে ঈশ্বরভরসা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতেন, অথবা যদি নিতান্তই অপত্যস্নেহের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে না পারিতেন তথাপি আট মাস পর্য্যন্ত পুত্রের মুখদর্শন করিতেন

না।* কারণ অশুভ নক্ষত্রে পুত্র জন্মিলে পিতার অমঙ্গলের কারণ বলিয়া গণনীয় হইত। তখনকার প্রথানুসারে তুলসীদাসের পিতাও তাঁহাকে ঈশ্বরভরসা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান। কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় জনৈক সাধু অনতিবিলম্বে তাঁহাকে (তুলসীদাসকে) নিজের আশ্রমে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস কৃত "বিনয় পত্রিকা" দৃষ্টে তাঁহার শৈশব অবস্থার বিষয় জানা যায়। এক স্থানে লিখিয়াছেন "জননী জনক ত্যজি জনমি, করম বিনু বিধি হুঁ সিরজ্যো অবতেরে" অর্থাৎ আমি ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতামাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান এবং ঈশ্বর আমাকে মন্দভাগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি উক্ত সাধুর আশ্রমে বাল্যাবস্থা কাটাইলেন এবং সাধু তাঁহাকে রামায়ণের বিষয় শুনাইতেন ও অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন।

তুলসীদাস নিজের রচিত রামায়ণ বালকাণ্ডের একস্থানে লিখিয়াছেন যথা :—

মৈঁ পুনি নিজ গুরুসন শুনি, কথা সুসূকর খেত।
সমুঝনহীঁ তসু বালপন, তব্ অতি রহেউঁ অচেত॥

অর্থাৎ আমি আমার গুরুর নিকট সুসূকর খেতে রামায়ণের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম বলিয়া সকল কথা বুঝিতে পারি নাই। ইঁহার গুরুর নাম নরহরি ছিল। তাহার প্রমাণ এই যে তিনি রামায়ণের আদিতে লিখিয়াছেন :—"বন্দৌ গুরুপদ কংজ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।" অর্থাৎ দয়ার সাগর নরহরি আমার গুরুদেবের চরণে নমস্কার করি। এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া গুরুর নাম লেখেন নাই, কেন না এদেশীয় লোকের ধারণা আছে যে অনর্থক গুরুজনের নাম করিলে পাপ হয়।

তুলসীদাসের পিতার নাম আত্মারাম শুক্ল দোবে এবং জননীর নাম হুলাসী দেবী ছিল। দীনবন্ধু পাঠক ইঁহার শ্বশুর ছিলেন এবং রত্নাবলী দেবী তুলসীদাসের স্ত্রীর নাম ছিল। তুলসীদাসের প্রকৃত নাম রামবোলা

*মুহূর্ত্ত-চিন্তামণি :—"জাতম্ শিশুম্ তত্র পরিত্যাজেদ্বা মুখম্ পিতাহস্য অষ্টমাস ন পশ্যেৎ" অর্থাৎ জাত শিশুকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিবে অথবা পিতা আট মাস পর্য্যন্ত শিশুর মুখ দেখিবে না।

ছিল, তৎপরে গুরুদেব 'তুলসীদাস' এই নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার জন্মভূমি সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মত যে চিত্রকূটের নিকট হাজীপুরে ইহার জন্ম হইয়াছিল, কেহ বা বলেন যে বান্দা জেলায় রাজাপুর গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয় এবং কেহ বা বলেন যে হস্তীনাপুরে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত প্রবাদই বিশ্বাসযোগ্য, কেন না তুলসী-দাসজী সুস্থকর খেতে অর্থাৎ বর্ত্তমান সোরোঁ গ্রামে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

ইহাঁর পিতা বর্ত্তমান থাকিতে ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুর পরে তারক নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহারা সকলেই স্মার্ত্ত-বৈষ্ণব ছিলেন এবং শিবেরও উপাসনা করিতেন। মধুসূদন সরস্বতী তুলসীদাসের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তুলসীদাসজী স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এমন কি অধিকক্ষণ তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। এক সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে না জানাইয়া পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তুলসীদাসজী অনতিবিলম্বে তাঁহার বিয়োগে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে আপনাদের গৃহাভিমুখে আসিতে দেখিয়া যার পর নাই লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন :—

লাজ ন লাগত আপুকো, ধোরে আয়হু সাথ।
ধিক্ ধিক্ য়্যাসে প্রেমকী, কহা কহৌঁ মৈঁ নাথ ॥
অস্থি চর্ম্ম মায়া দেহ মম্, তামোঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী জোঁ শ্রীরাম মঁহ, হোত ন তৌ ভবভীতি ॥

অর্থাৎ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে আপনার কি একটুও লজ্জাবোধ হইতেছে না? ধিক্ এমন প্রেমিককে? যত প্রেম তুমি অনিত্য অস্থি চর্ম্মে নির্ম্মিত শরীরের উপর দেখাইতেছ ততোধিক প্রেম যদি তুমি সেই (নিত্য নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম) শ্রীরামচন্দ্রের চরণে করিতে তাহা হইলে এই অনিত্য সংসারের মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারিতে।

তাহার স্ত্রীর এই কয়েকটী কথা তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে প্রবেশ করিল এবং সংসারের মোহরূপ নিদ্রা হইতে তাঁহাকে জাগাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার স্ত্রী আহারের জন্য অনেক অনুনয় করিলেন কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না। তুলসীদাসজী আর

গৃহে ফিরিলেন না। তাপসবেশ ধারণ করিয়া রামনাম ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

যখন তিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান তখন তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী এই পত্র লিখিয়াছিলেন :—

কটী কী খীনি কনকসী, রহত সখিন সংগ সোয়।
মোহি কটে কী ডর নহীঁ, অনত কটে ডর হোয়॥

অর্থাৎ আমি কটিদেশস্থ ক্ষীণ স্বর্ণহারের সদৃশ সর্ব্বদা সখীদের সহিত বাস করিব, অতএব আমার কোন প্রকার ভয় নাই, কিন্তু আপনি যদি কোন কুলোকের ছলনায় ভুলিয়া যান ইহাই আমার ভয়ের কারণ।

তুলসীদাসজী তাহার এই উত্তর দিয়াছিলেন :—

কটে এক রঘুনাথ সংগ, বাঁধি জটা শিরকেশ।
হমতো চখ্যা প্রেমরস, পত্নীকে উপদেশ॥

অর্থাৎ আমি মস্তকোপরি জটা ধারণ করিয়া শ্রীরঘুনাথজীর ফাঁদে পড়িয়া আছি এবং পত্নীর উপদেশে কেবল এই প্রেমরস পান করিয়াছি। এই উত্তর শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং পতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনেক বৎসর পরে যখন তুলসীদাসজী বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন এবং রামনামে খুব মত্ত ছিলেন সেই সময়ে চিত্রকূট হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় না জানিয়া শুনিয়া নিজ শ্বশুরের গৃহে যাইয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য চাহিলেন। তাঁহার স্ত্রীও অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি দ্রব্য আহার করিবেন? তিনি বলিলেন যে আমি নিজেই রন্ধন করিব। তাঁহার স্ত্রী আহারের জন্য সকল জিনিস আয়োজন করিয়া দিলেন। তিনি স্মার্ত্ত বৈষ্ণবদিগের মত রন্ধন করিয়া আহার করিতে বসিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের বিষয় কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ আপনাকে মির্চা আনিয়া দিব? তিনি বলিলেন আমার ঝোলায় আছে। তাঁহার স্ত্রী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাকে কিছু "খাটাই" বা চাট্‌নি আনিয়া দিব? তিনি বলিলেন সকল আমার ঝোলায় আছে। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চরণ ধোয়াইবার জন্য চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী মনে মনে কত ভাবিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে তিনি স্বামীসহগামিনী হইতে পারেন। পরদিবস প্রাতে তিনি পতির নিকট যাইয়া তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তুলসীদাসজী কিছুই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন নাই? তুলসীদাস বলিলেন "না"।

তখন তাঁহার স্ত্রী আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত যাইবার জন্য যত্নবতী হইলেন এবং বলিলেন:—

খরিয়া* খরিকপুর লোঁ, উচিত ন পিয় তিয় ত্যাগ।
কৈ খরিয়া মোহি মেলি কৈ, অচল করেঁা অনুরাগ॥

অর্থাৎ যখন আপনি ঝোলাতে খড়ি, মির্চা ও কর্পুর ইত্যাদি দ্রব্য রাখিয়াছেন তখন হে স্বামিন্ আপনার সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আপনি এই সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করুন, নচেৎ আমাকেও আপনার ঝোলার মধ্যে লউন। এই কথা শুনিয়া তিনি ঝোলাস্থিত দ্রব্য সকল ব্রাহ্মণকে দান করিয়া প্রস্থান করিলেন; এবং তাঁহার স্ত্রীর এই কথাতে তাঁহার আরও জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

তুলসীদাস জী প্রথমেই অযোধ্যায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন, সেখানে তিনি স্মার্ত্ত বৈষ্ণবের ন্যায় থাকিতেন এবং এই প্রকার প্রবাদ আছে যে শ্রীরামচন্দ্র স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং হিন্দি ভাষায় রামায়ণ লিখিবার জন্য আজ্ঞা করেন। সেই আজ্ঞানুসারে সম্বৎ ১৬৩১ চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের নবমীতে মঙ্গলবারে তিনি রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করেন। রামায়ণ বালকাণ্ডে লিখিত আছে:—

সম্বত সোরহ সৈ ইকতীশ। করেঁা কথা হরিপদ ধরি সীস॥
নৌমীভোম বার মধুমাসা। আবধপুরী যহ চরিত প্রকাশা॥
জেহি দিন রামজন্মশ্রুতীগাবহি। তীরথ সকল তঁহা চলি আবহিঁ॥

তিনি সম্পূর্ণ অযোধ্যাকাণ্ড না লিখিতেই বৈষ্ণবদিগের সহিত বিরোধ হওয়ায় কাশীতে আসিয়া রামায়ণ লেখা সম্পূর্ণ করেন। তিনি অসীঘাটে

*খরিয়া বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের ঝোলাকে বলে। উহা খেরো কাপড়ের নির্ম্মিত।

লোলার্ককুণ্ডের নিকট বাস করিতেন। সেই ঘাট অদ্যাপিও তুলসীঘাট নামে প্রসিদ্ধ আছে।

এক সময় তুলসীদাসজী চিত্রকূটের জঙ্গলে হা রাম হা রাম করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে একটী লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে অনতিদূরে রামলীলা হইতেছে দেখিতে যাইবেন? তিনি অতিশয় আহ্লাদসহকারে রামলীলা দেখিতে গেলেন এবং সেই নিবিড় বনের মধ্যে অপূর্ব্ব রামলীলা দর্শন করিলেন। সেখানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনুমানকে দেখিলেন। তৎপরে একে একে তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন ও রামলীলাও শেষ হইল। তুলসীদাসজী পরম পুলকিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন সেই সময়ে একজন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বার্ত্তালাপ হয়, এবং তিনি এই অসময়ে রামলীলা হওয়া অসম্ভব বলিয়া অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন না। তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্র যে তাঁহাকে ছলনা করিয়া অন্তর্ধান করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া বড়ই অনুতাপ করিতে লাগিলেন; এবং সেই অবধি দৃঢ় ভক্তির সহিত রামনাম ধ্যানে মগ্ন হইলেন। রাত্রিতে হনুমান তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন হে তুলসী মনুষ্যকুলে তুমিই ধন্য, কেন না ত্রৈলোক্যের নাথ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তোমাকে দর্শন দিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।

বারাণসীধামে একদিন গৃহে যাইতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। সেই সময়ে ৩।৪ জন দস্যু "মার মার" শব্দে তাঁহাকে পথের মধ্যে আক্রমণ করে। তিনি ভীত না হইয়া এই শ্লোকটী পাঠ করেন:—

বাসর ঢাসনি কে ঢকা, রজনী চহুঁদিশি চোর।
দলত দয়ানিধি দেখিয়ে, কপি কেশরী কিশোর॥

অর্থ:—দিনে আমাকে ঠাট্টাবাজদিগের ধাক্কা খাইতে হয় এবং রাত্রিতে এখন চোরে ঘিরিয়াছে অতএব হে কেশরীর পুত্র দয়ার নিধি হনুমান আমি বড় কষ্ট পাইতেছি দেখ। তখনি কোথা হইতে অকস্মাৎ হনু আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। চোরেরা কে কোথায় পালাইয়া গেল এবং তুলসীদাস জী নির্ব্বিঘ্নে আশ্রমে পৌছিলেন।

আকবর বাদশাহের মন্ত্রী বৈরাম খাঁয়ের পুত্র নবাব আব্দু রহিম তুলসী-

দাসের বন্ধু ছিলেন একসময়ে তুলসীদাস জী তাঁহাকে এই অর্দ্ধ শ্লোকটী লিখিয়াছিলেন:—

স্থরতিয় নরতিয় নাগতিয়, বেদন সহ সবকোই।

অর্থাৎ দেবতাদিগের স্ত্রীগণের বা নাগদিগের স্ত্রীগণের অথবা মনুষ্যদিগের স্ত্রীগণের সকলকেই দুঃসহ প্রসব বেদনা সহ্য করিতে হয়।

নবাব তাহার এই উত্তর দিয়াছিলেন:—

গর্ভ লিয়ে হুলসী ফিরে, তুলসীসে স্থত হোয়॥

অর্থাৎ এত কষ্ট থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীগণ অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে গর্ভ ধারণ করেন এই আশাতে যে তুলসী সদৃশ পুত্র উৎপন্ন হইবে।

রাজা তোড়রমল তুলসীদাসজীর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। ১৫৮৯ খৃঃঅব্দে তাঁহার মৃত্যুর সময়ে তুলসীদাস তাঁহার স্মৃতির জন্য এই কবিতাটী রচনা করেন:—

মহতো চারো গাঁও কো, মনকো বড়ো মহীপ।
তুলসী যা কলিকালমেঁ, অথযে তোড়র দীপ॥
তুলসীরাম সনেহকো, সিরধর ভারী ভার।
তোড়র ধরেন কাঁধহু, জগকর রহেউ উতার॥
তুলসী উরথালা বিমল, তোড়র গুণ গণ বাগ।
সমুঝি স্থলোচন সীঁচিয়ে, উমগি উমগি অনুরাগ॥
রামধাম তোড়র গয়ে, তুলসীভয়েউ নিসোচ।
জিয়বো মীত পুনীত বিনু, যহী বড়ো সঙ্কোচ্॥

ক্রমশঃ

শ্রীকে:—

শান্তি।

মানুষ স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু শান্তিস্থল নিরূপিত করিতে না পারিয়া বিপথে ছুটিয়া যায় সেই জন্যই তাহারা শান্তির পরিবর্ত্তে প্রতিনিয়ত অপার অশান্তি অনলে দগ্ধ হয়।

আমরা দুর্ব্বল জীব জগতে আসিয়া জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল "সুখ সুখ" করিয়া আকুল পিপাসীর ন্যায় সংসারশ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি কিন্তু আমরা সুখের আশায় প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া যে বস্তুর দিকে ধাবিত হইতেছি সেই বস্তুই আমাদিগকে অনন্ত অশান্তি প্রদান করিয়া থাকে। অমৃতের আশায় আকুল প্রাণে আমরা যাহার নিকট ছুটিয়া যাইতেছি সেই আমাদিগকে গরল উদ্গীরণ করিয়া দিতেছে। তবুও আমরা সুখের আশায় নিরস্ত হইতে পারি না। এই মুহূর্ত্তে যে বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিভৃতে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছি পরমুহূর্ত্তেই আশার মোহিনী শক্তিতে তাহা আয়ত্বা-ধীন করিয়া লইতে পারি। সংসারের তীব্র বিষে যখন হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে তখন মনে করি "আর এ মোহ কারায় আবদ্ধ হইয়া থাকিব না।" যখনই হৃদয়মধ্যে এই ভাব উদয় হয় তখনই আশা মধুর হাস্য বিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিল "ভয়কি চিরদিন সমান যায় না আবার সুখ পাইবে।" "আবার সুখ পাইবে" কথাটি হৃদয়ের প্রতি ধমনীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আশায় বুক বাঁধিলাম। আশার মধুর বাক্যে উৎসাহিত হইয়া আবার পুতি-গন্ধময় বিষয় বিষে আকৃষ্ট হইলাম। আমার সে বৈরাগ্য সে সঙ্কল্প কোথায় পলায়ন করিল? মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল পুতিগন্ধময় বিষয় বিষে আবদ্ধ হইয়া থাকে কেন? ইহা কেবল মাত্র মোহের কার্য্য। মানুষ যতদিন মোহের হস্ত এড়াইতে না পারে ততদিন বিষয় বিষে আবদ্ধ থাকিয়া নানারূপ অশান্তি উপভোগ করে মাত্র। জীবের হৃদয়ে দুইটি শক্তি আ একটি তাহার স্বকীয় শক্তি অপরটী শ্রীভগবানের শক্তি। মানুষ স্বকী শক্তিতে যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে তাহাই পার্থিব ও অশান্তি পূর্ণ; শ্রীভগবানের শক্তিতে জীব যাহা করিয়া থাকে তাহাই শান্তিময় ও পরমানন্দ

পূর্ণ হয়, কেন না তিনি শান্তিময়, আনন্দময়। তাঁহার শক্তিতে জীবের কখনই অশান্তি উৎপন্ন হইতে পারে না।

অনেকে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়াও বলিয়া থাকেন "তিনি করাইতেছেন আমি করিতেছি মাত্র"। ইহা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক কথা। যদিও জীব সম্পূর্ণ তাঁহার অধীন তথাপি তিনি জীবকে একটি নিজস্ব শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যেমন দাস সম্পূর্ণ প্রভুর অধীন হইলেও তাহার নিজের একটু স্বাধীনতা থাকে, সেই স্বাধীনতার প্রভাবে প্রভুর বিনা আদেশেও সে মদ্য পান ইত্যাদি অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানও সেইরূপ জীবকে একটি নিজস্ব শক্তি প্রদান করিয়াছেন জীব সেই শক্তি অবলম্বন করিয়া সেচ্ছাচারিতার ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া যন্ত্রণা পাইয়া থাকে।

আবার জগতে এমন অনেক পাষণ্ড আছে যাহারা নিজ কৃত পাপে দগ্ধ হইয়া যখন যন্ত্রণায় আকুল হয় তখন বলিয়া থাকে "ঈশ্বর নিষ্ঠুর"। ইহা অতি হৃদয়হীন ব্যক্তিরই কথা। তিনি নিষ্ঠুর নহেন সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে যিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখেন তিনি কখনই নিষ্ঠুর হইতে পারেন না অধিকন্তু তিনি অসীম দয়াল। তবে মানুষ যে প্রতিনিয়ত কত দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়া থাকে তাহা কেবল তাহার নিজ কৃতপাপের ফলভোগ করে মাত্র। মনে কর তোমার বাড়ীতে যে সকল দাস দাসী আছে তুমি তাহাদিগকে যথেষ্ট ভাল বাস যথেষ্ট দয়া কর কিন্তু তাহারা যদি কোন অন্যায়াচরণ করে তুমি কি তাহাদিগকে তিরস্কার করিবে না? অবশ্যই করিবে। আমরাও জগৎপ্রভুর দাসানুদাস মাত্র। তবে কেন অন্যায়াচরণের জন্য তাঁহার নিকট দণ্ড না পাইব? দাসের অন্যায়াচরণে দণ্ড করিবার অধিকার প্রভুর অবশ্যই আছে। তাই বলিয়া প্রভু নিষ্ঠুর পদ বাচ্য হইতে পারেন না।

মানুষ শ্রীভগবানের চরণ তট ব্যতীত শান্তি বা সুখের আশায় যেখানে যাইবে সেই খানেই নিরাশ হইবে। কেন না শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য কিছুই সুখ বা শান্তির পদার্থ নাই। যদি প্রকৃতই সুখ শান্তি পাইতে হয় তবে শ্রীভগবানকে ভাল বাসিতে হয়, তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিলেই জীব অনন্ত সুখে সুখী হয়। "শ্রীভগবান অপার শক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র জীবের সাধ্য কি যে তাঁহাকে ভাল বাসিবে"। এই ভ্রমাত্মক ধারণা বশতঃই অনেকে

পিছাইয়া পড়েন তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করেন না। কিন্তু তিনি অতী শক্তি সম্পন্ন হইলেও অতীব মধুর। জীবের তাঁহাকে ভাল-বাসিবার অধিকার আছে। দাসের কি প্রভুকে ভালবাসিবার অধিকার নাই? অবশ্যই আছে। তবে তাঁহাকে ভাল বাসিবার উপায় কি? ভাল বাসিবার কোন উপায় নাই। ভালবাসা জোর করিয়া হয় না। শিক্ষা করিয়া ভালবাসা যায় না। বিদ্যান বিদূষী হইলেই ভাল বাসিতে পারে না। ইহা হৃদয়ের একটি মধুর বৃত্তি। মনের মত লোক পাইলেই তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে পরস্পরের দোষ গুণ বিচারের পূর্ব্বেই পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সংস্থাপিত হইয়াছে যে স্থলে এরূপ না হইয়া দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক ভালবাসা হয় সেখানে প্রকৃত ভালবাসা নাই, দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক যেখানে ভালবাসা সঞ্চারিত হয় সে ভালবাসাকে গুণজমোহ বা কৃতজ্ঞতা বলা যাইতে পারে। ভালবাসা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। গুণজমোহ বা কৃতজ্ঞতা প্রকৃত ভালবাসা হইতে অনেক নিকৃষ্ট। যথার্থ প্রেমিককে জিজ্ঞাসা কর "কেন ভাল বাস"? উত্তরে শুনিবে "কেন ভালবাসি জানি না ভাল বাসি বলিয়া ভালবাসি"। বাস্তবিক ভালবাসার নিয়মই এই। ইহা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না।

জীবে সাধারণতঃ একটি সম্বন্ধ পাতাইয়া ভালবাসা শিক্ষা করিয়া থাকে। সম্বন্ধ পাতাইলে ভালবাসা সহজ হয়। অতএব শ্রীভগবানের সহিত একটি সম্বন্ধ পাতাইলে তাঁহাকে কিরূপ ভালবাসিতে হয় ইহা সমাজে শিক্ষা করিতে পারা যায়। বলিতে পার "তিনি জগৎপতি তাঁহার সহিত কি জীবের কোন সম্বন্ধ নাই যে সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে"। শ্রীভগবানের সহিত নিশ্চয়ই জীবের একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে কিন্তু মানুষ মহাবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে হৃদয় হইতে তাঁহাকে অনেক দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছে সুতরাং তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য পুনঃসম্বন্ধ সংস্থাপন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যিনি যত নিকট আত্মীয় তাঁহাকেই আমরা তত অধিক ভালবাসিয়া থাকি অতএব যে সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, যে সম্বন্ধে ভাল-বাসার আকর্ষণ বড়ই অধিক, শ্রীভগবানের সহিত জীবের সেই সম্বন্ধ সংস্থা-পিত করাই কর্ত্তব্য। এরূপ সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রী ব্যতীত জীব জগতে অন্য কিছুই নাই। অতএব শ্রীভগবানের সহিত এই মধুর সম্বন্ধ পাতানই জীবের একান্ত

বাঞ্ছনীয়। তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিলেই তিনি তোমার হইবেন। অন্য কোন কঠোর সাধনা করিতে হইবে না। পতিকে আপনার করিয়া লইবার জন্য পত্নীকে কি কোন কঠোর সাধনা করিতে হয়? কিছু নহে। কেবল প্রাণভরা ভালবাসা ঢালিয়া দিতে হয় মাত্র।

ভগবানকে কিরূপে পাওয়া যায় তাহা বলা বড়ই দুরূহ, কেন না তাঁহাকে পাইবার জন্য এপর্য্যন্ত কোন একটি বিশেষ পথ স্থিরীকৃত হয় নাই, অনেক পথ রহিয়াছে। যাঁহার যেটি ইচ্ছা তিনি সেইটি অবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাকে পাইবার কোন পথটি প্রশস্ত আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাহা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় তিনি প্রেমময়, তিনি আর কিছু চাহেন না কেবল মাত্র যোল-আনা প্রেম চাহেন। যিনি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারেন তিনি তাঁহারই হইয়া থাকেন। তিনি অসীম শক্তি সম্পন্ন হইলেও ভক্তাধীন বটেন। অসীম ভালবাসার বলেই সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যশোদা তাঁহার কোমল হস্তে রজ্জু বন্ধন করিয়াছিলেন। ভালবাসার বশীভূত হইয়াই তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাকে পাইবার জন্য ভালবাসাই একমাত্র প্রশস্ত পথ। যিনি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন শ্রীভগবান কি অমূল্য রত্ন, জীবের কতদূর নিজ জন। যিনি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন তিনি জানেন "জগতে আর কেহ নাই কেবল আমি ও শ্রীভগবান আছি"। সুতরাং জগতের কোন দুর্ঘটনাই তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে না। তাঁহার নিকট সংসারের তাবৎ শোক দুঃখ দারিদ্র্য কিছুই আসিতে সক্ষম হয় না। শ্রীভগবান পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তাঁহার আবার দারিদ্র্য কি? তিনি পরম শান্তিময় যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তিনি আবার শোকে কাতর হইবেন কেন? তাবৎ সুখ শ্রীভগবানের চরণতটে নিহিত রহিয়াছে। যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তিনিই সেই তাবৎ সুখের অধিকারী হইয়াছেন পার্থিব দুঃখ তাঁহার কিছুই করিতে পারে না।

বালক প্রহ্লাদ যখন হরিনামে উন্মত্ত হইয়া পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তখন হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়া-

ছিলেন ? কিন্তু কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির বিনাশ নাই। প্রহ্লাদ অশেষরূপে পিতার নিকট উৎপীড়িত হইয়াও হরিনাম ভুলিতে পারেন নাই। মহাত্মা হরিদাস যবনের অত্যাচারে কতই লাঞ্ছিত হইয়া পরিশেষে বাইশ বাজারের দণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন তবুও তিনি কিছুমাত্র দুঃখানুভব করেন নাই। যবনগণ যথা শক্তিতে তাঁহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতেছে আর তিনি বলিতেছেন:—

"এসব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।" বৃন্দাবন দাস।

সাধারণ মনুষ্যে কি এরূপ পারিত ? কখনই পারিত না। তিনি কৃষ্ণ প্রেমামৃতে ডুবিয়াছিলেন তাঁহার অস্তিত্ব কৃষ্ণপদে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সামান্য বেত্রাঘাত তাঁহার কি করিবে ? এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় পার্থিব শোক দুঃখ ভগবদ্‌ভক্তদিগের কিছুই ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে না। ভগবদ্‌ভক্তদিগের নিকট হরিনাম আয়সবর্ম্ম স্বরূপ। পার্থিব শোক দুঃখ রূপ শলাকা সকল তাহা স্পর্শ করিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়েই ভগবৎপ্রেমের ফোয়ারা নিহিত আছে, কিন্তু তাহা পাপ রূপ আবর্জ্জনায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সাধন ভজনরূপ কোদালী দ্বারা সেই ফোয়ারার মুখ পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। যে মুহূর্ত্তে ফোয়ারার মুখ পরিস্কৃত হইবে সেই মুহূর্ত্তেই ভগবৎপ্রেমামৃত উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিবে, মানবের দগ্ধ হৃদয় সেই অমৃত স্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

তিনি পরশমণি, আমরা কদাকার লৌহ খণ্ড পাপ পঙ্কে আবৃত হইয়া রহিয়াছি সেইজন্য সেই পরশমণিতে স্পর্শিত হইতে পারিতেছি না, যেদিন নিজকৃত পাপে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিবে সেইদিন সেই নয়নাশ্রুতে পাপের পঙ্কিলতা কোথায় ভাসিয়া যাইবে। যে দণ্ডে আমরা পাপকর্দ্দমশূন্য হইব সেই দণ্ডেই সেই পরশমণির স্পর্শে স্বর্ণ হইয়া যাইব অর্থাৎ আমাদের হৃদয় ত্রিতাপশূন্য হইয়া ভগবৎপ্রেমে ভাসিতে থাকিবে। পার্থিব দুঃখ যন্ত্রণার জন্য আর হাহাকার করিব না। কিন্তু পাপকর্দ্দমশূন্য না হইলে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিব না যতক্ষণ তাঁহার নিকট না পৌঁছিতে পারিব ততক্ষণ আমরা কিছুতেই শান্তি পাইব না।

মনুষ্যপ্রকৃতি একরূপ নহে। প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার।

অনেক চঞ্চল ব্যক্তিগণ দুইদিন কাল ভগবদ্‌সম্মিলনের জন্য সামান্য মাত্র চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইয়া বলিয়া থাকেন "আমি এত করিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম তিনি দেখা দিলেন না। তিনি নাই, থাকিলে নিশ্চয়ই দেখা পাইতাম"। ইহাও অতি অর্ব্বাচিনের যুক্তি। কত যুগযুগান্তর কত পাপ করিয়া আসিতেছ দুই দিনেই কি সে পাপের পঙ্কিলতা ধুইয়া গেল! আর তুমি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী এমন কি কাজ করিয়াছ যে শ্রীভগবান তোমাকে দেখা দিবেন! তিনি অসীম অনন্ত, ক্ষুদ্রজীব তাঁহার জন্য যতই করুক তাহা যথেষ্ট নহে তবে কি ক্ষুদ্রজীব তাঁহার দেখা পাইবে না? অবশ্যই তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার দেখা পাইবে। তুমি যদি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিয়া থাক তবে দয়ালপ্রভু তোমার সন্তোষার্থে দয়া করিয়া অবশ্যই তোমাকে দেখা দিবেন। তুমি তাঁহার জন্য অনেক খাটিয়াছ অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছ সেই জন্যই যে তিনি তোমাকে দেখা দিবেন এমত নহে। তিনি ভক্তাধীন। ভক্তের ক্লেশ তাঁহার অসহনীয়। তুমি তাঁহার বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইলে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি অসীম দয়াল অবশ্যই তোমাকে বিমলানন্দ দান করিবেন।

মানুষ স্বভাবতই ভালবাসা প্রিয়। একজনকে প্রাণ ভরিয়া না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং একটি ভালবাসার পাত্র খুঁজিয়া বেড়ায় পরে মনের মত লোক পাইলেই সেই ভালবাসা তাঁহাকে অর্পিত হয়। কিন্তু জীবজগতে বিশুদ্ধ ভালবাসা আদৌ সম্ভবে না—"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম জীবে না সম্ভবে"। মানুষ মানুষকে ভালবাসিয়া মোহাবদ্ধ হইয়া দুই দিন মাত্র সুখানুভব করিয়া থাকে। সেই মোহ অন্তর্হিত হইলে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন হৃদয় অন্ধকার হইয়া পড়ে। জীবনে কি একটা বিশেষ অভাব রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মানুষ অসম্পূর্ণ, মানুষকে ভালবাসিয়া কোন মতেই চির শান্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু যিনি পূর্ণ, অশেষ মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান, মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিলে চিরকাল বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় তাঁহাতে তাহাই আছে। জগতে যাহা কিছু সৌন্দর্য্যময়, প্রেমময়, গুণময়, প্রীতিময়, সুখময়, শান্তিময়, উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল রহিয়াছে শ্রীভগবানই তাহার আধার স্বরূপ। তাঁহার এক একটি কণামাত্রে এই সকল জাগতিক বস্তু সুন্দর। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ তিনি কতদূর সুন্দর কতদূর মধুর।

আমরা কিছুমাত্র পার্থিব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই কত সুখানুভ করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি এই সকল সৌন্দর্য্যের আধার তাঁহাকে পাইলে যে হৃদয় অপূর্ব্ব সুখে উচ্ছ্বসিত হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। পার্থিব প্রেম প্রীতি গুণ ইত্যাদি সকলেরই নাশ আছে কিন্তু তিনি অবিনাশী। যিনি অসীম দয়াল ও অবিনশ্বর তাঁহাকে ভালবাসিলে যে কখনও অনুতপ্ত হইতে হইবে না ও জীব চির শান্তিতে জীবনাতিপাত করিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হে ভ্রান্তজীব, সুখের আশায় তোমরা যে সকল পার্থিব বিষয়ের নিকট ধাবিত হইতেছ তাহাতে সুখ কোথায়? তাহাতে কেবল গুটিপোকার ন্যায় স্বকৃত জালে আবদ্ধ হইতেছ মাত্র। যদি প্রকৃত সুখ চাও প্রকৃত শান্তি চাও তবে শ্রীভগবানকে ভালবাস। তাঁহাকে ভালবাসিতে না পারিলে কোনমতেই শান্তি পাইবে না।

জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবনের উদ্দেশ্য ভগবদ্‌সম্মিলন। যিনি জীবনের উদ্দেশ্য পালন করিতে না পারিয়া থাকেন তিনি কর্ত্তব্চ্যুত হইয়া থাকেন। কর্ত্তব্যলঙ্ঘনে জীব কখনই সুখ বা শান্তি পায় না। পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল সমস্ত খুলিয়া দেখ দেখিবে একমাত্র শান্তিস্থল তিনি। নিজ হৃদয়মধ্যে কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টান্তঃকরণে চিন্তা করিয়া দেখ কত চিন্তা-স্রোত উঠিবে নামিবে অবশেষে স্থির সিদ্ধান্ত হইবে একমাত্র শান্তিস্থল তিনি। যদি তিনিই একমাত্র শান্তিস্থল হইলেন তবে অনর্থক শান্তির আশায় পার্থিব বিষয়ের নিকট প্রেতাত্মার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবার আবশ্যক কি? সেই শান্তিময়কে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস বিমল শান্তি পাইবে। আমরাও এখন সেই শান্তিময়ের চরণতলে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

বিয়োগবেদনা ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রণয়ের অঙ্কুর ।

পঙ্কিল স্রোতে কত তৃণ ভাসিয়া গিয়াছে। কে জানিত যে কালে তাহাদের সমবায়ে কোমল মৃত্তিকাস্তর সলিলরাশি ভেদ করিয়া উঠিবে, কালে সেই নবনীত তুল্য স্তরোপরি বায়ুবিক্ষিপ্ত বীজ নিপতিত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইবে, কালে সেই স্থান অপূর্ব্ব দ্বীপে শোভা পাইবে। পরিবর্ত্তন স্রোতে প্রকৃতি যে প্রতিনিয়ত ভাসিতেছে তাহা ভাবিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

আকাশে কত মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, এক আসিতেছে, এক যাইতেছে। সহসা তাহাদের অপূর্ব্ব মিলন হইল—স্তরের পর স্তর শোভা পাইল, ক্রমে তাহা হইতে স্নিগ্ধ বারিধারা নিপতিত হইয়া উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করিল। এ পরিবর্ত্তন যারপরনাই মনোরম।

ভীষণ মরুভূমিতে নয়নের তৃপ্তিকর কিছুই ছিল না। অনন্ত বালুকাকণার অবিরাম অভিনয় ভিন্ন কিছুই পরিদৃষ্ট হইত না। সহসা তাহার একপার্শ্বে শ্যামল দূর্ব্বাদল অঙ্কুরিত হইল, তরুলতা উদ্গত ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া নয়নের অপার তৃপ্তিসাধন করিল। এরূপ পরিবর্ত্তন বৈচিত্র্য না থাকিলে প্রকৃতির এত শোভামাধুর্য্য হইত না।

আমি একদিন বালকবেশে কত খেলাই খেলিয়াছি—বালির ঘর কতই বান্ধিয়াছি, কিন্তু কিছুই স্থায়ী হয় নাই, চাঞ্চল্যতরঙ্গে সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। হৃদয়ে কত ভাবই জলবিম্বের ন্যায় বিলীন হইয়াছে—ভাবের সমাবেশ কখনও হৃদয়কন্দর হইতে অমৃতের উৎস উৎসারিত করিতে পারে নাই। ভাবহীন হৃদয়ে শুধু সরলতার সমীর বহিয়াছে, কল্পনার বৈচিত্র্য কখনও শোভা পায় না; চঞ্চলতার বালুকাকণা বহিয়াছে, গাম্ভীর্য্যের বীজ অঙ্কুরিত বা কবিত্বের কুসুম বিকশিত হয় নাই। শূন্যহৃদয় লইয়া তৃণের ন্যায় কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম।

আমি নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় পর্ণকুটীরে নিদ্রিত ছিলাম, জাগ্রত হইয়া দেখিলাম কে যেন আমাকে রাজরাজেশ্বর বেশে সাজাইয়া স্বীয় হৃদয়মন্দিরে

স্থাপন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রেমানন্দে আরাধনা করিতেছে—চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি হইতেছে, সমাগত সকলেরই মুখমণ্ডলে প্রীতিধারা বহিয়া যাইতেছে। আনন্দের সেই যে উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল তাহাতে নিমগ্ন হইয়া কি এক অমৃত আস্বাদন করিলাম তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। বাসর-ঘরের সেই শুভরজনীতে বুঝিলাম আমার জীবনে নূতন অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।

পরদিন সুস্নাত হইয়া পবিত্র হোমাগ্নির সন্নিধানে দাঁড়াইয়া দাম্পত্য সম্বন্ধের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তন করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রেমছবি হৃদয়ে ধারণ করিলাম। হৃদয়ফলকে সে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শেষাগ্নিতে বালকত্বের আহু-তি দিয়া প্রেমের বিচিত্র আগারে প্রবেশ করিলাম। সেইদিন হইতে ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কল্পনার প্রস্রবণে অবগাহন করিলাম। সেই দিন হইতে চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া চিত্তোন্মাদক সঙ্গীত শুনিতে পাইলাম। সেই দিন হইতে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ হইয়া সেই সৌন্দর্য্যসাগরে নিমগ্ন হইলাম। কতদিন মনে হইয়াছে আমরা যেন যমুনার প্রেমপুলিনে শয়ন করিয়া আছি আর সেই সুনীল সলিলতরঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রেমময় শ্রীহরি প্রেমের উৎস আনন্দের ধারা তৃপ্তির সুধা সেই বাঁশী বাজাইয়া হৃদয়ের স্তরে স্তরে অমৃত প্রবাহ বহাইতেছেন। সেই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলার অপূর্ব্ব অভিনয় অভিনীত হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সরলতার শোভা, বিশ্বাসের মাধুর্য্য, প্রেমের আবেগ, পবিত্রতার সৌরভ কত ভাবেই চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। যমুনার নিকুঞ্জবনে প্রেমসরোবরে ব্রজাঙ্গনার হৃদয়কোকনদে দাঁড়াইয়া যখন রাধামোহন শেষ বাঁশী বাজাইয়া প্রাণকে উন্মত্ত করিয়া যবনিকার অন্তরালে বিলীন হইতেন তখন উভয়ে অপার আনন্দনীরে ডুবিয়া যাইতাম, সে তৃপ্তিধাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আর বাসনা থাকিত না। এইরূপে দিন দিন ব্রজের ভাবে উভয়ের হৃদয় পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল, সেই আদর্শ প্রেমের দিকে জীবনপ্রবাহ ছুটিতেছিল, আনন্দলহরীতে প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল। কতবার মনে হইত আমরা যেন ভারতচন্দ্রের বর্ণিত সেই কৈলাসপুরীতে প্রবেশ করিয়া যোগধ্যানে যোগেশ্বরের পার্শ্বে যোগমায়াকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছি, কত আগম পুরাণের মধুর আবৃত্তি শুনিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছি, গাম্ভীর্য্যময়,

ওঁকারের উদরাভেদী নিনাদে আত্মহারা হইতেছি, হরগৌরীর একাত্মরূপ অপূর্ব্ব মূর্ত্তির নিকট অবলুণ্ঠিত হইয়া আত্মার সেই শান্ত সমাহিত নির্ব্বিকল্প ভাবে উপনীত হইবার জন্য কত কি প্রার্থনা করিতেছি। কতবার সুদূর ভারতের প্রেমমাহাত্ম্য অনুধ্যান করিতে করিতে উভয়ে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইয়া অযোধ্যার শাল্মলী তরুর পার্শ্বে মিথিলার কোমল লতিকার অনুপম শোভা ও মিলন দেখিয়া কত কি শিক্ষা লাভ করিয়াছি। শিখিয়াছি—প্রেমরাজ্যে বিষাদে অবসাদ নাই, সর্ব্বনাশেও ক্ষোভ কি ব্যাকুলতা নাই। শিখিয়াছি—প্রকৃত প্রেমে অমৃতের উৎপত্তি, সেই অমৃত যিনি পান করিয়াছেন তিনিই দেবতা। দেবতার আবার সুখদুঃখ কি? বিরহবিচ্ছেদ কোথায়? প্রেমসাধনায় যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁহার আবার বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা কোথায়? তিনি ধ্রুবলোকের উপরিভাগে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, কক্ষচ্যুতির সম্ভাবনা কোথায়?

ক্রমে ক্রমে এই সকল মহৎসত্য পরিগ্রহ করিতেছিলাম, তাহার আভাস পাইতেছিলাম। সাহিত্যের মধুর ভাবে কল্পনার ঐন্দ্রজালিক মোহে নিবিষ্ট হইতেছিলাম। কল্পনার পর অনুমান তদন্তর বিশ্বাস তৎপর জ্ঞান এবং তদনন্তর অনুভূতি, ক্রমে আস্বাদন এবং পরিশেষে মহাবেশ—প্রেমের এই পারম্পারিক পর্য্যায়ের বিন্যাস দেখিয়া সেই পথে উঠিতে মনে দিন দিন কতই আগ্রহ জন্মিতেছিল। সেই শুভদিনে জীবনে যে উল্লাস ও উচ্ছ্বাসের বিকাশ হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে।

প্রথম যে দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা সেই প্রফুল্ল মুখ খানি। কবির কল্পনা বা অতিশয়োক্তির আড়ম্বর মনে করিওনা। প্রকৃতই বলিতেছি জগতে তেমন দৃশ্য আর দেখিলাম না। তোমরা শরতের চন্দ্র, সরোবরের পদ্ম, বসন্তের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হও, আমিও যে না হই তাহা নহে তবে উহারা ত তেমন করিয়া তাকাইয়া প্রাণকে হরণ করিতে পারে না। চক্ষু যে এমন করিয়া দেখিতে জানে তাহা আগে কিছুই জানিতাম না। তুমি বালিকা ছিলে সত্য কিন্তু তুমি প্রাণ ভরিয়া যখন তাকাইয়া রহিতে আমি তোমার মুখে কি এক অপূর্ব্বশোভা দেখিয়া আনন্দরসে বিহ্বল হইতাম, আমি যে পুরুষ তোমার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা সে জ্ঞান হারাইয়া তোমারই অধীন হইয়া তোমাতে মিশিয়া যাইতাম, কোন প্রভেদই থাকিত না এবং বুঝিতেও

পারিতাম না। কতদিন কত সময়ে নয়নযুগলের সেই দৃষ্টি হৃদয়ে কত যে সুধা ঢালিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। অনেকেরই সুন্দর মুখ আছে সত্য কিন্তু তেমন করিয়া তাকাইতে কেহই জানে না।

কথা যে সঙ্গীতকে পরাস্ত করিতে পারে তাহা কে জানিত? যখন সেই প্রেমমুখের সুমিষ্ট কথা শুনিতাম তখন আনন্দ আর ধরিত না। শুধু সঙ্গীত কেন? তোমার কথা শত শত কাব্যকে পরাস্ত করিয়াছে। একদিন বেশ মনে হইতেছে আমি রাত্রিতে কাব্যের অমৃতময়ী শকুন্তলা পাঠ করিতেছিলাম ভাষা ও ভাবের মনোহারিত্বে ডুবিতেছিলাম এমন সময়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তুমি কাছে বসিয়া দুই একটী কথা বলিয়াছিলে। সেই কথায় মন এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে আর শকুন্তলাপাঠ হইল না। তৎপর সমস্ত রাত্রি তুমি কত কি কথা কহিয়াছিলে আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছিলাম। শুধু এক রাত্রি নহে—বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে তবুও তোমার কথা ফুরায় নাই, আমারও পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। কাব্যময়ি! তোমার হৃদয় অনন্ত কাব্যের অনন্ত উৎস ছিল, অবিরাম তাহা হইতে ভাবের লহরী উঠিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সহিত কথা কহিয়া যে তৃপ্তি ও আনন্দ পাইয়াছি তাহার কণিকামাত্রও অন্য কেহ দিতে পারে নাই।

স্বর্গের মন্দাকিনীকে বহিতে দেখি নাই, অমৃতের ধারা প্রত্যক্ষ করি নাই, নন্দনকাননের পারিজাতের মাহাত্ম্যও অনুভব করি নাই কিন্তু যখন প্রেমময়ীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি তখন মুহূর্ত্তমধ্যে বোধ হইয়াছে যেন সকলই দেখিয়াছি—শুধু দেখিয়াছি কেন? সেই পারিজাত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া প্রেমমন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া অমৃতের আস্বাদন করিয়াছি। প্রাণের দেবতা! তোমাকে পাইয়া আমি ক্ষুদ্র নর হইয়াও স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছি; তুমি আমাকে অমর করিয়া তুলিয়াছিলে।

কতভাবেই যে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই ব্যাধিমন্দির শরীরের সেবা কে করিয়াছে? রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া যখন যন্ত্রণায় আকুল হইয়াছি তখন সেই প্রীতিময়ীর যত্ন ও সেবায় সকল ক্লেশ ভুলিয়া গিয়াছি। পীড়া প্রবল হইয়া উঠিলে যখন আকুল হইয়া সাশ্রু-নয়নে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া হরিনাম জপ করিতে ও বারবার ভূমিষ্ট হইয়া বিধাতার চরণে প্রণাম করিতে তখন মনে কত বল ও সাহস পাইতাম।

তুমি প্রতিনিয়ত সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিলে যে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই হইয়া পড়িয়াছিলাম। তোমাতে প্রেম ও রূপের অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চনযোগ ঘটিয়াছিল।

পুরুষ ও পণ্ডিত বলিয়া যতই অভিমান থাকুক না কেন, পত্নীর সহায়তা ভিন্ন সংসার চালান সহজ নহে। যতই আশা ও উৎসাহ থাকুক না কেন, সময়ে সময়ে নিরাশার ভাব আসিয়া হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলে, জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয়, সেই সময়ে পত্নীর সান্ত্বনা ও উপদেশ চিত্তকে সতেজ করিয়া তুলে। সময়ে সময়ে বোধ হইত আমি যেন প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছি আর প্রকৃতি পুরুষ বেশে অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেছেন। কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর সাধনায় পত্নীকে উত্তরসাধিকারূপে পাইয়াছিলাম তাই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে ক্রমশঃ উঠিতেছিলাম। আমি ভাগ্যবান তাই এমন পত্নী পাইয়াছিলাম।

প্রেমরাজ্যে চিতানল জ্বালিয়া তাহারই পার্শ্বে বসিয়া আছি, আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই বিনষ্ট হইল; কুসুম বিকসিত হইতেছিল, হঠাৎ বিশুষ্ক হইয়া পড়িল; চাঁদ উঠিতেছিল কোথা হইতে রাহু আসিয়া গ্রাস করিল; ঐ উজ্জ্বল তারকা কেমন হাসিতেছিল, কক্ষচ্যুত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইল। এই অমঙ্গল রাজ্যে একা বসিয়া রোদন করিতেছি। সাধনা অসম্পূর্ণ হইল, বাসনা অতৃপ্ত রহিয়া গেল। সুখের কুটীর ভাসিয়া গেল। ক্ষোভের অনলে আজ দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছি।

এ সুখস্বপ্ন না দেখিলে আমার পক্ষে মঙ্গল হইত। মরুভূমিতে মরিতাম সেও ভাল ছিল—এ মরীচিকা কেন নয়ন পথে দেখা দিল? অপ্রেমিক হইয়া থাকিতাম তাহাতে ক্ষতি ছিল না—এ প্রেমাস্বাদন করিয়া এখন দ্বিগুণতর পিপাসায় ক্লেশ পাইতেছি। সাধনাপথে যাইয়া লাভ কিছুই হইল না—বিঘ্নক্ষোভে মর্ম্মাহত হইতেছি মাত্র। চিরবধির থাকিতাম সেও ভাল ছিল তথাপি সে সঙ্গীত না শুনিলেই আমার পক্ষে মঙ্গল হইত। অন্ধ হইয়া জন্মিলে আজ সেই মুখখানির জন্য এত ব্যাকুল হইতে হইত না। অভাববোধ অপেক্ষা প্রত্যাশা না থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। আজ অভাবজনিত ক্ষোভে ক্লেশ পাইতেছি তাই আমার এত দুর্দ্দশা।

তুমি কে ?

১

কে তুমি আমারে তাহা কবে কোন জন ?
দাঁড়ায়ে চিন্তার তটে, সুনীল আকাশ পটে,
অনিমেষে কত নিশা ক'রেছি দর্শন।
দেয়নি উত্তর তারা, নীরবে চাঁদিমা তারা,
কেবল চাহিয়াছিল আমার বদন।

২

কে তুমি তাহাই আমি করিতে শ্রবণ,
সুনীল সিন্ধুর পাশে, গিয়াছিনু বড় আশে,
দিলনা উত্তর সে ত মনের মতন।
আপন গরব ভরে, শুধু' কল কল" ক'রে
করেছিল প্রিয়া সাথে প্রেম আলাপন।

৩

কে তুমি জানিতে তাই আকুল হইয়া,
সুধাইনু মলয়ায়, কিছু না বলিল হায়,
ফুল-বালা মুখ শুধু সে গেল চুমিয়া।
নিশীথের অন্ধকারে, সুধায়েছি বার বারে,
কই কিছু বলিল না করুণা করিয়া।

৪

কে তুমি সুধাই যারে কথা নাহি কয়,
ভাসিয়া নয়ন জলে, সুধায়েছি নরদলে,
কত কথা কহে তারা হ'য়ে নিরদয়।
হায়গো অবোধ জীব, বলে 'এক জীবশিব'
কেহ বলে 'প্রেম' তুমি আর কিছু নয়।

৫

জগৎসমষ্টি তুমি কেহ পুরু কয়,
কেহ প্রকৃতিরে টানে, তুমি আছ নাহি মানে,
আবার কেহবা বলে তুমি "জ্ঞানময়"।
ডুবিয়া দারুণ ভুলে, দর্শন বিজ্ঞান খুলে,
কত লোক কত বলে মনে যাহা লয়।

৬

এসব কিছুই ভাল লাগেনা আমার,
যাহার যা ইচ্ছা চায়, বলুক কি ক্ষতি তায়,
আমি জানি তুমি মোর আমিহে তোমার।
দর্শন বিজ্ঞান জ্ঞান, কভু নাহি চাহে প্রাণ,
চাহিনা দারুণ ভুলে ডুবিতে গো আর।

৭

আমি জানি তুমি প্রভু আমি নিত্য দাসী,
তুমি প্রেমময় স্বামী, নিত্য প্রেম আশী আমি,
(তব প্রেম রাজ্যে যেন প্রেমানন্দে ভাসি)
চির বাঞ্ছা এই মম, যদি ইহা শুধু ভ্রম,
থাক তবে সেই ভ্রম যাবত জীবন,
যেন এ ভ্রমের ঘোর ভাঙ্গেনা কখন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

—।○×○।—

দুর্গোৎসবে রাজসীশক্তি।

বর্ষে বর্ষে আশ্বিন মাসে শুক্লা সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে আমরা যে মহোৎসবে মাতিয়া জগদম্বিকা কত্যায়নীর আরাধনা করিয়া মানব জন্ম সফল করি, সমগ্র ভারতবাসীর বিশেষতঃ শক্তিসাধক বঙ্গবাসীর পক্ষে যে দুর্গোৎসব তুল্য আর কোনই আনন্দপ্রদ মহোৎসব বৎসর মধ্যে সংঘটিত না; যে দুর্গোৎসব আবাল বৃদ্ধ বনিতা, আপামর সাধারণ, ধনী, নির্দ্ধন, মূর্খ, পণ্ডিত, রাজা, প্রজা, গৃহস্থ ও প্রবাসী সকলেরই সর্ব্বপ্রকারে শান্তিকারক ও তৃপ্তি-দায়ক; যে দুর্গোৎসব অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য, দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞাদির ন্যায় ফলপ্রদ, যে দুর্গোৎসবে আনন্দময়ীর আগমনে জগৎ আনন্দময় হইয়া দাঁড়ায়; যে দুর্গোৎসব সময়ে ত্রিতাপসন্তাপিত মানবকুল ত্রিতাপ-হারিণী জগজ্জননীর চরণ দর্শনে অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও ত্রিতাপ যাতনা বিস্মৃত হইয়া আনন্দময় শান্তিসলিলে সুশীতল হইয়া থাকে, যে দুর্গোৎসব উপলক্ষে স্বজনমিলন ও শত্রুতা পরিহার ব্যাপারে আমরা পার্থিব ভাব ভুলিয়া গিয়া স্বর্গীয় অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি; সংক্ষেপতঃ যে দুর্গোৎসবে নব বস্ত্র পরিধান, অভিনব ভূষণ ধারণ ও উৎকৃষ্ট আহার্য্য আদান প্রদান কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, সেই দুর্গোৎসব রাজসীশক্তিবিকাশিনী কর্ম্মময়ী মহিষ-মর্দ্দিনীর আরাধনা মাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্যে মহাশক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তামসী, রাজসী, এবং সাত্ত্বিকী শক্তিভেদে তিন মূর্ত্তির ব্যাপার বর্ণিত ও কার্য্যকলাপ প্রদর্শিত হইয়াছে। তামসী বা সাত্ত্বিকী মূর্ত্তির উপাসনা না করিয়া আমরা প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব সময়ে কেবল রাজসী মূর্ত্তিরই আরাধনা করিয়া থাকি। মধুকৈটভবধোপলক্ষে তামসীমূর্ত্তি এবং শুম্ভনিধনোদ্দেশে সাত্ত্বিকীমূর্ত্তির বর্ণনা ও কার্য্যব্যাপার উক্ত দেবী মাহাত্ম্যে সবিস্তর বর্ণিত হইলেও আমরা এখন কেবল রাজসীমূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিব। কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মসাধন উদ্দেশেই আমরা বিদ্যমান। কর্ম্মই মানবের জীবন, কর্ম্মই মানবের একমাত্র অবলম্বন। এই মহামন্ত্রের মহত্তত্ত্ব বিশদ ভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনের উপদেশ ছলে যেরূপ কর্ম্ম ব্যাখ্যা ও কর্ম্ম প্রশংসা করিয়াছেন, পাঠক তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, বিশেষতঃ নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া ভাবুন।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্" ॥

বঙ্গানুবাদ—"কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার হউক কদাচ যেন ফলেতে না হয়। হে ধনঞ্জয়! আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্মসাধন কর। জগতে এমন কেহই নাই যে কদাচিৎ ক্ষণমাত্র ও কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিতে পারে, প্রকৃতি গুণাবদ্ধ সকলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। তুমি নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মবিহীন হইলে তোমার শরীর যাত্রাই আদৌ নির্ব্বাহিত হইবে না। (নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও জীবের শারীর কর্ম্ম) কর্ম্মকে ব্রহ্মসমুদ্ভূত এবং ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভব বলিয়া জানিবে।"

আবার—সর্ব্বকর্ম্মফল বিধাতা, কর্ম্মসাগর কর্ণধার ভগবান্ মহেশ্বর কর্ম্মময়ীর গুণগরিমা বুঝিয়াই বলিয়াছেনঃ -

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে ॥
চরাচরমিদং সর্ব্বং দেবি কর্ম্মাত্মকং প্রিয়ে।
মাতা কর্ম্ম পিতা কর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমোগুরুঃ ॥
স্বর্গং বা নরকং বাপি কর্ম্মণৈব লভেন্নরঃ ॥

*   *   *

কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কর্ম্মনিরতঃ সদা।
অফলাকাঙ্ক্ষিচিত্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥"

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মানুসারেই জীব জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মেতেই জীবের প্রলয় ঘটে; দেহ বিনষ্ট হইলে জীব কর্ম্মানুসারে জন্মান্তরে দেহলাভ করিয়া পুনরায় কর্ম্মের অনুগত। দেবি! চরাচর সমস্তই কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মই মাতা, কর্ম্মই পিতা,

কর্ম্মই জীবের পরমগুরু রূপে উপদেষ্টা। কর্ম্ম দ্বারাই জীব স্বর্গ বা নরক লাভ করে। কর্ম্ম মনোবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা কর্ম্ম নিরত হইয়াও যাঁহার চিত্ত কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাশূন্য, তিনিই কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া মোক্ষলাভ করেন।

এই সকল মহাবাক্য স্মরণ মননে সকলেই কর্ম্মমহিমার নিগূঢ় তত্ত্ব ও মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত উপদেশ মালায় যে মহাভাব বাক্য বর্ণিত—আশ্বিন মাসে মহিষমর্দ্দিনীর আরাধনায় তাহাই কার্য্যে সূচিত এবং সিংহবাহিনী সর্ব্বদেব শরীরজা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা কাত্যায়নীর রাজসী মূর্ত্তিতে তাহাই সুপ্রকাশিত। এ স্থলে বুঝা উচিত অপর গুণদ্বয় অবহেলা না করিয়া রজোগুণের প্রকাশই মানবধর্ম্ম। সেইজন্য আমরা যখন মানবদেহ ধারণ করিয়াছি, যখন পশুভাবের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া তাহার সীমা অতিক্রম করিতে যত্ন করিতেছি এবং যখন দেব ভাবের জন্য স্পৃহাবান্ ও লালসাসম্পন্ন হইয়া রহিয়াছি তখন কায়মনোবাক্যে স্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্য সংসাধনে ও তদনুচিত কার্য্যসম্পাদনে নিয়ত চেষ্টা করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বান্তঃকরণে রজোগুণশালিনী কর্ম্মময়ী রাজসীমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া মানবজন্ম সফল ও সার্থক করা উচিত। বলা বাহুল্য ;—মোহকর তমোগুণেই পশুভাব, কার্য্যকর রজোগুণেই নরভাব এবং শান্তিকর সত্ত্বগুণেই দেবভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কর্ম্মের ও কর্ম্মনির্ব্বাহের প্রধান শত্রু ও প্রবল অন্তরায় ক্রোধ। এজন্য ক্রোধের মূর্ত্তিমান অবতার মহিষাসুরকে দমন করিয়া কর্ম্মময়ী দেবী কর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা দুর্গামূর্ত্তির ধ্যানে এ সুন্দর তত্ত্ব সুচারুরূপে পরিস্ফুট। পাঠক কর্ম্মস্বরূপা মাতৃদেবীর অঙ্গে অঙ্গে কর্ম্মরাজী বিরাজমান দেখিতে পাইবেন। ভাবুক ভক্ত এই ভয়ঙ্কর মনোহর বেশের একত্র সমাবেশ দেখিয়া মনোনয়নের সাফল্য লাভ করেন, এবং জগত্তারিণীতে এই মহিষদলনী মূর্ত্তির বিকাশে কর্ম্মের ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন। দশদিক্ সংরক্ষণে ব্যগ্র হইয়াই মা দশভুজা দশাস্ত্রধারিণী, ত্রিকালব্যাপিনী ত্রিকালবোধিনী বলিয়াই মা ত্রিলোচনী।

কিন্তু এ মূর্ত্তি কেবল বাহ্যদর্শকের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, দার্শনিকের মনে দর্শনতত্ত্ব উদ্ভাসিত করিয়া দেয়, জ্ঞানীর জ্ঞাননয়ন

উন্মীলিত করিয়া দেয়, সাধকের সাধনার ধন সিদ্ধিরত্নের আকর রূপে প্রতি-ভাত হয় এবং ভক্তের হৃৎকমলে প্রেমভক্তির অপূর্ব্বজ্যোতিঃ বিকাশিত করে। এ মূর্ত্তিদর্শনে, ধ্যানে, অনুস্মরণে নিদিধ্যাসনে নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া ভাবুকের মনোমধ্যে ভাবের উদ্যান সাজাইয়া দেয়।

নবযৌবনসম্পন্না পূর্ণেন্দুসদৃশাননা সুন্দরনয়না অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি কার না দর্শনীয়া, এবং দর্শন করিয়া কারইবা মন প্রাণ সর্ব্বতোভাবে সুতৃপ্ত সুস্নিগ্ধ না হইয়া থাকে? কিন্তু এ মূর্ত্তিতে কেবল সৌন্দর্য্যরাশির বিকাশ নাই, ইহাতে কেবল অঙ্গসৌষ্ঠবের সামঞ্জস্য নাই, ইহাতে সর্ব্ববিধ রূপরাজীর সমাবেশ আছে সত্য কিন্তু এ মূর্ত্তি শান্তভাবে দেখিবার যো নাই। এ মূর্ত্তির আবির্ভাব যেমন রমণীয় মনোহর—তেমনই রণপ্রিয় ভয়ঙ্কর। এ মূর্ত্তির মাধুর্য্য প্রাখর্য্য সমকালে বর্ত্তমান। এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি যেমন প্রীতিপ্রদ তেমনই ভীতিপ্রদ। "নয়নে দর্শন কর, মানসে ধ্যান কর, সর্ব্ববিধ তৃপ্তি-লাভের অধিকারী হইবে ও সর্ব্বাঙ্গীন সুখশান্তি প্রাপ্ত হইবে," এই সদুপদেশ প্রত্যেক জ্ঞানী, ধ্যানী ও দ্রষ্টার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি দর্শনীয়া ও ধ্যেয়া হইলেও সম্পূর্ণ অনির্ব্বচনীয়া। মাতৃক্রোড় সমীপস্থ অবোধ শিশু যেমন স্নেহময়ী জননীর ঈষদাকুঞ্চিত, কৃত্রিম রোষকষায়িত ভ্রূকুটী দর্শনে স্নেহ, ক্রোধ এবং প্রীতি ভীতির যুগপৎ একত্র সমাবেশ দেখিয়া এক অভূত-পূর্ব্ব ভাব অনুভব করে; এবং শরীর মনের অবস্থা না জানিয়া না বুঝিয়া স্থিরনয়নে ধীরচিত্তে মাতৃমুখ নিরীক্ষণে স্তম্ভিত ও পরিতৃপ্ত হয়, বিশ্বমাতৃ পাদপদ্ম সমীপস্থ সাধক ভক্ত তেমনই কর্ম্মময়ী রাজসী মূর্ত্তির বিশ্ববিমোহন মৃদুহাস্যের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোকত্রাসী ভ্রূভঙ্গিমাও অঙ্গলাবণ্যে সৌন্দর্য্যসমষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচাপল্য ও রণচাতুর্য্য দেখিয়া, একাধারে ভীমচারুভাব এবং ভীষণ পেশল তত্ত্বের সংমিশ্রণ সন্দর্শনে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া মহামা-য়ার মায়ায় প্রেমার্দ্র হৃদয়ে ও ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তদ্গতভাব বা তন্ময়ত্বে লীন হইয়া পড়ে। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে এ মূর্ত্তি ধ্যানের অগম্য—বাক্য দ্বারা ইহার বর্ণনা অথবা ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে এই সর্ব্বশক্তিময়ী মহাশক্তির মূর্ত্তি বর্ণনার পর তৎকর্ত্তৃক মহিষাসুর দমন ও বধবিষয় বিবৃত হইয়াছে। করুণাময়ী যেমন অলোকসামান্য রূপজ্যোতিতে মহিষাসুরকে চকিত বিস্মিত করেন,

তেমনই অসাধারণ কৃপাবলে তাঁহার স্কন্ধদেশে পাদস্থাপন পূর্ব্বক কোমল করধৃত ত্রিশূল দ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করেন। হৃদয়ালয়বাসিনী দয়াময়ীর দয়ার কি গুণ, মহাসুর মহিষাসুর নিজ ভাগ্যবলে সেই দেবদুর্লভ দয়া পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। দেবীর ধ্যানে আমরা এই ভাব দেখিতে পাই:—

"হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং"

আবার

"দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥"

বামদেববিমোহিনী বামলোচনার বাম পাদস্পর্শে মহিষাসুর ধন্য। আমরাও সেই অপূর্ব্ব সংস্থান চিন্তা ধ্যান করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনে ধন্য।

কর্ম্মাধীন মানব! কর্ম্ম সাধন জন্য কর্ম্মভোগায়তন দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মভূমিতে স্বকর্ম্মসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার বাসনা যদি ক্ষণমাত্র মনোমধ্যে উদিত হয়, তবে সর্ব্বকর্ম্মস্বরূপিনী সর্ব্বহৃদয়বিলাসিনী কর্ম্মফলবিধায়িনী কর্ম্মময়ী দেবীর আরাধনায় নিরত হও এবং মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তির ধ্যান করিয়া তাঁহারই পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া পার্থিব সুখ সম্পদ্ লাভে শান্তি ও তৃপ্তি পাইয়া সাত্ত্বিকীদেবীর উপাসনার জন্য প্রস্তুত হও। তারপর অমরনিকর নিষেবিত অমৃত লাভ করিয়া বিমল আনন্দ সম্ভোগ কর। মহিষাসুর যে মূর্ত্তি দেখিয়া ও যে দেবীর করচরণ সংস্পর্শে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শক্রাদি সুরগণ সেই কর্ম্মময়ী দেবীর যে স্তব করিয়াছেন তাহা সাহিত্য জগতের কাব্যশাস্ত্রে ও পরমার্থনির্ণয়তত্ত্বে অতুল। দেবীর রাজসীমূর্ত্তি যেমন অনুপমা সাধক ভক্ত ব্যতীত অন্যে সে মূর্ত্তির অপরূপ রহস্য বুঝিতে পারে না, সাধারণ চক্ষেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন চক্ষু ঝলসিয়া যায়, মস্তক বিঘূর্ণিত হয় হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠে। দেবীর এই স্তবেরও শব্দছটা, ভাবঘটা, বাক্যপরিপাটী এবং সর্ব্বোপরি অর্থমাধুর্য্য ও গাঢ় তাৎপর্য্য তেমনই অতুলনীয়। ব্যুৎপন্ন, ভক্তিমান্ সহৃদয়, প্রেমিক সাধক ব্যতীত এ মহাস্তবের মর্ম্মার্থবোধ অন্যে কে গ্রহণ করিবে? পাঠক! সময় সুযোগে টীকা টিপ্পনীর সাহায্যে অর্থবোধ হইলেও আমাদের সবিশেষ অনুরোধ শান্তভাবে অবসরক্রমে স্থির ধীরচিত্তে এ স্তবমহিমা কীর্ত্তন ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন,

এমন অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্য, ভাবচাতুর্য্য ও অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য অন্যস্থানে অতি অল্পই দেখিতে পাইবেন।

কর্ম্মময়ী দেবীর কার্য্য ও শক্তি কেবল সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন দেবগণই বুঝিয়াছিলেন তাই মানব সাধারণের জগতের উপদেশও উপকার উদ্দেশে তাঁহারাই উক্ত দেবীমাহাত্ম্যে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্ত্বেও আমরা সেই সমস্ত স্তবটী উদ্ধার করিতে পারিলাম না। তত্ত্বানুসন্ধায়ী উৎসুক পাঠকগণের কৌতুহল বর্দ্ধনার্থ নিম্নে কেবল পাঁচটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল:—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষ দেবগণ শক্তিসমূহ মূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকা মখিলদেব মহর্ষি পূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃস্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥

হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্নজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত—
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান—
মুদ্‌গীত রম্য পদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়।
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥

পাঠক! উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিলাম না। আসুন দেবগণের

সঙ্গে আমরাও একবার প্রাণভরিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে কর্ম্মময়ী মাতৃদেবীকে ডাকিয়া বলিঃ-

দুর্গেস্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখ ভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

আবার

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাং স্তথা ভুবম্॥

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

মৃত্যুর পর।

(২)

প্রেত বা ভুতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থূল স্থূল গোটাকত কথা গতবারে বলিয়াছি—আরও বলিয়াছি, সব কথা বলা হইল না, সময় পাইলে বলিব।

এই সম্বন্ধে গীতার আর একটি শ্লোক দেখুন (গীতা, ১৭অ, ৪ শ্লোক)—

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসাজনাঃ॥

অর্থাৎ—"সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের আরাধনা করেন, রাজসিকগণ যক্ষ-রক্ষদিগের পূজা করেন আর তামসিকগণ অপরাপর ভূত ও প্রেতগণের পূজা করিয়া থাকেন।"

পরকায়া প্রবেশ প্রথানুসারে জীবাত্মা কখন ও ত্যক্ত (মৃত) স্বদেহাগারে আবার প্রবেশ করেন; কিম্বা আর কোন মৃতদেহে কখন কখন প্রবেশ করেন। ইহাকেই সাধারণত বলে "দানো" পাওয়া। ছিন্নশির দেহে প্রবেশ করিলে তাহাতে সাধারণত "কবন্ধ" বলে। পিতামহীর নিকট আমরা বাল্যে যে "কন্দকাটা"র গল্প শুনিতাম এখন দেখিতেছি যে তাহা বাজে কথা নহে। আর একটি কথা পাঠকের কানে কানে বলিব Tell

it not in Goth ছেলেবেলায় যাহা যাহা শুনিয়াছি এখন দেখিতেছি সেই সমুদয়েরই মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বৈশ্বানরের ন্যায় বড় বড় সত্য নিহিত রহিয়াছে। এখন কেন বুঝিতে পারিতেছি যে মহা মহা ঋষিগণ কি প্রথা অবলম্বন করিয়া সামান্য সামান্য কথায় সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সত্যজ্ঞান স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি তাহার দুই একটি নির্ণয় করিতে পশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছে। হায় ইংরেজী! কি কুক্ষণে তোমার সেবা করিয়া রত্ন ভাবিয়া সযতনে অবিশ্বাস-ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছি। আর্য্য শাস্ত্র আলোচনা ফুৎকারে কত দিনে তাহা উড়িয়া যাইবে?

এখন চণ্ডী দেখুন—

ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ॥ ৬৩
কবন্ধা যুযুধুর্দ্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ॥ ৬৪
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ॥ ৬৫

(মহিষাসুর সৈন্যবধঃ)

এখানে সংস্কৃত টীকাটি দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইতেছে। সংবাদ আছে।

ছিন্নে॥ অর্দ্ধশ্লোকোঽয়ং। অন্যে অসুরাঃ শিরসি ছিন্নে পতিতা অপি পুনরুত্থিতাঃ। কবন্ধোত্থান পরিমাণং প্রাচীন পদ্যং পঠন্তি যথা, নাগানাম যুতং তুরঙ্গনিযুতং সার্দ্ধং রথানাং শতম্। পত্তীনাং দশকোটয়ো নিপতিতা এবং কবন্ধো রণে। তেষাং কোটি নিপাত-নর্ত্তনবিধৌ খেলচ্চলৎখেশিরঃ তেষাং কোটিনিপাতনে রঘুপতেঃ কোদণ্ড ঘণ্টারবঃ ইতি মহা নাটকস্যৈতদিতি কেচিৎ॥ ৬৩॥ তেষাং কর্ম্ম আহ॥ কব॥ কেচিদিত্যুহং কেচিৎ কবন্ধা গৃহীতপরমায়ুধাঃ সন্তঃ দেব্যা সহ যযুধুঃ তত্রযুদ্ধে অপরে কবন্ধাঃ তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ বাদ্যলয়ানুসারিণঃ সন্তঃ ননৃতুঃ গীতবাদ্যনৃত্যানাং ক্রিয়াকালয়োঃ সাম্যংলয়ঃ॥ ৬৪॥ কব॥ অপরে কবন্ধাঃ কবন্ধদেশোদ্ভবাঃ কবন্ধাখ্যজাতি বিশেষাঃ বা মহাসুরাঃ দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো ভাষমাণা এব ছিন্নশিরসো বভূবুঃ কীদৃশাঃ খড়্গ-শক্ত্যৃষ্টি পাণয়ঃ খড়্গাশক্ত্যৃষ্টয়ঃ পাণিষু যেষাং তে ঋষ্টিঃ খড়্গ বিষেঃ লব্ধা পূর্ব্বেণান্বয়ঃ অপরে কবন্ধাঃ তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ সন্তো ননৃতুঃ অন্যে মহাসুরাঃ খড়্গাশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ো গৃহীত শস্ত্রা দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষমাণা

এব ছিন্না বভূবুঃ এতেন দেব্যা অতিলঘুহস্তত্বং সূচিতং মহাসুরাঃ কবন্ধাঃ কীদৃশাঃ ছিন্নশিরসঃ ছিন্নানি অন্যেষাং শিরাংসি যৈঃ তে। যদ্বা অন্যে মহাসুরাঃ ছিন্নশিরসঃ সন্তঃ কবন্ধা এব খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো ভাষমাণা বভূবুঃ। নমু মুখরহিতানাং ভাষণং কথং সম্ভবতু সত্যং ভুবি পতিতস্বশিরোনয়নবদনেন তেষাং দর্শনভাষণাসম্ভবাৎ তদুক্তং অষ্টম স্কন্ধে দেবাসুরযুদ্ধে, কবন্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পশ্যন্তঃ স্বশিরোক্ষিভিঃ। উদ্যতায়ুধদোর্দণ্ডৈরাধাবন্তো ভটান্ মৃধে ইতি॥ ৬৫॥

("তত্ত্বপ্রকাশিকা"—গোপাল চক্রবর্ত্তী)

অর্থ।—অন্য অসুরেরা ছিন্নশির হইয়া পতিত হইয়াও পুনশ্চ (কবন্ধরূপে) উত্থিত হইয়াছিল। ৬৩। কবন্ধেরা গৃহীতাস্ত্র হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং অপর কবন্ধেরা সেই যুদ্ধে বাদ্যলয় আশ্রয় করিয়া নৃত্য করিয়াছিল। ৬৪। অন্য খড়্গাদি অস্ত্রধারী কবন্ধদেশোদ্ভব মহাসুরেরা দেবীকে "থাক থাক" এই কথা বলিতে বলিতেই ছিন্নশির হইয়াছিল। ৬৫।

(মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্যের সংস্করণ)

নিরবচ্ছিন্ন ভূত প্রেতের কথাটা এখন একটু থাক্।

এক্ষণে, "মৃত্যুর পর" অবস্থা সম্যক্ প্রকারে বুঝাইবার জন্য গীতা হইতে আরও শ্লোক উদ্ধার করা আবশ্যক বিবেচনা হইতেছে। ইহার পর ভাবে সাজাইয়া আমার বক্তব্য বলিব।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩ (২অ)

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

অর্থ—দেহি দিগের দেহে যেমন কৌমার যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ দেহান্তর প্রাপ্তিও হইয়া থাকে সে জন্য সুধীগণ তাহাতে মোহিত হয়েন না। ১৩।

ইনি (আত্মা) কখন জন্মেন না বা মরেন না, অথবা কখনও জন্মিয়া আবার জন্মগ্রহণ করিবেন না, ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ, দেহ হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২০।

মনুষ্য যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বাস পরিধান করে তদ্রূপ এই আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ পুরঃসর নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন। ২২

শস্ত্র সকল ইহাকে (আত্মা) ছেদন করিতে পারে না, পাবক ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, সলিল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, এবং সমীরণ ইহা-কে শুষ্ক করিতে পারে না। ২৩।

ইনি (আত্মা) অছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য সর্ব্বগ, স্থির অপরিবর্ত্তনশীল এবং সনাতন। ২৪।

জন্মের পর নিশ্চয় মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর যখন নিশ্চয় জন্ম, তখন এই অপরি-হার্য্য ঘটনার জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে। ২৭।

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যানকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০। ৬ অ।
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরু নন্দন॥ ৪৩
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ ৪৪

অর্থ—ভগবান কহিলেন,—হে পার্থ, ইহলোকে কি পরলোকে তাহার (যোগ-

ভ্রষ্ট ব্যক্তির) বিনাশ নাই, যেহেতু হে বৎস, কল্যাণকারী কাহারই দুর্গতি হয় না। ৪০

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকারিগণের লোক সকল পাইয়া বহুবৎসর বাস সুখ অনুভব করত শুদ্ধ শ্রী সম্পন্ন ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

অথবা যোগনিষ্ঠ ধীমান যোগীদিগের কুলে জন্মেন, এমন যে জন্ম ইহলোকে ইহা নিশ্চয়ই দুর্লভ। ৪২

হে কুরুনন্দন, সেই দেহে পূর্ব্ব দেহের সেই বুদ্ধি যোগ লাভ করেন, তদনন্তর আবার সুসিদ্ধি লাভ করিতে যত্ন করেন। ৪৩

সেই পূর্ব্বাভ্যাস বশত অবান্তর হেতুকে অনিচ্ছা সত্বেও ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, আর যোগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া শব্দ ব্রহ্ম অতিক্রম করে। ৪৪

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ ২৮ ২ অ।

হে ভারত, ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত, মধ্যবস্থায় ব্যক্ত এবং নিধনাবস্থাতেও অব্যক্ত; তবে আর তাহাতে পরিবেদনা কি ? ২৮

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১। (১৬ অ)

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কাম ক্রোধ পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩

অসৌময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগীসিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যেদাস্যামিমোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ ॥ ১৬

অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মা পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

তাঁহারা মরণকাল পর্য্যন্ত অপরিসীম চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া কাম ভোগ পরায়ণ হইয়া "এই কামভোগেই পরম পুরুষার্থ" এইরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া শত শত আশারূপ পাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধ পরবশ হইয়া তাহারা কাম-ভোগের নিমিত্ত অন্যায় পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয় ইচ্ছা করে। ১১। ১২। "অদ্য ইহা লাভ করিয়াছি", "ইহা লাভ করিব", "আমার ইহা আছে", "পুনঃরায় আমার হইবে" "আমি এই শত্রুবিনাশ করিয়াছি", "অপর শত্রুও বিনাশ করিব" "আমি ঈশ্বর" "আমি ভোগী" "আমি সিদ্ধ" "আমি বলবান" "আমি সুখী" "আমি ধনী" "আমি কুলীন" "আমার তুল্য কে আছে" "আমি যজ্ঞ করিব" "আমি দান করিব" "আমোদ করিব" এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত হয়। (এইরূপ) বিবিধ বিষয় বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি মোহজালাবদ্ধ ও ভোগাসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হয় (১৩-১৬)

আত্মসম্ভাবিত ও ধনমানাদিসমন্বিত ব্যক্তিগণ অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞদ্বারা দম্ভ করিয়া আমার উপাসনা করে। ১৭। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধান্বিত হইয়া অসূয়াবশে পরদেহে দ্বেষ করত আমারই দ্বেষ করিয়া থাকে। ১৮। সেই নরাধম নৃসংশ দ্বেষযুক্ত জনগণকে ইহসংসারে আসুরী যোনিতে বার বার নিক্ষেপ করি। ১৯। হে কৌন্তেয় সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্ম জন্ম অধম যোনিতে জন্মিয়া আমাকে না পাইয়া অধোগতি লাভ করে। ২০। কাম ক্রোধ ও লোভরূপ নরকের ত্রিবিধ দ্বার অতএব আত্মার নাশক এজন্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে। ২১। হে কৌন্তেয় অজ্ঞানের

দ্বারভূত এ তিনটিকে পরিত্যাগ করিয়া নরগণ নিজ মঙ্গলের আচরণ করেন এবং তাহাতে পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। ২২।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
(২০-৯ অ)

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি,
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১।

ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মকারী যজ্ঞদ্বারা আমাকে যজন করিয়া সোমরস পানপুরঃসর নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে, তাহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্য দেবভোগ্য বস্তুসকল ভোগ করে। ২০।

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যভূমে আগমন করে এবং উক্ত বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করত কামনা পরতন্ত্র হইয়া গতাগতি লাভ করে। ২১।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। ১৯-৭অ
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃশ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। ২৩

বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ হইয়া সমস্তই বাসুদেব বোধে আমার ভজনা করেন, এরূপ মহাত্মা দুর্ল্লভ। ১৯

সেই সেই কামের (পুত্রকীর্ত্তি শত্রুজয় আদি) দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া তত্তৎদেব আরাধনে যে যে নিয়ম তত্তাবৎ অঙ্গীকার করত আপন প্রকৃতির অধীন হইয়া অন্য দেবতার (ভূত প্রেতাদির) ভজনা করে। ২০

যে যে ভক্ত যে যে দেবতা মূর্ত্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে আমি সেই সেইরূপে তাহাদিগকে দৃঢ় শ্রদ্ধা দিয়া থাকি। ২১

তিনি সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন, সেই দেবতা বিশেষ হইতে আমা কর্ত্তৃক বিহিত সেই সকল কামনা নিশ্চয় লাভ করেন। ২২

কিন্তু অল্পদৃষ্টি, তাহাদের সেই ফল বিনাশী, দেবযাজিরা সাত্ত্বক ফললাভ করে, আমার ভক্ত, অনাদি অনন্ত পরমানন্দ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৩

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫-৮অ
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ম্ ॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি কলেবর ত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমার ভাবই পাইয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় নাই। ৫

হে কৌন্তেয়, যিনি যে যে ভাব ভাবিতে ভাবিতে অন্তকালে কলেবর

পরিত্যাগ করেন, সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে হৃদয় আবিষ্ট থাকায় তাহাই পাইয়া থাকেন। ৬

তজ্জন্য সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর, আমাতে মনোবুদ্ধি তুমি অর্পণ করিলে নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করিবে। ৭

হে পার্থ, অভ্যাসযোগ ও অনন্যগামী চিত্তের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে দিব্য পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। ৮

ইন্দ্রিয় দ্বার সকল প্রত্যাহার করিয়া মনকে হৃদয়ের মধ্যে নিবদ্ধ করত ভ্রূর মধ্যে প্রাণবায়ুকে রক্ষা করিয়া যোগধারণার আশ্রিত হইয়া, ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ ও আমার অনুসরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি পরমপদ পাইয়া থাকেন। ১২।১৩

সর্ব্বদা অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমাকে নিত্য স্মরণ করে, হে পার্থ সেই নিত্যযুক্ত যোগীদের পক্ষে আমি অতি সুলভ। ১৪

মহাত্মারা (ভগবদ্ভক্তেরা) আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আগার অনিত্য জন্মলাভ করেন না, তাঁহারা পরম সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৫

হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয় আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ১৬

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ৪অ
যোগসংন্যস্তকর্ম্মানং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

অজ্ঞ অশ্রদ্ধাবান্ সংশয়ী ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়; এই সন্দেহসঙ্কুল চিত্ত ব্যক্তির ইহকাল পরকাল এবং সুখও নাই। ৪০

যোগ দ্বারা যাহার সমস্ত কর্ম্মপরিত্যক্ত হইয়াছে, জ্ঞান দ্বারা যাহার সমস্ত কর্ম্মচ্ছেদ হইয়াছে, এইরূপ আত্মবিৎ ব্যক্তিকে কোন কর্ম্মই বন্ধন করিতে পারে না। ৪১

হে ভারত, জ্ঞান অসিতে হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়কে ছেদন করিয়া যোগাচরণ কর এবং উঠ। ৪২

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্॥ ৩৭-১৮অ
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতম্॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বংপ্রকৃতিজৈর্মুক্তংযদেভিঃস্যাত্রিভিগুণৈঃ॥ ৪০

অগ্রে যাহা বিষবৎ অথচ পরিণামে অমৃততুল্য সুখ, আত্মা ও বুদ্ধির প্রসন্নতাজনিত সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত। ৩৭

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃ প্রথমে অমৃততুল্য, পরিণামে বিষবৎ যে সুখ, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩৮

নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন আত্মার মোহকর যে সুখ, তাহা তামস বলিয়া কথিত। ৩৯

পৃথিবীতে এবং স্বর্গে দেবগণের মধ্যেও এমন কোন প্রাণী নাই যে এই প্রকৃতিজাত গুণ হইতে মুক্ত আছে। ৪০

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০-১৮অ

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসিসত্যং তে প্রতিজানেপ্রিয়োঽসিমে॥ ৬৫

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৪র্থ ভাগ। | পৌষ, ১৩০৩ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

জ্যোতিষশাস্ত্র।

অন্যান্য শাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং
ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিত জ্যোতিষ তন্ত্রবাদাঃ
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি ॥

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি এবং তৎপ্রযুক্ত পার্থিব শুভাশুভ ঘটনাবলী যে শাস্ত্রদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় সেই শাস্ত্রের নাম জ্যোতিষশাস্ত্র। এই শাস্ত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে অভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদ্বারা পুরাকালে বিজ্ঞগণ ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান অবগত হইয়া ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই শাস্ত্রের এতদূর আদর ছিল যে কেবলমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিজ্ঞত্ব লাভ করিতে পারিলে মানবগণ কোন গুণ না থাকিলেও বিপ্র উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইতেন। তাহাদেরই বংশধরগণ এখনও গ্রহবিপ্রবংশ নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে আর এই শাস্ত্রদ্বারা তদ্রূপ অভ্রান্ত গণনা হইতে দেখা যায় না। চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণাদি দুই একটী সামান্য বিষয় ব্যতীত প্রায় সমস্ত বিষয়ের গণনাই ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার প্রকৃত কারণ কি? তদ্বিষয়ের আলোচনাই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জ্যোতিষশাস্ত্রটী অঙ্কশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অঙ্কশাস্ত্রে রীতিমত পারদর্শিতালাভ করিতে না পারিলে এই শাস্ত্রে কিছুমাত্র অধিকার

জন্মিবার কোন উপায় নাই। কলিকালে মানবগণের বুদ্ধি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিলে তাহারা অঙ্কশাস্ত্রের জ্যোতিষশাস্ত্রোপযোগী ততদূর উচ্চ শিক্ষাতে পারদর্শী হইতে পারিবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রাচীনকালের গ্রন্থকর্ত্তাগণ গণনাকার্য্যের সুলভ করণার্থ এই শাস্ত্রে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত না থাকিলেও ঐ শ্লোকগুলির দ্বারা কেবল যোগ বিয়োগ গুণ ভাগমাত্র অবলম্বন করিয়াই কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী একপ্রকার গণনা করা যাইতে পারে। এতদ্দেশীয় জ্যোতিষব্যবসায়িগণ এক্ষণে ঐ শ্লোকগুলি অবলম্বন করিয়াই গণনাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ অপর কতকগুলিন রচিত শ্লোক দ্বারা শুভাশুভ ফলাফলাদিও বলিয়া থাকেন। সেই সকল গণনাগুলিন কেন যে ঐরূপে সাধন করিতে হয় বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ঐরূপ অবস্থায় সমাগত হইলে কেন যে ঐরূপ ফলাফলাদির উদ্ভব হইয়া থাকে তদ্বিষয়ক কোন তত্ত্বেরই তাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন না বা রাখা আবশ্যক বলিয়াও বিবেচনা করেন না। জ্যোতিষ্কব্যাবসায়িদিগের এইরূপ তাচ্ছল্যতাপ্রযুক্ত ক্রমশঃ ইহার এতদূর দুরবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে একটী সৌরদিন কত দণ্ডে হয় তাহা গণনা করিতেও তাঁহাদের ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে যেন তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা বলিয়া বোধ হয়। অতএব ঐ গণনাটীর বিষয় বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা আবশ্যক।

পৃথিবী একবৎসর কালে একবার সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে নক্ষত্রমণ্ডলীর অত্যন্ত দূরে অবস্থিতিহেতু ঐগুলির কোন প্রকার চলাচল দেখিতে পাওয়া যায় না; ঐগুলিকে একরূপ স্থির বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু তৎপ্রযুক্ত সূর্য্যকে প্রতিদিন অল্প অল্প সরিয়া এক বৎসরকালে একবার রাশি-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। একটী নক্ষত্রের উদয়-কাল হইতে পুনরায় ঐ নক্ষত্রটীর উদয় হওয়া পর্য্যন্ত সময়কে একটী নাক্ষত্রিক দিন বলে এবং ঐ দিনের ষষ্টিভাগের প্রত্যেক ভাগকে একটী দণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু সূর্য্যের দৈনিক উক্তপ্রকার গতি বশতঃ উহার উদয় হইতে ষষ্টিদণ্ড (একটী নাক্ষত্রিক দিন) অপেক্ষা একটু অধিক যে সময় লাগে তাহাকে রবিভুক্তি বলে। সুতরাং ষষ্টিদণ্ডে ঐ রবিভুক্তি যোগ করিলে তবে একটী পূর্ণ অহোরাত্রি হয়। এই অহোরাত্রিকেই একটী সৌরদিন বলিয়া

থাকে। কিন্তু পঞ্জিকাদিতে বর্ত্তমানকালের জ্যোতিষ ব্যবসায়িদিগের গণনা দৃষ্ট করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দিনমান ও নিশামান যোগ করিলে নাক্ষত্রিক দিনের ন্যায় ষষ্টি দণ্ডমাত্রই হইয়া থাকে সৌরদিনের পরিমাণ হয় না। সুতরাং পঞ্জিকা লিখিত দিনমান বা নিশামান দণ্ডাদি সূর্য্যের উদয় ও অস্তজনিত দিনমান বা নিশামানের পরিমাণ যে হইতেই পারে না তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

সংক্রান্তি গণনাতে ও যে প্রকার ভ্রম হইয়া আসিতেছে তাহা দেখিলে জ্যোতিষশাস্ত্রখানি ক্রমশঃ যে একটী বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত হইবে তাহা এক প্রকার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বত্রেই জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রকাশ আছে এবং সর্ব্বদা সকলেই ইহা বলিয়াও থাকেন যে বিষুবসংক্রান্তিদিবসে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয় এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবস হইতে সূর্য্যের উত্তরাভিমুখে গতি আরম্ভ হওয়ায় এতদ্দেশে ক্রমশঃ নিশামান কমিয়া দিবভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি দিবস হইতে সূর্য্যের দক্ষিণাভিমুখে গতি আরম্ভ হওয়ায় এতদ্দেশে ক্রমশঃ দিবামান কমিয়া নিশাভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পঞ্জিকাদিতে বর্ত্তমান কালের জ্যোতিষ ব্যবসায়িদিগের গণনা দেখিলে জানা যায় যে বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভে বিষুবসংক্রান্তি এবং মাঘ মাসের প্রারম্ভে উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি হইয়া থাকে কিন্তু দিবামান ও নিশামান গণনাতে দেখা যায় যে ১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্র দিবারাত্রির পরিমাণ সমান হয় এবং ১০ই আষাঢ় দিবার বৃদ্ধি পূর্ণ হইয়া ১১ই আষাঢ় হইতে ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় ও ১০ই পৌষ নিশার বৃদ্ধি পূর্ণ হইয়া ১১ই পৌষ হইতে ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা বিদ্রূপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আবার আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে ঐ ভ্রম গণনানুসারেও প্রত্যেক ঐরূপে গুণিত সংক্রান্তিতে একটী পুরুষাকারে চক্র অঙ্কিত করিয়া তদ্দ্বারা মনুষ্যাদির শুভাশুভ গণনারও চেষ্টা করা হয় ইহা যে কতটুকু অভ্রান্ত হইতে পারে তাহা ত বুঝাই যাইতেছে। এই সংক্রান্তিগুলিন প্রকৃতপক্ষে যাহা অবলম্বন করিয়া গণনা করিতে হয় সেই অয়নাংশটী যে একেবারে গণনা করা হয় না তাহাও নহে। প্রতি সংক্রান্তি পুরুষের পার্শ্বেই দেখা যায় যে উহা রীতিমত গণনা

করিয়া অয়নাংশাদি বলিয়া লিখিত হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ পর্য্যন্ত উহা কোন কার্য্যেই আবশ্যক হইল না কিম্বা উহাতে যে কোন প্রকার আবশ্যক আছে কোন জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী তাহা বিবেচনা করাও প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

এক্ষণে যে সংক্রান্তি গণনা হইয়া থাকে তাহা সূর্য্যের রাশিসংক্রান্তি মাত্র; উহা বিষুবসংক্রান্তি বা অয়নসংক্রান্তি কিছুই নহে কেবল ভ্রমপ্রযুক্ত পঞ্জিকাতে ঐ সকল নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে মাত্র; সুতরাং ঐ সমস্ত অবলম্বন করিয়া যাহা গণনা করা হইয়া থাকে তাহাও দ্রষ্টব্য নহে। সংক্রান্তি পুরুষের পার্শ্বে অয়নাংশাদি গণনাটী দেখিলে জানা যায় যে বিষুবরেখাটী রাশিচক্রে ২০ অংশ কয়েক কলা পশ্চাত গমন করিয়া এক্ষণে কন্যা ও মীন রাশির ১০ম অংশে অবস্থিত আছে। সুতরাং উক্ত সংক্রান্তি এক্ষণে ১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্র দিবসে (ঐ সকল স্থানে সূর্য্যের আগমনকালে) ঘটিয়া থাকে এইজন্য ঐ দুইদিবসে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয় এবং তৎ-প্রযুক্ত উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের স্থানটীও ঐরূপ প্রায় ২১ অংশ পশ্চাদ্গামী হওয়ায় ১০ই পৌষ ও ১০ই আষাঢ় দিবসে উক্ত সংক্রান্তি সংঘটন হইয়া থাকে। এই জন্য এক্ষণে ১১ই পৌষ হইতে ক্রমশঃ নিশামানের হ্রাস হইয়া দিবাভাগের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় ও ১১ই আষাঢ় হইতে ক্রমশঃ দিবাভাগের হ্রাস হইয়া নিশাভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উক্ত অয়নাংশাদি অনুসারে সংক্রান্তি চক্রগুলিন অঙ্কিত করিয়া শুভাশুভ গণনা করিলে ফলেতেও কোন প্রকার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা-গণও বলিয়াছেন যে—

চল সংস্কৃত তিগ্মাংশোঃ সংক্রমো যঃ স সংক্রমঃ।
অজাগলস্তন ইব রাশি সংক্রান্তি রুচ্যতে॥

অদ্য এ বিষয় এই পর্য্যন্ত বলা হইল কিন্তু যুগ সম্বন্ধে আলোচনাই এ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। সে বিষয় এ সংখ্যাতে কিছু প্রকাশিত হইল না ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীপ্রিয়নাথ কড়ার।

কে ?

আঁধার গগনে নিশীথের কোলে,
আঁধারে ডুবায় তারকারাজি,
জলদের গায় চপলা হাসায়,
কে সাজায় বনে ফুলের সাজি ?
তরুণ প্রভাতে পূরব গগনে,
তরুণ অরুণে কেবা হাসায় ?
শোক সন্ধ্যাকালে আঁধারের জালে,
কে আবার তারে আবরে হায় ?
ধায় যার পানে পিয়াস পরাণে,
চকোর চকোরী গগন ভেদি ;
দরশি যাহারে কুমুদ নিকরে,
হাসে সরোবরে প্রফুল্ল হৃদি,—
সুনীল বরণে নিশীথ গগনে,
সে শশী বয়ানে কেবা হাসায় ?
পুনঃ তমস্বিনী অমানিশীথিনী,
কাহার আদেশে আবরে তায় ?
প্রেমের জগতে প্রেমের ভাবেতে,
প্রেমের মূরতি সৃজিল যে,—
ধনী প্রেমধনে, অয়ি ! প্রেমাননে !
প্রেমময় তিনি বল গো কে ?

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

এই না সেই মন্দির যুগযুগান্তর ধরিয়া যেখানে বিশ্বেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরদ্বারের অনতিদূরে শনির ভীষণ মূর্ত্তি। মঙ্গলময়কে পাইবার পূর্ব্বে শনিরদশা পরিহার করিয়া নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশে সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রসন্ন করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক একবার ঐ মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। বাহিরের দৃশ্যে মুগ্ধ হইওনা। মন্দিরের অপূর্ব্ব স্বর্ণধ্বজা দেখিয়া বিস্মিত হইওনা। অগণিত জনস্রোত দেখিয়া স্তম্ভিত হইওনা। রাশি রাশি বিল্বদল বিন্যস্ত রহিয়াছে, অবিরত শঙ্খধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সান্ধ্য আরতির অপূর্ব্ব লীলা অভিনীত হইতেছে ইহাই যথেষ্ট মনে করিওনা। যিনি বিশ্বেশ্বর তাঁহার মহিমা তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিবার অনেক স্থান আছে। জগতের সমুদয় রত্ন আহরণ করিয়া গগনভেদী বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ কর, তথাপি তাহার বিভব কণামাত্রও প্রকাশ করিতে পারিবে না। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতে পরাস্ত, এইরূপ শতসহস্র মন্দির তাহা কিরূপে সাধন করিবে।

প্রকৃতির বিচিত্রময় রাজ্য ত্যাগ করিয়া কেন এই স্থানে আসিয়াছ? এই ভারতের উত্তরসীমায় যে অসীম পর্ব্বতরাজি অনন্তের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া মহেশের মহিমাস্তব পাঠ করিতেছে, তাহার চরণতলে দাঁড়াইয়া জীবনকে সার্থক কর এবং দক্ষিণ সাগরে যে কলনাদী মহাসমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে সেই অনন্ত বারিরাশিতে নয়নের ভক্তিবারি মিশাইয়া অনন্তদেবের চরণোদ্দেশে প্রবাহিত হইতে প্রার্থনা কর। এই যে দিগন্তবাহী সমীরণ বহিতেছে ইহাতে তোমার হৃদয়ের কথা মিশ্রিত হইয়া ঐ বিচিত্র নক্ষত্রলোক ভেদ করিয়া দেবধামে যাইয়া আত্মার কল্যাণ কামনা করিতে থাকুক। এই কাশীধামে আসিয়া এমন কি দেখিয়াছ যে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছ?

যেখানে ভক্ত সেইখানে ভগবান। ভক্ত ভিন্ন কাহার সাধ্য যে এই জড় জগতে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে? ভক্তগণের পদধূলি না পড়িলে কোন স্থানই তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে স্থানে যত ভক্তের সমাগম সেই স্থান

ততোধিক পুণ্যভূমি মহাতীর্থ। ভক্তের সমাগম বন্ধ হউক তোমার দেবতা জ্ঞানবাপীতে অন্তর্হিত হইবেন; ঐ শিলাখণ্ডের অভ্যন্তরে যে মহাজ্যোতি ... ছন্ন রহিয়াছে তাহা অপসারিত হইবে এবং দেবভূমির স্থলে মানবের বিলাসমন্দির বিনির্ম্মিত হইবে। অগণিত ভক্তের সমাবেশ বলিয়া বিশ্বেশ্বরের এতদূর মাহাত্ম্য এবং এই মন্দির এতদূর নয়নের তৃপ্তিকর ও হৃদয়ের আনন্দ-নিকেতন।

কাশীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদের ব্যাখ্যা ভক্তের মনে স্থান পায় না। স্বর্গের একাংশ বিচ্যুত হইয়া এই স্থান বিরচিত হইয়াছে এবং স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহাই ভক্তের বিশ্বাস ও ধারণা। এতদিন তাহাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলাম, ভাগ্যগুণে যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহাতে সে ভ্রম দূর হইয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র এক মহাতেজস্বী সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সহিত কাশীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হওয়ায় তিনি উৎসাহভরে কহিলেন—"যুগযুগান্তর ধরিয়া ভক্তের নয়ন হইতে যে বারিধারা নিঃসৃত হইয়াছে তাহা মিলিত হইয়া ক্রমে প্রবাহ বহিয়াছে; সেই প্রবাহে সাধুর চরণরেণু সংধৌত হইয়া স্তরের পর স্তর সংরচিত হইয়া কাল সহকারে এই পবিত্র ভূমি পরিণত হইয়াছে তৎপর ভক্তের আহ্বানে বিশ্বেশ্বরের অধিষ্ঠান হইয়াছে তাই এই স্থানের এতদূর মাহাত্ম্য এবং ইহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রখ্যাত। এই স্থানের প্রতিবিন্দু সাধুভক্ত জনের নয়নবারিতে অনুলিপ্ত, ইহা স্বর্গ হইতেও পবিত্র। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র ভক্তের হৃদয় হইতে যে উচ্ছ্বাস সঙ্গীত উদ্গত হইয়াছে তাহা মন্দিরের প্রতি অণু কম্পিত করিয়া উত্থিত হইয়া ওঁকার সমুদ্রে যাইয়া বিলীন হইতেছে। শব্দই ব্রহ্ম--শব্দের বিনাশ নাই। ঐ শুন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যে ওঁকার নিনাদিত হইয়া বিশ্বচরাচরকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল তাহারই বীণাঝঙ্কার অনুনাদন সংবাদিত হইয়া সাধকের চিত্ত দ্রবীভূত করত মহেশের মহিমা বিঘোষিত করিতেছে আর ঐ দেখ ত্রিশূলহস্তে জটাজূটধারী কে ঐ মন্দির মধ্যে যোগরাজ্যের অধীশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনিই আবার আরতির সময়ে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া ভক্তজনের সঙ্গে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকেন। নিশান সময়ে ইনি যোগমায়া অন্নপূর্ণার সহিত একাত্মরূপে স্বীয় রাজ্য প্রদক্ষিণ করত ভক্ত সাধকের কুলকুণ্ডলিনী প্রতিধ্বনিত

ও জাগ্রত করিয়া অপার করুণা বিস্তার করিয়া থাকেন। এমন স্থান কি আর আছে—ইহা ত্যাগ করিয়া আমি স্বর্গেও যাইতে চাহি না।” বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তিনি মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

এরূপ চিত্তোন্মাদক ভাব আর কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। কবির কল্পনায় মাধুর্য্য আছে কিন্তু ভক্তের বিশ্বাসবৃক্ষে যে অমৃত ফল ফলিয়া থাকে তাহার কি আর তুলনা আছে? দূরে চন্দ্রকে হাসিতে দেখিয়া সাগরের উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে, কুমুদিনী আনন্দে অধীরা হইয়া সতৃষ্ণভাবে তাকাইয়া রজনী যাপন করে চকোর সুধাপানে মত্ত হইয়া উল্লাসতরঙ্গে ভাসিতে থাকে—এ দৃশ্য তৃপ্তিকর হইলেও তাহাকে পরাস্ত করিয়া ভক্তের হৃদয়ের ভক্তিগঙ্গা অপূর্ব্ব লহরী বিস্তার করিয়া বহিতে থাকে। এই মন্দিরে সমাগত হইয়া বিশ্বেশ্বরের পদপ্রান্তে অবলুণ্ঠিত হইলে কাহার না চিত্ত আনন্দরসে অভি-সিঞ্চিত হয়? কে সে বেগ ধারণ করিতে পারে? প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে কত নরনারীর হৃদয় যে এই ভক্তিহ্রদে সন্তরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? কত যে সন্তাপিত হৃদয়ে সান্ত্বনার আশ্বাসবাণী আশার তূর্য্যনিনাদে সম্মিলিত হইতেছে, পুণ্যের সংস্পর্শে পাপের অনুতাপ অশ্রুতে কত যে মুক্তাফল ফলিতেছে তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? সংসারের সকল হারাইয়া নিরাশজীবনের উপকূলে শান্তির সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করত তথায় এই বিশ্বেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদনুধ্যানে কত যে নরনারী কালাতিপাত করিতেছে তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভারতের সুদূর পর্ণকুটীর হইতে প্রতিদিন কত যে হৃদয় এই স্থানে আসিবার জন্য একান্তমনে কাতরভাবে ডাকিতেছে, মণিকর্ণিকার প্রজ্জ্বলিত চিতানলে চন্দনলিপ্ত হইয়া চরমশান্তি লাভার্থ কত যে আগ্রহাকুল হইয়া পড়িতেছে তাহা ভাবিলে কাহার না চিত্ত দ্রবীভূত হয়? এই অপূর্ব্ব স্থানে আসিয়া জরা যৌবনতরঙ্গে নৃত্য করিতেছে, শোকের মরুভূমিতে আশামালঞ্চ বিকশিত হইয়া শোভা পাইতেছে, অনাহারজনিত ক্লেশে তৃপ্তির সুধা উদগত হইতেছে, নিরাশার অন্ধকারে সহসা আশার আলোক বিভাসিত হইতেছে, শুষ্ক নীরস হৃদয়ে ভাবের উৎস উৎসারিত হইয়া অনন্তপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে—রোগে আরোগ্য, শোকে সান্ত্বনা, বিয়োগে মিলন, আসক্তিতে

বিতাড়নে অর্ণবপোতের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারে নাই। যে পোতে এরূপ বিশ্বাসী-বীর বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সে পোতের কি কখনও কোন প্রকার বিপদ হইতে পারে? বস্তুতঃ বিশ্বাসই সুখ, বিশ্বাসই মোক্ষ। বিশ্বাসনেত্র উন্মীলন কর, দেখিতে পাইবে সর্ব্বশক্তিমান পরম কারুণিক পরমেশ্বর তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তুমি জগজ্জননীর ক্রোড়ে রক্ষিত, তুমি শান্তি নিকেতনে অবস্থিত। বিশ্বাস-বিহীন আত্মা নীরস, মরুভূমি, সদা আশঙ্কিত ও বিষণ্ণ। চক্ষু না থাকিলে মানব অন্ধ, বিশ্বাস বিহীন আত্মাও অন্ধ। জগতের বিচিত্র শোভা অন্ধের নিকট প্রকাশ পায় না; আধ্যাত্ম রাজ্যের বিমল আনন্দ বিশ্বাসবিহীন আত্মা উপভোগ করিতে পায় না, মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাব সে বুঝিতে পারে না, স্বর্গরাজ্যের উন্মুক্ত দ্বার সে দেখিতে পায় না, তাই তাহাকে শুষ্কতা, অশান্তি ও আশঙ্কার রাজ্যে বাস করিতে হয়। বিশ্বাস মানব-হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করে, সুখের প্রবাহ প্রবাহিত করে। শত তর্কজাল বহুযুগে যাহা আরম্ভ করিতে পারে না, বিশ্বাস এক দিনে এক মুহূর্ত্তে তাহা সাধন করিতে পারে। কথায় বলে "বিশ্বাসে পাবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" এই বিশ্বাস বলেই শিশুধ্রুব পদ্মপলাশ-লোচনের সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই বিশ্বাস বলেই বালক প্রহ্লাদ নানা বিঘ্নবিপদ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং স্ফটিকস্তম্ভের ভিতরেও হরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসের বলেই দস্যু রত্নাকর দেবতা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বিশ্বাস বলেই দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাই উদ্ধার পাইয়াছিলেন। এই বিশ্বাস বলেই কত পাপী সাধু হইযাছেন ও হইতেছেন। আমাদিগের পাপ-প্রাণ অবিশ্বাসী হৃদয় বিশ্বাসের মহিমা বুঝিল না, তাই সদা আশঙ্কিত, অশান্তির জলে নিমজ্জিত, তাই পাপের পসরা বহিয়া বহিয়াই জীবনের অবসান হইতে চলিল।

বিশ্বাসের মহিয়সী শক্তির পরিচায়ক দুইটী উপাখ্যান আমরা বৈষ্ণব-দিগের ভক্তিমান গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কোন স্থানে এক পরম বৈষ্ণবভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটী অল্পবয়স্ক দৌহিত্র ছিল। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটী বিগ্রহ ছিল। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যথাবিহিত ভক্তিসহকারে সেই দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতেন।

একবার ব্রাহ্মণকে মাধ্যাহ্নিক আহারের পর কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়। যাইবার সময়ে দৌহিত্রকে বলিয়া যান, "ঠাকুরসেবার যেন ক্রটী না হয়, তুমি সন্ধ্যাকালে ঠাকুরকে দুগ্ধ সন্দেশাদির ভোগ দিবে, আমি কল্য প্রাতে প্রত্যাগমন করিব।" সরলমতি বালক সত্যই বিশ্বাস করিল যে ঠাকুর দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। মাতামহ বলিয়া গেলে সে সন্ধ্যার সময়ে দুগ্ধের বাটী লইয়া ঠাকুর ঘরে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের সম্মুখে দুগ্ধেরবাটী রাখিয়া বলিল—"ঠাকুর দুধ খাও।" ঠাকুর কোন উত্তর করিলেন না, দুগ্ধও পান করিলেন না। বালক অধিকতর আগ্রহ সহকারে বলিল "ঠাকুর দুধ খাও।" ঠাকুর তথাপি নিরুত্তর, দুগ্ধও পান করিলেন না। "তুমি আমার হাতে দুধ খাইবে না কেন?" বলিয়া তরুণমতি বালক কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুর তথাপি কোন উত্তর দিলেন না, দুগ্ধও পান করিলেন না। অবশেষে বালক একখানি অস্ত্র লইয়া বলিল, "ঠাকুর! দুধ খাবে ত খাও, নতুবা তোমার সাক্ষাতে গলায় ছুরি দিয়া মরিব।" ইহাতেও ঠাকুর দুগ্ধপান না করায় বালক মনের খেদে সত্য সত্যই গলদেশে ছুরি বসাইতে যায়, অমনি সেই দেবমূর্ত্তি বাম হস্তে বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিবৃত্ত করেন এবং দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধের বাটী তুলিয়া লইয়া দুগ্ধ পান করেন। মাতামহের কথায় বালকের প্রতীতি হইয়াছিল যে ঠাকুর দুগ্ধ পান করেন, এই বিশ্বাসে সে ঠাকুরকে জেদ করিয়া ধরিয়াছিল, এমন কি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, দয়ার ঠাকুর কি ইহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন? তাই তিনি মৃণ্ময় দেবমূর্ত্তির ভিতরে আবির্ভূত হইয়া বালকের প্রদত্ত দুগ্ধ পান করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন।

এক ক্ষুদ্রগ্রামে এক ধর্ম্মপরায়ণা দুঃখিনী বাস করিতেন। সে গ্রামে কোন বড়লোকের বাস ছিল না; কয়েক ঘর দীন দুঃখী লইয়াই সে গ্রাম। দুঃখিনী অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গ্রামবাসী সকলেই দুঃখী, সুতরাং তাহাদিগের কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা ছিল না। দুঃখিনী হরিভক্তিপরায়ণা, ভগবদ্চিন্তাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত, দুঃখচিন্তা করিবার অবকাশ হইত না। এই দুঃখিনীর একটী অতি অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। পুত্র বিদ্যাশিক্ষা করিবার উপযুক্ত বয়ক্রম প্রাপ্ত হইলে মাতা তাহাকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার মানস করেন। কিন্তু

নিজ গ্রামে কোন পাঠশালা না থাকায় একক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামান্তরের পাঠ-শালে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। জননী প্রথম প্রথম কয়েকদিন পুত্রকে পাঠশালে দুইবেলা দিয়া আসিতেন ও তথা হইতে লইয়া আসিতেন। কিন্তু দুইবেলা বালককে পাঠশালে দিয়া আসিতে এবং তথা হইতে লইয়া আসিতে মাতার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তিনি দুঃখ মেহনত করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। উপরোক্ত কার্য্যে তাঁহার এত অধিক সময় ব্যয় হইলে তিনি দুঃখ পরিশ্রম করিবার সময় পান না, সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ ভার হয়। এই কারণে মাতা বালককে অধিক দিন নিজে পাঠশালে রাখিয়া আসিতে বা তথা হইতে লইয়া আসিতে পারেন নাই। কিছু দিনের পর বালক একাকীই পাঠশালে গমনাগমন করিতে লাগিল। উভয় গ্রামের মধ্যস্থলে এক নিবিড় জঙ্গল বর্ত্তমান, সন্ধ্যাকালে পাঠশালের ছুটী হইলে এই নিবিড় জঙ্গল দিয়া বাড়ী আসিতে বালকের বড় আতঙ্ক হইত। বালক এক দিন মাতাকে বলিল, "মা! সন্ধ্যার সময়ে জঙ্গল পার হইয়া আসিতে আমাকে বড় ভয় লাগে।" মাতা বালককে অভয় দিবার কোন উপায় না দেখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করেন। পরিশেষে বালককে সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "ভয় কি বাবা! তুমি কিছুমাত্র ভয় করিওনা। যদি একান্তই তোমার ভয় পায় তবে "শ্রীমধুসূদন" বলিয়া ডাকিও, তিনি তোমাকে অভয় দিবেন।" বালকমন সদা অনুসন্ধিৎসু, তাই জিজ্ঞাসা করিল "সে কে মা?" মাতা উত্তর করিলেন, "তিনি তোমার দাদা।" বালক বলিল, "এত বড় নাম আমার মনে থাকিবে না, তুমি ছোট নাম বলিয়া দাও।" ধর্ম্মপ্রাণা জননী উত্তর করেন, "যদি 'শ্রীমধুসূদন' বলিয়া ডাকিতে না পার, তবে 'মধুদাদা' বলিয়া ডাকিও, তাহা হইলেও তিনি তোমাকে অভয় দিবেন।" জননীর কথায় বালকের প্রতীতি হইল, জঙ্গলে বুঝি সত্যই তাহার মধুদাদা আছেন, তিনি তাহাকে বিপদের সময়ে রক্ষা করিবেন। মাতার উপদেশ মত বালক জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভয় পাইলেই কাতরকণ্ঠে ব্যাকুলতার সহিত বলিত "মধুদাদাগো! মধুদাদাগো! বড ভয় লেগেছে, তুমি বাহির হইয়া আমাকে জঙ্গলটা পার করিয়া দাও।" বিশ্বাসের অনন্ত মহিমা, তাই বিশ্বাসী বালকের নিকট বিপত্তারণ মধুসূদন সত্য সত্যই নিত্য আবির্ভূত হইয়া তাহাকে জঙ্গল পার করিয়া দেন। কিছু দিন পরে মাতা কৌতূহল

পরবশ হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "জঙ্গলে তোমাকে ভয় লাগে, একথা ত তুমি আর বল না, তবে আর কি তোমাকে ভয় লাগে না। পুত্র উত্তর করিল, "কেন মা! তুমিইত ভয় পাইলে মধুদাদাকে ডাকিতে বলিয়া দিয়াছ। আমি ভয় পাইলেই মধুদাদাকে ডাকি, আর তিনি বাহির হইয়া আমাকে জঙ্গল পার করিয়া দেন। মা! মধুদাদা আমাকে বড় ভালবাসেন।" ভক্তি-মতি জননী বুঝিলেন ব্যাপার খানা কি? আনন্দাশ্রুতে তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। তিনি বালককে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"বাপ রে! তোরই জন্ম সার্থক! জন্ম জন্মান্তরে কঠোর তপস্যা করিয়া মানুষ যে ফল লাভে কৃতকার্য্য হয় না, একমাত্র বিশ্বাস বলে তুই তাহা লাভ করিয়াছিস্! ঘোর দুঃখ দুর্দ্দিনে যাঁহার সুধামাখা নাম করিয়া অশান্ত হৃদয় শান্ত করিয়াছি, তাঁহাকে তুই প্রত্যক্ষ দেখিয়া মানব জন্ম সার্থক করিয়াছিস।" নিবিড় গহনে ভয় পাইয়া বিশ্বাস বলে বালক ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া অভয় পাইয়াছে, এই ভবগহন ভয় বিভীষিকা ও বিপদময়, এখানে ভয় পাইয়া যদি আমরা বিশ্বাসীর ন্যায় কাতরকণ্ঠে, ব্যাকুলতার সহিত, বিপদভঞ্জনকে ডাকি, তিনি আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে বিপন্মুক্ত করেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা দীন কৃপাপাত্র! আমাদিগের সেরূপ বিশ্বাস কই? সেরূপ কাতরে ডাকই বা কই? তাইত আমরা বিপদে অভয় পাই না। কবি মনের খেদে গাইয়াছেন, "যদি ডাকার মতন পারিতাম ডাক্‌তে, তাহলে কি এমন করে লুকিয়ে থেকে প্রেম করতে পারতে?"

বিশ্বাস বিষয়ক একটী পৌরাণিক উপাখ্যান বিবৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিব। একদা দেবর্ষি নারদ, বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে বৈকুণ্ঠাভিমুখে গমন করিতেছেন। পথে কিদ্দূর গিয়া দেখেন যে এক সৌম্যমূর্ত্তি যুবক উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যুবকের সহাস্য আনন দেখিয়া তাহার মনের ভিতরে যে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট আছে এরূপও বোধ হয় নাই, যুবক যে ভগবদ্ভক্ত, ব্রহ্মদর্শন লাভ জন্য কঠোর সাধনে নিযুক্ত এমনও বোধ হয় নাই। যুবক দেবর্ষির আগমনে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার কোথায় গমন হইতেছে জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে নারদ "বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছেন জানিতে পারিয়া যুবক তাঁহাকে বলেন—"দেবর্ষি! আপনি যদ্যপি বৈকুণ্ঠ-

ধামে গমন করিতেছেন, তবে কৃপা ক'রিয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিবেন—আমার পরিত্রাণ কবে হইবে। এবং তিনি কি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন প্রত্যাগমনকালে আমাকে বলিয়া যাইবেন। আমি আপনার অপেক্ষায় এই স্থানে বসিয়া থাকিব।" দেবর্ষি প্রতিশ্রুত হইয়া অগ্রসর হন। কিছু দূর গমন করিলে কঠোর সাধনে রত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পান। তাহার চারি দিকে অগ্নি জ্বলিতেছে, মস্তক নিম্নে, পদদ্বয় ঊর্দ্ধে, মুখের ভাবে বোধ হয় তাহার প্রাণের ভিতরে দারুণ কষ্ট যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে, তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। দেবর্ষি বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনিও বলিলেন, "প্রভো! অনুগ্রহ পূর্ব্বক নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমার পরিত্রাণের আর বিলম্ব কত এবং তিনি কি বলেন প্রত্যাগমনকালে তাহা আমাকে বলিয়া যাইবেন।" নারদ এই কঠোর সাধকের অনুরোধও রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন।

দেবর্ষি নারায়ণের নিকট সমুপস্থিত হইলে অন্যান্য কথাবার্ত্তা ও সদালাপের পর কৃচ্ছ্র সাধনে নিযুক্ত ব্যক্তির কথা উত্থাপন করেন। এই ব্যক্তির কঠোর সাধনায় নারদ ইহার প্রতি অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন, তাই তাহার সম্বন্ধে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন যে—এ ব্যক্তির উদ্ধারে আর বিলম্ব কত? প্রত্যুত্তরে নারায়ণ কহেন "এখনও বিলম্ব আছে।" প্রত্যুত্তরে নারদ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন। তৎপরে, তিনি যাইবার সময় পথে প্রথমে যে ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন যে "ইহার উদ্ধার কবে হইবে?" নারায়ণ কহেন "সত্বর"। এই উত্তর শুনিয়া নারদ আরও বিস্মিত হন। তিনি বিরক্তির সহিত ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"ঠাকুর! তোমার এ কেমন বিচার? যে হাসিয়া খেলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছে, যাহার সাধন নাই, ভজন নাই, তাহার পরিত্রাণ সত্বর হইবে; আর যে ব্যক্তি কঠোর সাধনে দারুণ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি দিবানিশি তপ জপ করিতেছে, তাহার পরিত্রাণে এখনও বিলম্ব আছে, এ তোমার কেমন বিধান? এ ব্যবস্থা তোমাতেই সাজে আমরা ইহার রহস্য কি বুঝিব?" নারদকে বিরক্ত হইতে দেখিয়া ভগবান বলেন—"দেবর্ষি! বিরক্ত হইও না, আমি যাহা ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার বিশিষ্ট হেতু আছে। তোমার

। ... কালে যখন প্রত্যেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে "আমার পরিত্রাণ ... নারায়ণ বলিয়াছেন ?" তখন বলিও যে "নারায়ণ বলিলেন যে, ক্ষুদ্র সূচিকার ছিদ্রের অভ্যন্তর দিয়া যে দিন এক মাতঙ্গ গমনাগমন করিতে পারিবে, সেই দিনেই তোমার পরিত্রাণ হইবে।" এই কথা শুনিয়া উভয়ের যেরূপ মনোভাব হইতে দেখিবে তাঁহাতেই বুঝিতে পারিবে যে আমি যাহা ... করিয়াছি তাহাই ঠিক।" নারদ তথাস্তু বলিয়া নারায়ণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কৃচ্ছ্রসাধকের নিকট প্রথমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলেন, "তোমার প্রশ্নোত্তরে ঠাকুর বলিলেন যে যেদিন সূচিকার ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটা হস্তী গমনাগমন করিতে পারিবে, সেই দিনেই তোমার পরিত্রাণ হইবে।" দেবর্ষির মুখে ভগবানের এবম্প্রকার উত্তর শুনিয়া কৃচ্ছ্রসাধক নিরাশ হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন এক ক্ষুদ্র সূচিকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্র দিয়া প্রকাণ্ড হস্তির গমনাগমন, তাও কি কখনও হয় ? তবে ত দেখিতেছি আমার পরিত্রাণ হইল না, এত সাধনা, এত তপস্যা, এত কষ্টযন্ত্রণা সমস্তই কি তবে মিথ্যা হইল ? এইরূপ নানা কথা বলিয়া তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অপর ব্যক্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন প্রভো ! ঠাকুরকে আমার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি ?" প্রভু বলেন, "হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে, যেদিন সূচিকার ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটা হস্তী গমনাগমন করিতে পারিবে, সেই দিনেই তোমার উদ্ধার হইবে।" নারদের মুখে ভগবানের এই উত্তর শুনিয়া যুবকের আহ্লাদের সীমা রহিল না, তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"দেবর্ষি ! তবে ত আমার উদ্ধার হইয়াগিয়াছে ! যাঁহার ইচ্ছায় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি কোটী কোটী গ্রহ উপগ্রহ, সৃজিত ও পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সূচিকার ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটী কেন, শত সহস্র মত্ত মাতঙ্গ একত্রে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে।" নারদ বুঝিলেন এব্যক্তি কঠোর সাধনে শরীর মনকে কষ্ট না দিলেও ইহার বিশ্বাস যেমন প্রবল, তাহার এক কণা মাত্রও কৃচ্ছ্র-সাধকের নাই। তিনি ভগবানের ব্যবস্থার রহস্য বুঝিয়া পুলকিত হইলেন। অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকিলে কেবল মাত্র কঠোর সাধনে শারীরিক কষ্ট

যন্ত্রণায় কিছুই ফল হয় না। যিনি সংশয়তিমির ভেদ করিয়া বিশ্বাসের সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় আগমন করিতে পারেন, পরিত্রাণের পথ তাঁহার পক্ষে সরল ও সুগম।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল সিংহ।

আমার মেনা।

আমার সাধের মেনা　আয় আয় কোলে সোণা
　থাওয়া ভুলে কোথায় ছিলি যাদুমণি ?
ব্যস্ত হয়ে চারি ধারে　ডাকি তোরে বারে বারে
　আসিলে না কেন তুমি, বল দেখি শুনি ?
"কোলের উপর উঠে　দিস্ মোর নাক চেটে
　মিউ মিউ রবে কত, জানাও আহ্লাদ
নীরব ভাষায় মোরে　কত বল গলা ধ'রে
　সেই সব ভুলে গিয়ে, কোথা ছিলি চাঁদ ?
আমার বিড়াল উটি　চোখ দুটি মিটি মিটি
　তোমরা কখন ভাই, ধরনা উহায়
আমি ভালবাসি ব'লে　তাই ধরা দেয় মোরে
　তাই মোর কোলে এসে আদর জানায়
কান দুটী উচু করি　আসে যবে ধীরি ধীরি
　দূর হতে লাফ দিয়ে, পড়ে মোর গায়
তারা" বড় দুষ্টু মেয়ে　তেড়ে আসে ধেয়ে ধেয়ে
　বলে দিদি ছেড়ে দাও, কামড়াবে তোমায়
কত লাজ পেয়ে তায়　খেলিতে নাহিক চায়
　জড় সড় হয়ে মেনা, যায় গুড়ি গুড়ি
ঘরে যেয়ে এক ধারে　কেঁদে কেঁদে মেনা মরে
　কোলে নাহি উঠে মেনা, যায় তাড়াতাড়ি

বাটীপুরে ভাত নিয়ে যাই তার পিছে ধেয়ে
মুখ ভার করে মেনা, যায় রাগ ভরে
আয় আয় আয় পুষি কোলে কোরে হই খুসী
কি অপরাধ করিয়াছি, বলনা আমারে ?
আমায় না ধরা দিল দাদা এসে কোলে নিল
দাদার কাছেতে মেনা, কত আদর পায়
গলাটী জড়িয়ে ধরে মিউ মিউ রব করে
আদরে সোহাগ ভরে, ন্যাজটী নাড়ায়।
ভাল দ্রব্য যাহা পাই মেনারে খাইতে দেই
ভাজা মাছ পেলে মেনা, বড় খুসী হয়
দুধ মাছ কত ছানা পেট পুরে খায় মেনা
উহার এক দোষ এ বলতে লজ্জা হয়
যদি পায় ভাজা মাছ মেনা নাহি ছাড়ে পাছ
যে কোন প্রকারে হউক, করিবেক চুরি
যদি দুধ থাকে ঘরে মেনা তাহা চুরি করে
কেহ নাহি পাবে টের, ভাবে বাহাদুরী
ধরা যবে পড়ে মেনা জানি সব গুণপানা
মেনার কারণ আমি, খাই গালাগালি
মাছ মুখে করে মেনা চলে যায় কেলে সোণা
ভাজা মাছ খায় মেনা, কচ কচ গিলি।

কুমারী হেমাঙ্গিনী।

মৃত্যুর পর।

(৩)

গীতা হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি তাহা হইতেই সুবুদ্ধি পাঠক আমার মন্তব্য বুঝিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি গুরুতর বলিয়া আরও প্রমাণের প্রয়োজন। হিন্দুশাস্ত্র অপার জলধি প্রমাণের অভাব নাই কেবল মাত্র একটু কষ্টস্বীকার করিয়া একত্রে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। দুই একজন পাঠক অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে পরকায়াপ্রবেশ সম্বন্ধে আরও কিছু তাঁহারা শুনিতে চাহেন। অদ্য তাঁহাদের কথাই শিরোধার্য্য। সময় থাকিলে অন্য কথার আলোচনা করিব। পূর্ণিমার আকার ছোট বলিয়া আমাকে কষ্ট পাইতে হইতেছে আর পাঠক মহাশয়কেও যে রসভঙ্গ অসুখে ভুগিতে হইতেছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে লীলার উপাখ্যান বলিয়া একটি উপাখ্যান আছে। বশিষ্ঠদেব বক্তা, রামচন্দ্র শ্রোতা। ১১০টি শ্লোকে এই উপাখ্যান শেষ হইয়াছে।

বশিষ্ঠ উবাচ

অত্রেদং মণ্ডপাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণং।
নিঃসন্দেহো যথৈষোঽর্থশ্চিত্তে বিশ্রান্তিমেতি তে॥

এই শ্লোকে উপাখ্যান আরম্ভ, আর

জীবন্মুক্তাস্ত ইত্যেবং রাজ্যং বর্ষযুতাষ্টকং।
কৃত্বা বিদেহমুক্তত্বমাসেদুঃ সিতসম্বিদঃ।

ইতি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তি প্রকরণে
লীলোপাখ্যানং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

ইহাতে উপাখ্যান শেষ হইয়াছে।

পূর্ণিমাতে আগাগোড়া সংস্কৃত উপাখ্যান উদ্ধার করা বা আগাগোড়া বঙ্গানুবাদ দেওয়া অসম্ভব এই জন্য পাঠক মহাশয়কে সঙ্কেত করিতেছি তিনি অনুগ্রহ করিয়া মূল বা বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। আমি কেবল মাত্র সারাংশে নির্ভর করিব।

"পদ্ম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম লীলা। লীলা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন কিসে তাঁহার স্বামী অমর হইবেন। যখন ব্রাহ্মণমুখে লীলা শুনিলেন যে অমর হইবার কোন উপায় নাই তখন ভাবিলেন হয় আমার মৃত্যু অগ্রে হইবে না হয় আমার স্বামীর মৃত্যু হইলেও তাঁহার জীবন আমার গৃহ হইতে না যাইতে পারে এমন করিতে হইবে। এই ভাবিয়া লীলা সরস্বতী দেবীর আরাধনা আরম্ভ করিলেন ও ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিয়া সরস্বতী দেবীর নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন। (১ম) পতির দেহাবসান হইলে তাঁহার জীবন অন্তঃপুর হইতে অন্য কোথাও না গমন করে (২য়) যখনই প্রার্থনা করিবেন তখনই সরস্বতীর দর্শন পাইবেন। দেবী তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন। কালক্রমে নৃপতির মৃত্যু হইলে লীলা নিজ দেহ বিসর্জ্জনে উদ্যতা হইলেন। তখন আকাশভবা সরস্বতী বলিলেন "বৎসে তোমার স্বামীর শরীর পুষ্পমণ্ডপে আচ্ছাদন করিয়া রাখ, পুষ্প ম্লান হইবে না, স্বামীর শরীর নষ্ট হইবে না, আবার স্বামীর সহিত তোমার সহবাস ঘটিবে।" লীলা তাহাই করিয়া দেবী সরস্বতীকে আবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার প্রাণপতি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন ও কি করিতেছেন ইত্যাদি। সরস্বতী বলিলেন

চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কং।
দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং বরাননে॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ সম্বিদো মধ্যমেব যৎ।
নিমেষেণ চিদাকাশং তদ্বিদ্ধি বরবর্ণিণি॥
তস্মিন্নিরস্তনিঃশেষসংকল্পে স্থিতিমেষি চেৎ।
সর্ব্বাত্মকং পদং শান্তং তদা প্রাপ্নোষ্যসংশয়ং॥
অত্যন্তাভাবসম্পত্ত্যা জগতস্ত্বেতদাপ্যতে।
নান্যথা গত্বরেণাশু ত্বন্ত প্রাপ্স্যসি সুন্দরি॥

অর্থাৎ "চিত্তরূপ আকাশ, চিৎস্বরূপ আকাশ ও মহাকাশ এই তিনটি আকাশ, চিত্তাকাশ ও মহাকাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কিন্তু এই উভয় শূন্যকেই চিদাকাশ বলিয়া জানিও। এক বস্তুর জ্ঞানের পর অন্য বস্তুর জ্ঞান পক্ষে সাক্ষী স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহার এবং নিমেষ মধ্যে একবস্তু হইতে অন্য বস্তুতে আসক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের যে স্থিরতা, তাহাই চিদাকাশ। যদি সকল

বাসনা ত্যাগ করিতে পার তাহা হইলে নিশ্চয়ই সত্যরূপ শান্ত পদ পাইবে। জগতের অত্যন্ত অভাব হইলে সেই বস্তু (ব্রহ্ম) পাওয়া যায়, অন্য প্রকারে নয়, হে সুন্দরি তুমি তোমার গমনশীল আত্মা দ্বারা তাঁহাকে পাইবে।"

এই কথা শুনিয়া লীলা নির্বিকল্প সমাধি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং নিমেষ মধ্যে স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া চিদাকাশস্থিত হইয়া অন্তঃপুর স্বরূপ গৃহাকাশে বহুতর রাজগণ উপবিষ্ট ও স্বীয় স্বামীকে দেখিলেন। দেখিলেন স্বামী সিংহাসনে উপবিষ্ট, পূর্ব্বদ্বারে অসংখ্য মুনি, দক্ষিণদ্বারে রমণী সম্প্রদায়, পশ্চিমদ্বারে হস্তী অশ্ব রথ ইত্যাদি, উত্তরদ্বারে অসংখ্য রাজা ও সৈন্যসামন্তাদি। দেখিলেন তখন রাজা ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক। পরে মহিষী আপনার অন্তঃপুরে যাইয়া সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে স্বামী দেহত্যাগ করিয়াও নিঃশরীর হইয়া কিরূপে মিথ্যাময় সৃষ্টিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তদুত্তরে সরস্বতী বলিয়াছিলেন "পূর্ব্বস্মৃতি ত্যাগ হইলেও যেরূপ তোমার স্বামীর ভ্রান্তিময় সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই রূপেই তোমার স্বামীর দ্বিতীয় শরীর সৃষ্ট হইয়াছে। চিদাকাশের কোনখানে সংসার মণ্ডপ আছে, উহা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল কাচ দ্বারা আবৃত। সেই সংসার মণ্ডপে সুমেরু স্তম্ভতুল্য, তৃণ সকল (তাহার) আকাশ স্বরূপ, স্ত্রী সকল পুত্তলিকা, এক দেশস্থিত প্রাণিগণ বল্মীক স্বরূপ এবং পর্ব্বত সকল লোষ্ট্রভাবে বিরাজিত। সেই সংসারে বহুতর পুত্রকন্যাদির বৃদ্ধ পিতা এবং প্রজা, ঈশ্বর ও ব্রাহ্মণ পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্থির বায়ু বিশিষ্ট স্থানে বৈমানিকের ন্যায় কীট স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। গগন বিহারী সিদ্ধ পুরুষেরা ঘুন ঘুন শব্দে মশকদিগের ন্যায় এই সংসারে কাল যাপন করিতেছেন, এখানে নিয়ত দেবাসুরগণের দুর্নিবার লীলা কোলাহল হইয়া থাকে। "সেই সংসারের এক কোণে শৈলরূপ লোষ্ট্রের নিম্নভাগে গিরি বিশ্রাম গর্ত্তক বলিয়া এক দেশ আছে। তথা বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ ও অরুন্ধতী নামে তাহার স্ত্রী বাস করিত। (আসল বশিষ্ঠ অরুন্ধতী নহে) বশিষ্ঠ একদিন পর্ব্বতে বসিয়া কোন রাজা দেখিয়া বাসনা করিল যে রাজা হওয়া বড় সুখ। পরে বশিষ্ঠের মৃত্যু হইল। পত্নী অরুন্ধতী আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করে—"আমার মৃত স্বামীর জীবন যাহাতে অন্তঃপুর হইতে অন্যত্র গমন না করে আপনি সেইরূপ বর দিন' আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়াছি। ব্রাহ্মণের গৃহাকাশ তাহার জীবাকাশ হইল। ব্রাহ্মণ মৃত্যুর

পর জন্মান্তরীণ বাসনা বশতঃ নৃপতি হইয়াছেন; আর পত্নী স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন দিয়া আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া স্বামীর নিকট হইলেন। সেই ব্রাহ্মণের গৃহ আদি সবই আছে। আজ আট দিন হইল ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে। তোমার স্বামী সেই রাজপদ গ্রহণ করিয়াছেন আর তুমি ব্রাহ্মণী অরুন্ধতী। 'আমি জন্মান্তরীণ সাংসারিক ভ্রমের এই কথা বলিলাম।"

লীলা সরস্বতী দেবীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। দেবী পুনরায় বলিলেন—"আমরা নিয়তির ভেদ করি না অর্থাৎ পূর্ব্বাদৃষ্ট দ্বারা ভোগ্য বিষয়ের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দিয়া অপর ভ্রান্তি স্বরূপ ভোগ দর্শন করাইয়া থাকি। * * স্বপ্নাবস্থাতে জাগ্রত স্মৃতির লোপ হইয়া অন্য সংসার উদয় হয়, মরণও সেইরূপ। যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্ব স্থিত হয় সেইরূপ চিৎস্বরূপ আকাশে সত্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ে।"

লীলা বলিলেন—আজ আট দিন আমার স্বামী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে এখানে আমাদের বহুবর্ষ গত হইবে ইহা কিরূপে সম্ভব?

দেবী বলিলেন—চিদ্বিলাসী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকে অন্য বস্তু কিছুই নাই। অন্তঃকরণের ভ্রান্তি জন্য দেশ কাল অল্প দীর্ঘ মনে হয়। জীব ক্ষণকাল মিথ্যা মরণ মূর্চ্ছা অনুভব করিয়া পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া অন্য সংসার ভাব দর্শন করিয়া থাকে। * * আমি সেই পিতার পুত্র, আমার এত বর্ষ পরমায়ু হইল, এই প্রীতিপ্রদ বান্ধব ও রমণীয় গৃহাদি আমার এইরূপ ভ্রান্তি, স্মৃতি মোহের পরই হইয়া থাকে। * * যেরূপ সুবর্ণকে মুদ্রা বলিয়া ভ্রম হয়, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানী জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস ব্যতীত তোমার শরীর ব্রহ্মস্বরূপ হইবে না। * * যে প্রকার হিম জল তাপ সংযোগে উষ্ণভাব ধারণ করে সেই প্রকার স্থূল দেহস্থ চিত্ত বাসনাক্ষয় হইয়া শুদ্ধ হইলে আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয়।

* * *

এইরূপে সেই রাত্রিতে কথোপকথন করিয়া সরস্বতী ও লীলা উভয়ে সমাধিস্থানে গমনপূর্ব্বক নিশ্চল শরীরে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা চিদাকাশ স্বরূপিণী হইয়া আকাশগত আকার ধারণ করিলেন ও আকাশ মাত্র দর্শন করিতে লাগিলেন। "যে আকাশের গম্ভীরতা এবং নির্ম্মলান্তর

ভাগ একার্ণবের ন্যায় যাহা কোমল মরুতসংসর্গে সতত স্নিগ্ধভাবাপন্ন ও কোমল। যাহার আশ্রয়ে মনোবেগের ন্যায় মহাসিদ্ধগণ বায়ুসংসর্গ শূন্য হইয়াছে, যে আকাশের পর্য্যন্ত দেশ কুষ্মাণ্ড, রাক্ষস ও পিশাচমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। যেখানে ডাকিনীগণ নৃত্য করিতেছে, যে আকাশের কোন কোন স্থল কুকুর, কাক, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য বদনবিশিষ্ট যোগিনীগণের নৃত্য দ্বারা তরঙ্গিতের ন্যায় বোধ হইতেছে এবং তাহাদের গমনাগমন দ্বারা শূন্য প্রদেশ নিশ্ছিদ্রের ন্যায় উপলব্ধি হইতেছে, যেথানে আকাশে স্থির বায়ু মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন, যাহার কোনখানে ভিত্তিহীন গৃহ দেখা যাইতেছে, কোনখানে নারদের তুম্বুরুধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। কোন স্থানের মূলদেশে কল্পান্তকালীন মেঘাবলী চিত্রলিখিত আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোনস্থানে মাতৃমণ্ডল একত্রে বিলাস করিতেছে; তাঁহাদের সেইস্থান লক্ষ যোজন উচ্চ, সেথান হইতে ভূতল দর্শন করা দুর্ঘট। * * সেই শূন্যদেশ সরস্বতী ও রাজমহিষী উভয়ে অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার অবনীতে আসিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মমণ্ডল হইতে একেবারে ব্রাহ্মণ বশিষ্টের আগারে উপনীত হইলেন, বহুকাল নির্ম্মল জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা লীলা সংকল্পসিদ্ধ ও সরস্বতী সিদ্ধকাম হইলেন। তাহাদের ইচ্ছানুসারে বশিষ্টপুত্র সুশর্ম্মা তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন। পুত্র পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহাদের সমার্চ্চনা করিলেন এবং তাহাদের স্পর্শে বিগতশোক হইলেন। তৎপরে সিদ্ধ নারীদ্বয় তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মৃত স্বামী যেথানে রাজত্ব করিতেছে আমি সেথানে যাইলাম কিন্তু কেহ আমাকে দেখিতে পাইল না, তবে এথানে আমার পুত্র কি করিয়া আমাকে দর্শন করিল? দেবী কহিলেন তথন তোমার "আমি লীলা" এইরূপ জ্ঞান ছিল এই জন্য, এখন তোমার সে জ্ঞান নাশ হইয়া সত্যসংকল্প হইয়াছে। তুমি যদি এথন তোমার স্বামীর নিকট গমন কর তবে পূর্ব্ববৎ ব্যবহার ঘটিতে পারে।

লীলার তথন পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে জাগরূক হইল। বলিতে লাগিল, আমি দেখিতেছি আমি ব্রহ্মার কল্পে অবতীর্ণ হইয়াছি, আমার অষ্টশত জন্ম গত হইয়াছে। প্রথমে বিদ্যাধরাঙ্গনা ছিলাম পরে কুমতিপ্রযুক্ত কুৎসিৎ কার্য্য করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করি ও কলিঙ্গ রাজার বনিতা হই। পরে

কদম্ববনবিহারিণী শ্যামবর্ণা চণ্ডালিনী হই। পরে পক্ষী হই। তাহার পর ভ্রমরী হইয়াছিলাম। পুরুষত্ব ফল বিষয়ক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষদেহ ধারণপূর্ব্বক রাজা হইয়া সুরাষ্ট্র দেশে একশত বৎসর রাজ্য করি, তার পর দোলাতে দোলন কামনা করিয়া মশক হই ও বৃক্ষপত্রে পত্নী মশকের সহিত দুলিয়াছি।

তৎপরে ঐ দুইটী স্ত্রী বশিষ্ঠের সংসার হইতে নির্গত হইয়া এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে নিজান্তপুরে আগমন করিয়া লীলা মৃত স্বামীর শরীর অবলোকন করিলেন। তার পর যোগপরায়ণা লীলা ভর্ত্তার জীবনের সংসারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে একজন অপর রাজা সৈন্যসামন্ত লইয়া (লীলার ভর্ত্তা মরিয়া যে রাজা হইয়াছেন) তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। মহাসমরের পর রাত্রি সমাগত হইলে রাজা একটু বিশ্রামলাভ করিবার জন্য শয্যায় মুহূর্ত্তকালের জন্য নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন। লীলা ও সরস্বতী শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা জাগরিত হইয়া দেখিলেন আসনে দুইটী স্ত্রীলোক বসিয়া। যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলেন। দেবী সরস্বতী মন্ত্রীকেও জাগরিত করিয়া রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন "ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র ভদ্ররথ, তৎপুত্র বিশ্বরথ, তৎপরে মনোরথ পরে আমাদের প্রভু এই বিদূরথ। ইহাঁর পিতা দশম বর্ষ বয়সে ইহাঁর হস্তে রাজ্যভার দিয়া বনগমন করেন। তখন দেবী সরস্বতী রাজার শিরঃস্পর্শ করিলেন। তখন রাজার সমুদয় স্মরণ হইল, বলিলেন 'সংসারের কি আশ্চর্য্য মায়া, আমার একদিন মাত্র মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু দেখিতেছি সপ্ততি বর্ষ গত হইল।'

সরস্বতী বলিলেন—এই সংসার ভ্রমময় রজ্জুতে সর্প ভ্রমরূপ। নির্ম্মল আকাশের ন্যায় পরিষ্কৃত চিত্তে যে ব্যবহাররূপ ভ্রম বিস্তার প্রকাশ আছে এখন তুমি জানিতে পারিলে, কিন্তু পূর্ব্বে এক মুহূর্ত্তে তোমার সপ্ততিবর্ষ বলিয়া বোধ হইয়াছে। যেরূপ নিদ্রাবস্থায় মুহূর্ত্ত কালকে শতবর্ষ বলিয়া ভ্রম হয় সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় মায়াবিলাস সম্ভূত জগৎভ্রম হইয়া থাকে। বাস্তবিক তুমি জন্মগ্রহণ কর না বা তোমার মৃত্যু হয় না কেবল শান্ত ভাবে আত্মাতে অবস্থিতি কর কিন্তু পাপমতি যে ব্যক্তি বিষয়ে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মপদ চিনিতে

না পারে এই জগৎ অনিত্য হইলেও তাহার নিকট বজ্রসারতুল্য নিত্য রূপে প্রকাশ হয়। * * লীলাস্বরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার নিকট বলিলাম আমরা এক্ষণে গমন করি।

তখন রাজা বর প্রার্থনা করিলে স্বরস্বতী বলিলেন তোমার এই যুদ্ধে মৃত্যু হইয়া পূর্ব্বরাজ্য অধিকার করিবে। তখনই একজন দূত আসিয়া জানাইল যে শত্রুরা অতি বেগে আসিতেছে ও নগরে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। এই সময়ে রাজমহিষী আসিয়া রাজার শরণাপন্ন হইলে রাজা দেবী স্বরস্বতী-কে তাঁহার ভার্য্যারক্ষার ভার দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। লীলা দেবী রাজমহিষীকে দর্পন প্রতিফলিত আপন প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখিয়া দেবীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন "তোমার স্বামী সেই পুরীর মধ্যে থাকিয়া যে বিষয় দর্শন করিয়া মৃত হইয়াছেন সেই ভাব ধারণ করিয়া এখানে সেই সকল ভাব দেখিতে পাইলেন। মরণকালে যাহার যে বস্তু চিন্তা অবিসম্বাদী হয় তাহার চিত্ত দর্পণে তাহাই প্রতিফলিত হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রত বিষয় এবং জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন বিষয় অসৎ হয় সেই-রূপ জন্মাবস্থাতে মৃত্যু এবং মৃত্যু অবস্থাতে জন্ম অসদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই হেতু এই লীলা তোমার ন্যায় স্বভাব আচার ইন্দ্রিয় এবং শরীর বিশিষ্ট হইয়া প্রতিবিম্বজাত প্রতিভার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তোমার স্বামী এই বিদূরথ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইবেন।" তখন তৎপুরাস্পদা লীলা দেবীর নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে আমার স্বামী রণে প্রাণত্যাগ করিয়া যেখানে অবস্থিতি করি-বেন আমি এই শরীরে সেই কালে তাঁহার ভার্য্যা হইয়া অবস্থান করিব। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া বর দিলেন। তখন পূর্ব্বলীলা জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে স্থূলদেহে কেন বশিষ্টের গৃহে লইয়া যান নাই।" দেবী বলিলেন আমি কাহারও কিছু করি না। প্রাণীগণ সঙ্কল্প অনুসারে সকল সঙ্কল্প পাইয়া থাকে। হে লীলে তুমি 'মুক্ত হইব' প্রার্থনা করিয়াছিলে সেই প্রকারে প্রবোধিত হইয়াছ। আর এই লীলা মৃত ভর্ত্তার সহিত স্থূল দেহে তাহার ভার্য্যা হইবার বাসনায় আমাকে আরাধনা করিয়াছিল, সেই কারণে আমিও সমুচিত সংকল্প ফল দান করিয়াছি।

এদিকে রাজা বিদূরথ যুদ্ধে গমন করিয়া পরদিন অতিশয় যুদ্ধের পর

রণে হত হইলেন। নগরবাসীরা ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন দ্বিতীয় লীলা স্বামীর অনুগমন জন্য সরস্বতীর ধ্যান করিয়া ক্ষণ মধ্যে আকাশপথে উড্ডীয়মান হইলেন। তখন মেঘপথ হইতে বায়ুপথ, তথা হইতে সূর্য্যপথ, ধ্রুব তারাপথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাদি স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড কপালভেদ ও পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাচিৎ স্বরূপ গগন প্রাপ্ত হইলেন। গরুড় সেখানকার সীমা শতকোটী কল্পেও পার হইতে পারে না। সেই চিদ্গগণে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পদ্মরাজার নগর দেখিয়া তদন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাজার শব দেখিয়া তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ধরাশায়ী রাজার জীব নভোগামী হইল। তখন জীবলেখা, সরস্বতী ও লীলার আকাশ গতি হইল। প্রথমে জীবলেখা পদ্মরাজপুরী অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন পরে সরস্বতী ও লীলা উভয়ে প্রবেশ করিলেন। দেবী তখন বিদূরথের জীবকে অবরোধ করিলেন। লীলা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন আমার স্থূল দেহ আর দেখিতে পাইতেছি না কেন? দেবী বলিলেন সমাধি সময়ে মৃত জ্ঞানে মন্ত্রী দগ্ধ করিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে সশরীরে এখানে আগত দেখিয়া পরলোক হইতে নিবৃত্ত বলিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইবে। এখন তুমি আতিবাহিক দেহ ধারণ দ্বারা যোগের প্রভাবে ইচ্ছাশরীর সুতরাং প্রকাশ্য দর্শনীয় হইয়াছ। বাসনা ক্ষয় হওয়াতে তোমার স্থূল দেহ বিস্মৃত হইয়াছ এবং সূক্ষ্ম শরীরের জ্ঞান দ্বারা আধিভৌতিক স্থূলশরীর নাশ করিয়াছ এখন আইস আমরা এই ইচ্ছাময় দেহ দ্বিতীয় লীলাকে দর্শন করাই। দ্বিতীয় লীলা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে আসনে উপবেশন করাইলেন, তখন দেবী রাজার দেহজীবন মোচন করিলেন। বায়ুকণা রূপী সেই জীবামৃত রাজার নাসিকার নিকট গমন করিল এবং নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। রাজা তখন অঙ্গ বিস্তৃত করিতে লাগিলেন ও চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিলেন ও উল্লাসিত শরীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও "এখানে কে আছে" গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিলেন। তখন লীলাদ্বয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন তুমিই বা কে, ইনিই বা কে, কোথা হইতে আসা হইয়াছে? লীলা বলিলেন, দেব, আমার নাম লীলা, আমি আপনার মহিলা। প্রাক্তনের সহিত আমি বর্দ্ধিত হইয়াছি, এই দ্বিতীয়

লীলাও আপনার মহিলা, আপনার জন্য শুভলক্ষণ প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই লীলার সৃষ্টি হইয়াছে, আর যিনি শিরোভাগে হেমময় আসনে উপবিষ্ট তিনি ত্রিলোকের জননী কল্যানদায়িনী দেবী সরস্বতী।

রাজা এই কথা শুনিয়া সরস্বতীর পাদপদ্মে পতিত হইলেন। সরস্বতী রাজাকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের অনন্ত সুখ প্রাপ্তি হউক ইত্যাদি।"

তখন সরস্বতী অন্তর্হিত হইলেন। মহাবুদ্ধি লীলাদ্বয় এবং রাজা জীবন্মুক্ত হইয়া অতীত বৃত্তান্ত কথন দ্বারা অমৃতের ন্যায় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন এবং সরস্বতীর কৃপায় জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া লীলাদ্বয় সমভিব্যাহারে সেই নগরে অষ্ট অযুত বর্ষ অনিন্দিতভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া এই প্রকারে অষ্টাযুত বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া সিদ্ধজ্ঞান দ্বারা বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

(ভূকৈলাস রাজবাটীর সংস্করণ)

ক্রমশঃ।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মধুময়ী গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপ দর্শনযোগ।

ভগবানের নানাবিধ গঠন—বিশ্বরূপ দর্শন—অর্জ্জুনের স্তব—অর্জ্জুনের ভয়—চতুর্ভুজ রূপ—অর্জ্জুনের প্রতি আশ্বাস বাক্য।

অর্জ্জুন কহিলেন—

অনুগ্রহ করি কৃষ্ণ গোপনীয় অতি
আত্মতত্ত্ব, যাহা মোরে কহিলে সংপ্রতি,
তাহাতে এ মোহ দূর হইল আমার। ১

কমল পত্রাক্ষ হরি তুমি বারবার
ভূতগণ সৃষ্টিলয় মাহাত্ম্য অক্ষয়
কৃপাকরি জনার্দ্দন কহিলে আমায়। ২
সত্য হে পরমেশ্বর কহিলে যা তুমি,
ঐশ্বরিকরূপ তব দেখিব যে আমি? ৩
যদ্যপি সক্ষম হই সেরূপ দর্শনে,
সে অব্যয় আত্মা প্রভো দেখাও অর্জ্জুনে। ৪

শ্রীভগবান কহিলেন—

নানাবিধ বর্ণে পার্থ বিবিধ গঠন
আমার অনন্তরূপ কর দরশন। ৫
ভারত, দ্বাদশাদিত্য, রুদ্র একাদশ,
অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য প্রকাশ,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু, সে অশ্বিনীদ্বয়,
সকলি আমাতে এই দেখ ধনঞ্জয়। ৬
সমস্ত একত্র স্থিত বিশ্বচরাচর,
গুড়াকেশ, মমদেহে দেখ কি সুন্দর। ৭
নিজ নেত্রে কেহ মোরে দেখিতে না পান,
দিব্য চক্ষু তোমারে ত করিতেছি দান।
অঘটন ঘটনার সামর্থ্য আমার,
দেখিয়া সার্থক কর জীবন তোমার। ৮

সঞ্জয় কহিলেন—

রাজন্, অর্জ্জুনে তবে করিয়া আহ্বান,
মহা যোগেশ্বর হরি স্বরূপ দেখান। ৯
ঐশ্বরিক সেইরূপে অদ্ভুত দর্শন
বহুমুখ, বহুনেত্র, বহুআভরণ,
উদ্যত দিব্যাস্ত্র কত, দিব্য মাল্য গণে, ১০
অনন্ত সর্ব্বত্র মুখ, মহা প্রভা জ্বলে,
দিব্যবস্ত্র দিব্যগন্ধ বরাঙ্গের শোভা,
সকলি আশ্চর্য্যময় অতি মনলোভা। ১১

আকাশে সহস্র সূর্য্য একত্র প্রকাশ,
মহাত্মার মহা দেহে প্রভার আভাস। ১২
সেই দেব-দেব-দেহে অর্জ্জুন তখন
দেখিলা বহুধা বিশ্ব একত্র স্থাপন। ১৩
কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণে করিয়া প্রণাম,
রোমাঞ্চিত দেহে কহে পার্থ গুণধাম— ১৪
হে দেব ও তব দেহে, সমস্ত দেবতা রহে,
পৃথক পৃথক প্রাণিগণ,
দিব্য ঋষিগণ কত, হেরি বিষধর যত
বসি ব্রহ্মা কমল-আসন। ১৫
বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, একি তব কলেবর?
বহুবাহু বহুমুখ আঁখি,
অনেক উদর হেরি, অনন্তরূপ মাধুরি,
আদি অন্ত মধ্য নাহি দেখি। ১৬
গদাচক্র ধারী মরি, বিশ্বময় দীপ্তি কারী,
তেজঃপুঞ্জ, কিরীট মাথায়,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রভা দুর্নিরীক্ষ্য অগ্নিআভা,
অপ্রমেয় দেখি যে তোমায়। ১৭
তুমিই অক্ষর ব্রহ্ম, মুমুক্ষুর জ্ঞান গম্য,
বিশ্বের আশ্রয় জানি আমি;
তুমি নিত্য সত্যগতি, সনাতন ধর্ম্মপতি
চিরন্তন পুরুষ যে তুমি। ১৮
সৃষ্টি স্থিতি লয় নাই, একি দেখিবারে পাই!
বহু বাহু চন্দ্র সূর্য্য আঁখি,
তেজে বিশ্ব তাপ পায়, অমিত প্রভাব তায়,
কি প্রদীপ্ত অগ্নিমুখ দেখি! ১৯
কিবা রূপ ভয়ঙ্কর, অন্তরীক্ষ চরাচর,
সর্ব্বদিক ব্যাপ্ত আছ তুমি,
ত্রিলোক হয়েছে ভীত! দেবকুল সমাহিত ২০

তোমাতেই দেখিতেছি আমি!
কৃতাঞ্জলিপুটে কেহ, ডাকিতেছে অহরহঃ,
মহর্ষিরা সিদ্ধগণ কত,
"স্বস্তি" বলি করে স্তব; পিতৃগণ বসু সব, ২১
বিশ্বদেব, সাধ্যদেব যত,
অশ্বিনীকুমার দ্বয়, একাদশ রুদ্র তায়
উনপঞ্চাশৎ বায়ু আর,
আদিত্য ও গন্ধর্ব্বেরা, যক্ষ, সিদ্ধ অসুরেরা,
বিস্ময়ে দেখিছে চমৎকার! ২২
বহুমুখ নেত্র বাহু, উরু পাদোদর বহু,
বহুদন্তে ভয়ঙ্কর অতি,
রূপ হেরি লোক যত, আমিও হয়েছি ভীত, ২৩
হে বিষ্ণো, তোমার একি জ্যোতি?
অন্তরীক্ষব্যাপী গাত্র, প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র,
দেখিমুখ বিবৃত তোমার,
নাহি মোর ধৈর্য্যলেশ, শান্তি নাই হে দেবেশ! ২৪
দিক ভ্রম হতেছে আমার!
আমায় দেহ আশ্বাস, শুন হে জগন্নিবাস,
সুপ্রসন্ন হও এ দাসেরে। ২৫
ভীষ্মাদি ভূপাল কত, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যত,
ধাবমান মোদের উপর, ২৬
মহাদন্ত ভয়ঙ্কর, তোমার মুখবিবর,
প্রবেশ করিছে সবে তায়,
চূর্ণিত মস্তক কেহ, তব দন্ত সন্ধিসহ
লগ্ন, হেরি ভয়ে প্রাণ যায়। ২৭
ধায় যত স্রোতস্বিনী, সাগরমুখগামিনী,
সাগরেই প্রবেশে সকল,—
সেই মত বীর যত, স্রোতবেগে অবিরত
ওই মুখে পশিছে কেবল। ২৭

বহ্নিতে পতঙ্গগণ, মনোরঙ্গে স্মরণ
আবাহন করে মত্ত প্রায়,
সেইরূপ জনগণ, আপন মৃত্যু কারণ
করাল বদনে তব ধায়! ২৯

জ্বলন্ত বদন ভরি, সর্ব্বলোক গ্রাস করি,
বিলক্ষণ করিছ ভক্ষণ,
তীব্র সত্যতেজে হরি, সর্ব্বদিক ব্যাপ্ত করি,
দিতেছ হে তাপ বিলক্ষণ! ৩০

উগ্ররূপী যে আপনি! কৃপায় বলুন শুনি,—
আপনাকে করি নমস্কার,
আদিদেব সাধি আমি, সুপ্রসন্ন হও তুমি,-
জানিনা হে প্রবৃত্তি তোমার! ৩১

শ্রীভগবান কহিলেন—

শুন পার্থ চিরকাল, আমি সে করাল কাল,
সদা রত সর্ব্বলোক নাশে;
শুন শুন ধনঞ্জয়, বীর যত সমুদয়
কেবল আমার মুখে আসে! ৩২

উঠ উঠ পার্থ তবে, যশঃ লাভ কর ভবে
শত্রুনাশি হও রাজ্যস্বামী;
সব্যসাচী, শত্রু যত, আমিই করেছি হত,
এখন নিমিত্ত মাত্র তুমি। ৩৩

আমার নিহত দ্রোণ, জয়দ্রথ ভীষ্ম কর্ণ,
নির্ভয়ে নিধন কর সবে;
তব জয় সুনিশ্চয়, উঠ উঠ ধনঞ্জয়,
এই যুদ্ধে তব জয় হবে। ৩৪

সঞ্জয় কহিলেন—

তখন অর্জ্জুন শুনি, কেশবের যোগবাণী,
কৃতাঞ্জলিপুটে সকম্পনে,

কৃষ্ণে করি নমস্কার, কহিলেন পুনর্ব্বার,
ভয়ে ভয়ে গদগদ বচনে— ৩৫
হৃষিকেশ, তোমার যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে
জগৎ আনন্দ লভে; ভীত রক্ষোগণে
ভীত মনে ইতস্ততঃ করে পলায়ন,
তোমায় যে নমস্কার করে সিদ্ধগণ,
সকলি সে সত্য জানি! ওহে মহাত্মন্, ৩৬
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস শরণ,
ব্রহ্মা হতে গুরু তুমি, জনক ব্রহ্মার,
কেন না করিবে বিশ্ব পদে নমস্কার?
যাকিছু অব্যক্ত ব্যক্ত, উভয় কারণ, ৩৭
অনাদি অনন্ত তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
তুমি সে পরম ধাম, মহালয় স্থান,
জ্ঞাতা জ্ঞাতব্য সে তুমি, সর্ব্বত্র সমান। ৩৮
শশাঙ্ক বরুণ অগ্নি বায়ু যম তুমি,
প্রপিতামহ সে প্রজাপতি জানি আমি।
নমো নমঃ পদাম্বুজে নমঃ পুনর্ব্বার,
সহস্র সহস্রবার করি নমস্কার। ৩৯
নমোস্তু হে সর্ব্ব, তব সম্মুখে পশ্চাতে,
সর্ব্বদিকে নমস্কার করি বিধিমতে
তুমি হে অনন্ত বীর্য্য বিক্রম অপার,
তুমি সর্ব্ব, তুমি বিশ্বব্যাপী সারাৎসার। ৪০
হেন বিশ্বরূপ আর মহিমা অপার,
প্রমাদ প্রণয় বশে না জানিয়া সার,
"হে কৃষ্ণ, যাদব, সখে" বলি এই মত
সখাভাবি তিরস্কার করিয়াছি কত! ৪১
হে অচ্যুত, একাকী বা সখিগণ সনে,
ভোজন উপবেশন, বিহার, শয়নে,

আনন্দে থাকিত যবে, পরিহাস করি,
কত অপরাধ পদে করিয়াছি হরি !
অচিন্ত্য যে তুমি ! আজ ভিক্ষা তব পাশে,
নিতান্ত অজ্ঞান আমি ! ক্ষমা কর দাসে। ৪২
অতুল্য প্রভাব, তুমি চরাচর পিতা
গুরু ও গুরুর গুরু, তুল্য তব কোথা ? ৪৩
বিশ্বের পূজিত দেব, ঈশ্বর যে তুমি,
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতেছি আমি ;
পিতাপুত্রে, প্রিয়প্রিয়ে, বান্ধবে বান্ধব
ক্ষমাকরে যথা আর সহ্য করে সব,
সেইরূপ অপরাধ ক্ষম হে আমার,
নিতান্ত শরণাগত অর্জ্জুন তোমার ! ৪৪
হে কৃষ্ণ, অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ তব হেরি,
হৃষ্ট আমি, কিন্তু যেন মহাত্রাসে মরি !
হে দেব, জগন্নিবাস, দাসে দয়া কর,
শীঘ্র রূপ সম্বরিয়া পূর্ব্ব রূপ ধর। ৪৫
গদাচক্রধারী সেই কিরীট শোভিত
চতুর্ভুজ রূপে পুনঃ হও আবির্ভূত। ৪৬

শ্রীভগবান কহিলেন—

ভক্তিবিনা দেখে নাই কেহ কোন কালে,
হেন রূপ হে অর্জ্জুন যোগৈশ্বর্য্য বলে
প্রসন্ন হইয়া আজ দেখানু তোমায়,
বিশ্বাত্মক অনন্ত ও আদ্য তেজোময়। ৪৭
বেদবিদ্যা কিম্বা যোগবিদ্যা অধ্যয়নে,
উগ্রতপঃ অগ্নিহোত্র ক্রিয়াদি কি দানে,
আমার এ অপরূপ রূপ বিশ্বময়,
তোমা ভিন্ন অন্যলোকে দেখিতে না পায়। ৪৮
ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ হেরিয়া আমার,
ব্যথিত বিমূঢ় পার্থ হইও না আর ;

ভয়শূন্য প্রীতমনে দেখ পুনরায়,
গদাচক্রধারী সেই কিরিটী আমার। ৪৮

সঞ্জয় কহিলেন—

এতবলি কৃষ্ণ পূর্ব্বরূপ দেখাইয়া,
আশ্বাসিল ধনঞ্জয়ে প্রসন্ন হইয়া। ৫০

অৰ্জ্জুন কহিলেন—

এই সৌম্য নরমূর্ত্তি হেরি জনার্দ্দন,
সুস্থ হইলাম আমি, সুপ্রসন্ন মন। ৫১

শ্রীভগবান কহিলেন—

এই সুদুর্দ্দশরূপ করিতে দর্শন,
অৰ্জ্জুন, করেন বাঞ্ছা সদা দেবগণ। ৫২
যে রূপ দেখিলে পার্থ, তুমি ভাগ্যবান।
বেদতপঃযজ্ঞে কেহ দেখিতে না পান। ৫৩
ভক্তিযোগে মাত্র এই রূপ জানিবারে,
দেখিতে ও প্রবেশিতে ভক্তজনে পারে। ৫৪
সৰ্ব্বকৰ্ম্ম করে যেই উদ্দেশে আমার,
সর্ব্বভূতে সমদর্শী শত্রু নাই যার,
অপত্যে মমতাহীন, হেন ভক্তজন,
নিঃসংশয় ধনঞ্জয় মোরে প্রাপ্ত হন।৫৫

ইতি বিশ্বরূপ দর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায়।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

জন্মমৃত্যুর অধীন মানবসাধারণ সংসারস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে। এই গমনাগমন নিত্য ব্যাপার। সংসারের নিত্যানিত্যতা সম্বন্ধে যিনিই যত বিচার করুন, যিনিই যত সন্দেহ, তর্কবিতর্ক অথবা মীমাংসা করুন না কেন সংযোগ বিয়োগ রূপে জীবসমূহ নিয়তই নিত্য স্রোতে ভাসিতেছে। কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, কেন আসে, কেন যায়—জীবজগতের এই সকল দুরূহ তত্ত্ব অনুশীলন করিয়া অনেক দার্শনিক, অনেক পণ্ডিত মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছেন। আমরা সে সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতে সক্ষম এবং সম্মত নই। সে সকল অবসর ক্রমে পণ্ডিতমণ্ডলীরই আলোচ্য।

মানুষ জন্মে—আবার মরে। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সময় তাহারই নাম তাহার জীবনকাল অথবা আয়ুঃ। জন্মের পূর্ব্বে কি ছিল, জন্মের পরেই বা কি হইবে এ বড় কঠিন সমস্যা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মমৃত্যুর নিশ্চয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতে বলিয়াছেন—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।"

"ভূতসকলের আদিকারণ অব্যক্ত, নিধন বা শেষদশাও অব্যক্ত কেবল মাত্র মধ্যাবস্থা সুব্যক্ত অতএব হে অর্জ্জুন! এ বিষয়ে পরিতাপের কারণ কি?"

এখন বিচার্য্য এই যে দেহ ত ক্ষণভঙ্গুর, জীবন ত পদ্মপত্রজলবৎ টলমল। এ অবস্থায় মানুষ মানুষরূপে কি করিতে পারে? যাহারা পশু পক্ষীর মত জন্ম গ্রহণ করিয়া আহার নিদ্রা সুখসম্ভোগে জীবন পূর্ণ করিয়া যথাসময়ে যথাকর্ত্তব্য সাধন করিয়া মৃত্যুকবলে নিপতিত হইয়াছে, তাহাদের নাম তাহাদের কার্য্য তাহাদের সহিতই বিলীন হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃপাময় ভগবানের লীলা অনুভব করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসরণে, জীবনের উদ্দেশ্য সুস্থির জানিয়া ও শত সহস্র বাধাবিঘ্ন

অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মজ্যোতির বিমল আলোকে আপন পথ আলোকিত ও পরিষ্কৃত করিয়া অপরেরও পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, সেই সকল সার্থক ন্মা· মহাপুরুষ লোকসাধারণের আদর্শ। আক্ষেপের বিষয় এরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা অতি বিরল। এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যাঁহার নাম লিখিত আছে, তিনি একজন অসামান্য ভক্তিমান্ গুরুভক্ত দেবসেবক ও কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ। আজ তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ পাঠকবর্গকে অবগত করিবার উদ্দেশেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। সুগভীর সিন্ধুগর্ভে জ্যোতির্ম্ময় রতন সকল নিহিত। নিবিড় মরুপ্রান্তরে সৌরভময় কুসুমনিচয় বিকসিত। লোকচক্ষু সকল সময় অনায়াসে সে সকল রতন লাভে অধিকারী নয়। সাধারণের অজ্ঞাতসারে বনজ কুসুম স্বীয় সৌরভসম্ভার বনেই বিতরণ করে। যিনি কষ্ট স্বীকারে রতন সঞ্চয়ে ও কুসুম চয়নে প্রয়াসী তিনিই তাহার গরিমা ও মহিমা বুঝিতে পারেন। বিগত শারদীয়া পূজার অবকাশে আমি মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর গিয়াছিলাম। এই জঙ্গিপুরই প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান। ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গিমায় ও স্রোতের প্রতাপে জঙ্গিপুর এখন শ্রীভ্রষ্ট ও বিলুপ্তপ্রায়। ৭।৮ বৎসর মধ্যে ইহার অধিকাংশই নদীগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশও স্থায়ী হইবে না এরূপ আশঙ্কা। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মুরশিদাবাদ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। মুরশিদাবাদ জিলার নাম সর্ব্বজন পরিচিত। বঙ্গের শেষ নবাবগণ ভাগীরথী তীরে মুরশিদাবাদে বিরাজ করিতেন। এই মুরশিদাবাদেই বঙ্গের এমন কি ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী যবনগৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশী বণিক ইংরাজকে রাজা করিয়াছেন। মুরশিদাবাদের অনূ্যন ১৫ ক্রোশ দূরে প্রসিদ্ধ পলাশী প্রাঙ্গণ। পলাশীর নাম ইতিহাসের বিশেষতঃ ইংরাজী ইতিহাসের উজ্জ্বল পত্রে বিমল অক্ষরে খোদিত। এই মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর একটী ক্ষুদ্র নগরী। জঙ্গিপুরও ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। পৌরাণিক ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় সগরবংশ উদ্ধার জন্য ভগীরথ যখন কঠোর তপস্যার প্রভাবে গঙ্গাদেবীকে ধরাধামে লইয়া আসিতেছিলেন তখন তাঁহার অনবধানে শংখাসুর (পদ্মাসুর) গঙ্গাদেবীকে পথ ভুলাইয়া লইয়া যায়। পরে ভগীরথ গঙ্গাকে এ তত্ত্ব জানাইলে তিনি আর পূর্ণ প্রবাহে প্রত্যাগত হইতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র শাখারূপে ভাগীরথী নামে ভগীরথের সঙ্গে আসিয়া তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া সগর

বংশের উদ্ধার সাধন করিলেন। পূর্ণপ্রবাহা বৃহৎ নদী পদ্মা নামে পরিচিত হইল। যে স্থানে ক্ষুদ্রশাখা ভাগীরথী নাম্নী স্রোতস্বতী বহির্গতা হইয়াছে তাহারই নাম মোহানা। এই মোহানা পূর্ব্বে জঙ্গিপুরের ৬ ক্রোশ দূরে ছাপ-ঘাটী নামক স্থানে ছিল, এক্ষণে এই মোহানা জঙ্গিপুরের অতি নিকটে আসিয়াছে, এমন কি প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান মোহানা রহিয়াছে। বৎসর বৎসর মোহানা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকাতেই জঙ্গিপুরের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পূর্ব্ববিখ্যাত জঙ্গিপুর আর নাই। অধিকাংশই নদীগর্ভে গিয়াছে। মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর একটী বিখ্যাত মহকুমা। এই মহকুমা পূর্ব্বে অরঙ্গাবাদে ছিল। কিন্তু বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ইডেন্ সাহেব যখন অরঙ্গবাদ মহকুমার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সেই সময় সাঁওতাল-দিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সাঁওতালগণ ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তিনি সাঁওতালের ভয়ে তাহাদিগের কর্ত্তৃক বিতা-ড়িত হইয়া জঙ্গিপুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের দৌহিত্র বিজয়গোবিন্দ বড়াল ও যদুনন্দন বড়াল ইডেন সাহেবের অভ্যর্থনা, সমাদর ও উপকার যথোচিতরূপে করিয়াছিলেন। তৎকালে জঙ্গিপুরে জেমস্ মেসিক নামক এক কুঠীয়াল সাহেব ছিলেন। রেসমের কারবার এই সাহে-বের দ্বারা জঙ্গিপুর অঞ্চলে অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইডেন সাহেব উক্ত মেসিক সাহেবের আতিথ্য স্বীকার করেন। ইডেন সাহেবই পরে উদ্যোগী ও মনোযোগী হইয়া মহকুমার কার্য্যালয় সকল অরঙ্গাবাদ হইতে জঙ্গিপুরে উঠাইয়া আনিয়াছেন। তদবধি জঙ্গিপুর মহকুমা নামে খ্যাত। জঙ্গিপুর ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে এবং রঘুনাথগঞ্জ তাহার অপর পারে অর্থাৎ পশ্চিম পারে অবস্থিত। সরকারী সমস্ত কার্য্যালয় রঘুনাথগঞ্জে আছে। জঙ্গিপুর নামে পরিচিত দেওয়ানী, ফোজদারী, কালেক্টরী, জেল, পুলিষ ষ্টেসন সমস্তই রঘুনাথগঞ্জে। গঙ্গার স্রোতে জঙ্গিপুর যেরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে তথাকার সকলকেই রঘুনাথগঞ্জে আসিতে হইবে। পূর্ব্বলিখিত যদুনন্দন বড়ালের বাটীঘর জলমগ্ন হওয়ায় তাহার বংশাবলী রঘুনাথগঞ্জে নূতন বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। খ্যাতনামা কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিবার জন্য আরম্ভ করিয়া এতক্ষণ জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জের বর্ণনা করায় অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়া এ অপ্রাসঙ্গিক লেখার জন্য নানা দোষ

দিবেন। কিন্তু কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান বলিয়া উভয় স্থানই সুবিখ্যাত। এই দুই স্থানেই তাঁহার কমনীয় দর্শনীয় কীর্ত্তিরাজি বিরাজ করিতেছে। এ দুই স্থান দেখিলেই তাঁহাকে মনে পড়ে অর্থাৎ এই দুই স্থানের সহিত তাঁহার নির্ম্মিত দেবদেবীর মন্দির পর্ব্ব উৎসবের উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা অবিচ্ছিন্নভাবে সংমিলিত। সুতরাং কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তি দেখিতে ও জানিতে হইলে পাঠক পাঠিকাগণের এই দুই স্থানের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক বলিয়াই আমি ইচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এত কথা বলিলাম। জঙ্গিপুর সহর মুর্শিদাবাদ হইতে পনর ক্রোশ দূরে উত্তরে অবস্থিত। লুপলাইনের মুরারই ষ্টেসনের সাত ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর। এই জঙ্গিপুরে ও রঘুনাথগঞ্জে কীর্ত্তিচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া যেরূপে ও যে ভাবে নিজ কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যে জাতি লইয়া আজকাল অনেক আলোচনা বিচার বিতর্ক হইতেছে, যে জাতি স্পর্শযোগ্য ও জল আচরনীয় না হইলেও আচার ব্যবহার গুণে ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের সমতুল্য, যে জাতির বিধবাগণ শুদ্ধাচারে ও ব্রতনিয়মে শ্রেষ্ঠ বর্ণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, যে জাতির আচার ব্যবহার নবশাখ প্রভৃতি জল আচরণীয় জাতিদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, যে জাতি বৈশ্য হইবার জন্য ও তদুপযোগী ক্রিয়াকলাপ পাইবার নিমিত্ত সময় সময় ব্যাকুল ও ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন, যে জাতি বৈশ্যত্ব প্রমাণ জন্য নানা শাস্ত্রের নানা বচনের দোহাই দিয়া আপন মতের পোষকতা করিতেছেন, যে জাতি লোক প্রবাদ অনুসারে প্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও হীনবর্ণে পরিগণিত হইয়াছেন, যে জাতির প্রতি মহাপ্রভু দয়াময় শ্রী নিত্যানন্দ অসীম করুণা প্রকাশ করিতেন—শ্রীমান্ কীর্ত্তিচন্দ্র সেই সুবিখ্যাত সুবর্ণবণিক্ জাতির কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের জন্মস্থান, জন্মকাল পিতৃপিতামহের বাসভূমি ও পরিচয় প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদরূপে জানিবার উপায় খুব কম। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে কতক পরিমাণে জানা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা ঐতিহাসিক তীব্রভাবে তাঁহার জীবনী ও বংশাবলী সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ তত্ত্বসংগ্রহ করিয়া ইতিহাসপ্রিয়তার পরিচয় দিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে যে সকল খ্যাতনামা, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, বীর অথবা অপরবিধ কীর্ত্তিমান্

পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া নানা বিষয়ে আপন আপন কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের যে দশা অথবা কালনিয়তির হাতে যে দুর্দ্দাশা আমাদের কীর্ত্তিচন্দ্রও তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য্য, কালিদাস প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের প্রকৃত পরিচয় আমরা কি জানি? তাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের কীর্ত্তিই তাঁহাদিগকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। তবে অনেকস্থলে অনেক পরিচয় কবিদিগের কাব্য বর্ণনায় অথবা পুরাণ প্রসঙ্গে আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যে পঞ্চ পাণ্ডবের কীর্ত্তি বর্ণনায় মহাভারত মহা ভারত হইয়াছে, সেই সুপরিচিত বীর ও ধার্ম্মিকগণের পরিচয় পাইবার আকর-স্থান কেবল মহাভারত। ব্যাস নিজের পরিচয় তত না দিলেও মহাভারতীয় বীরগণের কীর্ত্তি বর্ণনায় কদাচ পশ্চাৎপাদ নহেন। কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন—

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে, কে জানিত যুধিষ্ঠিরে
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে॥

কীর্ত্তিমান্ কীর্ত্তিচন্দ্রের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। কোন কবি, ঐতিহাসিক তত্ত্বনিয়ন্তা অথবা জীবনীলেখক তাঁহার জন্য মাথা ঘামাইয়া তাঁহার বংশাবলী ও জীবনী সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হন নাই। আমি যতদূর জানিয়াছি ও জানিব ক্রমশঃ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিব।

কীর্ত্তিমান্ কীর্ত্তিচন্দ্র পিতামাতার বংশধর বা বংশতিলক। বোধ হয় কোন মহাপুরুষের আদেশে অথবা দৈব প্রত্যাদেশেই তাঁহার নাম কীর্ত্তিচন্দ্র রাখা হইয়াছিল। যে কীর্ত্তির বিমল চন্দ্রিকায় তিনি জঙ্গিপুর অঞ্চল আলোকময় করিয়া গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা, ও দেবসেবার সুব্যবস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কীর্ত্তিচন্দ্র নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন, অনেক ধনাঢ্য ও অর্থশালী ব্যক্তি তাঁহা অপেক্ষা অতুল বিষয় সম্পত্তি ও অর্থরাশি হস্তে পাইয়াও তেমন কীর্ত্তিগৌরব সংস্থাপন করিতে পারেন নাই অথবা তদনুরূপ কীর্ত্তিকলাপে তাঁহাদের মতিরতি জন্মে নাই। কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তি পরিদর্শনে ও সমালোচনে হৃদয়মধ্যে যে বিশুদ্ধ প্রেম, ভক্তি ও দয়ার আবির্ভাব হয়, তাহাতে নশ্বরদেহে আমরা যে অনেক কাজ করিতে পারি, এবং হৃদয়ের শক্তিসামর্থ্য আমাদিগকে মহীয়ান্ করিতে পারে, এ ভাব স্বতঃই আমাদিগের অনুভবে আসিয়া থাকে। এমন কি তাঁহার কার্য্যকলাপ ও কীর্ত্তিরাজী ভাবিলে তাঁহার জাতিত্ব মানবত্ব

বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে পরলোকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে মানসিক আসক্তি জন্মিয়া থাকে। বাস্তবিক এ প্রকার মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রকৃতই নবশক্তির উৎকর্ষ সাধন ও প্রেমভক্তির আদর্শ প্রদর্শন জন্য ঘটিয়া থাকে। পুরুষকার অলৌকিক মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। মানব ক্ষীণ শক্তি ও হীন বল হইলেও অনন্ত বাধাবিপদ পদদলিত করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া আপন উদ্দেশ্য আপন উদ্যোগে সম্যক্ রূপে সংসাধিত করিতে পারে অথবা ভগবান্ যাঁহার সহায়, গুরুপ্রতি যাঁহার অচলা ভক্তি তাঁহার আবার বিঘ্ন-বিপাত্ত কোথায়? তিনি গর্ব্ব, স্পর্দ্ধা না করিয়াও বীরচূড়ামণি কর্ণের ন্যায় অবশ্যই বলিতে পারেন—

সূতোবা সূত পুত্রোবা
যো বা কোবা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং মম জন্ম
মমায়ত্তং হি পৌরুষম্॥

আমি সূত, সূত পুত্র অথবা যে কেহ হই না কেন? আমার জন্ম দৈবাধীন কিন্তু পৌরুষ আমারই আয়ত্ত।

কীর্ত্তিচন্দ্র স্বকীয় শক্তি প্রভাবে যেরূপে নীরবে ধীরে ধীরে স্বকার্য্য সাধন করিয়া কর্ম্মভূমিতে স্বীয় কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা মানব সাধারণের যথার্থই উপদেশ ও চেতনা দিবার সম্যক্ উপযোগী।

কীর্ত্তিচন্দ্র প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকাল প্রচলিত জমীদারী ও ব্যবসায়ীর উপযুক্ত শিক্ষালাভই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। আধুনিক শিক্ষার প্রাবল্যে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না। সংস্কৃত অথবা পারসী ভাষাতেও অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু যে শিক্ষা ভাষা শিক্ষায় জন্মে না, যে শিক্ষা শাস্ত্রের উপদেশ যুক্তি ও তর্কের নিকট ঋণী নয়, যে শিক্ষা হৃদয়ের বল, মনের প্রতাপ ও আত্মার শক্তি বিকাশ করিয়া দেয়, যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে অন্য সকল শিক্ষা তুচ্ছ ও হীন বোধ হয়, কীর্ত্তিচন্দ্র সেই লোকমঙ্গলসাধিকা, প্রেমভক্তিবিকাশিকা আত্মশুভকারিণী মহীয়সী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। লোকসমাজের শিক্ষাগুণে সামান্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে বেশ মনোমত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন। অর্থের ব্যবসায়ের বিস্তার ও বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেন, কাঠ, তামাক,

চিনি, লাক্ষা, শংখ ও রবিশস্যের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় হইতে লাগিল। সেই সঞ্চিত অর্থে বাটীঘর নির্ম্মাণ, নাখেরাজ খরিদ, পুষ্করিণী খনন ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারের মায়ায় মোহিত হইলেন। মায়ার নিগড় পুত্রকন্যা জন্মিতে আরম্ভ হইল। কীর্ত্তিচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, বিষয়ী, সংসারী ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলেন।

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে একদিন শুভযোগে শুভ-ক্ষণে কীর্ত্তিচন্দ্র সস্ত্রীক গুরুসমীপে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। সেই দিন তাঁহার জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হইল, সেই দিন গুরুময় জগৎ দেখিতে লাগি-লেন। সেই দিন হইতে, গুরু, মন্ত্র ও ইষ্টদেবে তাঁহার অভেদজ্ঞান জন্মিল। সেই দিন হইতে মায়াপাশ ছেদন করিবার অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র পাইলেন, যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন, সেইদিন তাহার বীজ রোপিত হইল। সত্য সত্যই বীজমন্ত্রের সহিত তাঁহার হৃদয়ে গুরুভক্তি, দেবসেবা ও লোকহিতৈষিতার বীজ যথোপযুক্তভাবে রোপিত হইয়া ছিল। বীজমন্ত্রের জপসাধনে ও ইষ্টদেবের আরাধনে যেমন ইষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন, লোকহিতকর বীজ সংরক্ষণে ও সংবর্দ্ধনে তেমনই পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া অভীষ্ট সাধনেও তৎপর হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথগঞ্জের নিকটে বালীঘাটা নামক ক্ষুদ্র স্থানে কীর্ত্তিচন্দ্রের গুরু-দেবের আবাসস্থান ছিল। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলমূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত। কীর্ত্তিচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে নিজ গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী উক্তবিগ্রহ সেবার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। গুরুদেব সময় সময় বৃত্তি-গ্রহণ বা বার্ষিক, মাসিক আদায় উপলক্ষে কীর্ত্তিচন্দ্রের গৃহে পদার্পণ করি-তেন। কীর্ত্তিচন্দ্র গুরুদেবের অভিলাষানুরূপ নিজ শক্তিসামর্থ্যমত অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করিয়া তাঁহার পরিতোষ সাধনে যত্ন করিতেন। গুরুদেব কিন্তু পরিতুষ্ট বা পরিতৃপ্ত হইতেন না। আজ কাল্ যেরূপ গুরু-গিরি প্রচলিত ও গুরুশিষ্যের যেরূপ ব্যবহার ও সদ্ভাব তাহাতে যে ইহাদের মধ্যে অপার্থিব পারমার্থিক কোন সম্বন্ধ আছে এরূপ বোধ হয় না। এক্ষণ-কার গুরুদিগকে দেখিলে ও তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে তন্ত্রের নিম্নোক্ত বচন অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া অনুভূত হয়—

"গুরবো বহবঃ সন্তি
শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
সুদুর্লভো গুরুর্লোকে
শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

শিষ্যের ধনাপহারী গুরু অনেক আছেন কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহারক গুরুই সংসারে সুদুর্লভ।

গুরুর গুরুত্ব বিবেচনা করিলে জগতের সমস্ত পদার্থের লঘুত্ব বুঝিতে পারা যায়। যে গুরুর প্রসাদে ভববন্ধন মুক্ত হয়, যে গুরুর প্রসন্নতায় মন্ত্রবলে ইষ্টদেবের সাক্ষাৎ লাভ সংঘটিত হয়, সেই পরম কারুণিক গুরুদেবের মাহাত্ম্য প্রকৃত ভক্তিমান্ সাধক গুরুভক্তই জানেন। গুরুর গুরুত্ব মাহাত্ম্য মহিমা ও প্রতাপ শিষ্যের গুণেই প্রতিভাত হয়। চলিত কথায় বলে—

"খাদিম গুণে পীর জিন্দা।"

কীর্ত্তিচন্দ্রের গুরুদেব একবার কোন পর্ব্বোপলক্ষে নিজ প্রাপ্য আদায় জন্য তাঁহার ভবনে আগমন করিয়া নিজ বাসনানুরূপ অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র তৎশ্রবণে বলিলেন "প্রভো এ সমস্তই আপনার। এ দাস যে কিছু বিষয়সম্পত্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছে অথবা যে কোন বিষয়ে অধিকারী আছে আপনি ইচ্ছামাত্র তৎসমুদায় অবাধে গ্রহণ ও ভোগাধিকার করিতে পারেন।" গুরুদেব কীর্ত্তিচন্দ্রের উক্ত বাক্য শ্রবণে সামান্য শিষ্যবোধে বলিয়া উঠিলেন "মুখে অমন নীরস গুরুভক্তি ও বাচিক ত্যাগস্বীকার অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্তু কাজের বেলার দানের সময় কেবল প্রণামীর টাকাটী আর বড়জোর এক যোড়া কাপড়।" গুরুদেবের কথা শুনিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র প্রেমপূর্ণ কাতরবচনে ও সজল নয়নে কহিলেন "প্রভো! আমি সত্যই বলিতেছি এ সমস্ত সম্পত্তি আমার এবং অদ্যকার তারিখ হইতে এ সমস্ত আমি আপনাকে অর্পণ করিলাম। আপনি স্নানাহার করিয়া শান্ত হউন ও বিশ্রাম লাভ করুন এবং আমাদিগকে আপনার সেবা পূজা ও পরিচর্য্যাদির অবসর প্রদানে অনুমতি হউক, আমি যথাসাধ্য স্বকার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইব।" এই বলিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র গুরুদেবের শ্রীচরণ প্রক্ষালন করাইয়া তৈলমর্দ্দনের পর তাঁহাকে স্নানার্থ ভাগীরথী নদীতে পাঠাইলেন এবং গুরুদেবের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই নিজ সহধর্ম্মিণী সর্ব্বকর্ম্মসঙ্গিনী ধর্ম্মপত্নীর সহিত

সকল বিষয় স্থির করিয়া অবিলম্বে গুরুদেবের রন্ধনব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন এবং আরও জানাইলেন যে গুরুদেবের সেবার পর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই সমস্ত বিষয় (যথাসর্ব্বস্ব) তাঁহাকে প্রদান করিয়া গৃহ হইতে উভয়েই বহির্গত হইবেন। পতীব্রতা সাধ্বী রমণী স্বামীর অভীষ্ট সাধনেই নিয়ত যত্নশীলা, স্বামীবাক্যের অন্যথাচারণ তাঁহার নিকট মহাপাতক রূপে গণনীয়। কীৰ্ত্তিচন্দ্রের পুণ্যবতী পত্নী অম্লানবদনে সহর্ষ অন্তঃকরণে স্বামীর অসাধারণ প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া আনন্দসহকারে সর্ব্ব-অন্তঃকরণে তাঁহার আদেশ পালনে কৃতসংকল্পা হইলেন।

যথাসময়ে গুরুদেব স্নানাহার সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কীৰ্ত্তিচন্দ্র মহানন্দে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সস্ত্রীক তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং দানপত্রের দ্বারা স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিলেন। নিজে কৌপীনমাত্র পরিহিত হইয়া এবং স্ত্রী ও একবস্ত্রা হইয়া উভয়ে সমস্ত বিষয় দানের পর শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বনে ভিক্ষুক ফকির বেশে প্রতিবেশীদের দ্বারস্থ হইবামাত্র সকলে তাঁহার অসামান্য ত্যাগস্বীকার ও অলৌকিক গুরু-ভক্তি দর্শনে যথাসম্ভব অর্থ বস্ত্র, তৈজসপত্রাদি ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিয়া তাঁহার মহৎকার্য্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ ও তাঁহার সম্মান সংবর্দ্ধন করিতে লাগিল। কীৰ্ত্তিচন্দ্র স্বয়ং কৌপীনধারী কিন্তু নিরভরণা স্ত্রী একখানী শাটী-মাত্র পরিধান করিয়া আছেন। সে শাড়ীখানিও গুরুদেবের প্রাপ্য কেবল লজ্জা রক্ষার্থ স্ত্রীকে তাহা রাখিতে দিয়াছেন, ভিক্ষালব্ধ বস্ত্রে যেমন শাড়ী পাইলেন অমনি স্ত্রীর পরিহিত বস্ত্রখানি লইয়া নিজ বাটীর (এক্ষণে গুরু-দেবের) দ্বারদেশে রাখিয়া দিয়া পুনরায় ভিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাঠকগণ! পুরাণ ইতিহাস উপন্যাসে রাজা হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, দধীচি, শিবিরাজা প্রভৃতির দান ও ত্যাগস্বীকার বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু তুলনার প্রয়োজন নাই। একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন। কীৰ্ত্তিচন্দ্রের মত সর্ব্বস্বত্যাগী গুরুভক্ত সংসারে কয়জন পাওয়া যায়।

মনঃ প্রাণ শরীর দান আমরা অনেক সময়েই মনে মনে করিয়া থাকি, কিন্তু অস্থায়ী বাহ্যসম্পদের প্রতি আমাদের এমনি মোহিনী মায়া যে ইহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে গেলে যেন মর্ম্মান্তিক যাতনা ও কষ্ট অনুভব

হয়। কীর্ত্তিচন্দ্র নিজ হৃদয়ের প্রাশস্ত্যে ও ঔদার্য্যে এমনই মহান্ ছিলেন যে কিসে গুরুদেবের ঐকান্তিক তুষ্টি তৃপ্তি জন্মে তৎসাধনে অবহিত ও চেষ্টিত হইতেন। এবং কার্য্যতঃ সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া সেই অমানুষী গুরু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। গুরুদেবের সন্তোষসাধন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি গুরুদেবকে প্রকৃতই সর্ব্বস্বরূপ জানিতেন। শাস্ত্রে আছে—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবোমহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

অন্যচ্চ

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী
ইন্দ্রাদয়স্তথা দেবা যক্ষাদ্যাঃ পিতৃদেবতাঃ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বাঃ সর্পজাতয়ঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে পর্ব্বতাঃ সান্নভৌতিকাঃ॥
এতে চান্যে চ তিষ্ঠন্তি নিত্যং গুরুকলেবরে।
শ্রীগুরোস্তৃপ্তিমাত্রেণ তৃপ্তিরেষাঞ্চ জায়তে॥"

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর গুরুদেব স্বয়ং পরমব্রহ্ম সেই শ্রীগুরু-দেবকে নমস্কার॥

আবার

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং পরমেশ্বরী পার্ব্বতী, ইন্দ্রাদিদেবগণ, যক্ষাদি দেবযোনি-গণ, পিতৃদেবতাগণ, গঙ্গাদি সমস্ত পুণ্য নদী, সমস্ত গন্ধর্ব্ব এবং সর্পজাতি, এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয় সমস্ত পর্ব্বত এই সমস্ত এবং এ সকল ব্যতীত আর যাহা কিছু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অবস্থিত, সে সমস্তই শ্রীগুরুদেবের কলেবরে নিত্য অধিষ্ঠিত। শ্রীগুরুর তৃপ্তিমাত্রেই ইহা-দিগের সকলের সম্যক্ তৃপ্তিসাধিত হয়॥

শাস্ত্রের এইরূপ যুক্তিযুক্ত উক্তি কীর্ত্তিচন্দ্র হৃদয়ের স্তরে স্তরে বুঝিতেন, এবং কেবল গুরুকে প্রণাম বন্দনা করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। গুরুগতপ্রাণ হইয়াই গুরুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদান করিতে গেলে আরও বৃহৎ হইবে এবং সংক্ষেপে সকল কথা

বলিবারও প্রয়োজন নাই; সুতরাং আমরা বারান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিব এবং গুরুদেবকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাঁহার প্রসাদে ততোধিক তাঁহার আশীর্ব্বাদে কীর্ত্তিচন্দ্র যেরূপে অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্ম্মাণ, নিত্য সেবার সুব্যবস্থা, দীন দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ, অতিথি অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যা এবং নৈমিত্তিক পর্ব্বোৎসবের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া নিজের অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ দেখাইবার যত্ন করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাচরণ রায়।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪৭

(গ্রাম্যগীত।)

কালার বাঁশীয়া মোরে কৈল উদাসিনী।
শ্যামের বাঁশীয়ারে॥ ধ্রু।
খাইতুম্ না দেয়, লইতুম্ না দেয়,
থাকতুম্ না দেয় ঘরে।
নিরবধি ডাকে মোরে বসিয়া কদমতলে॥
একেত কালার বাঁশী তাতে পঞ্চ রেখা।
বাঁশীয়ে কেমনে জানে কলঙ্কিনী রাধা॥
ভাসিতে ভাসিতে বাঁশী ঠেকিল্ বালুর চড়ে।
পবনের বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা করে॥

৪৮

গীত—ধানশী।

হেরে দেখ মরমী, তোমরা নি দেখেছ বন্ধু যাইতে॥ ধ্রু।
কোথা যাই, কি করিমু, কারে মনোদুঃখ কৈমু,
কি দিয়া কি কৈল কালাচান্দে।

বন্ধুর কঠিন হিয়া, বিদেশে রহিল গিয়া,
নিরবধি প্রাণি মোর কান্দে॥
কালিয়ার কোপ ছেল, মরমে হানিয়া গেল,
কি দিয়া কি কৈল কালাকানু।
ভাবিয়া ভাবিয়া চাম(১), বিষ লাগে গৃহকাম,
কাড়াকাড়া হৈল রাধার তনু॥
বন্ধুয়া আসিবে করি, কেহ ত না চাহে ফিরি,
কাহারো মুখেতে নাহি শুনি।
হেরিতে পন্থের ভিত, গেল আঁখি নীর তিত(২),
আগুনিত বাড়িল দ্বিগুণি॥

(অবশিষ্ট নাই।)

৪৯

(গ্রাম্যগীত।)

শূন্য কৈল আমার বৃন্দাবন।
আর আইব নি আমার রস্যা রে পরাণ বন॥ ধ্রু। (৩)
আজুয়া নিশি, শ্যাম বন্ধে না পাইল তিথি,
রস্যা বন্ধুরে মোর পাইল কুমতি,
সারারাত্রি বসিয়া রৈলাম, শ্যাম না আইল কি কারণ॥
কালুয়া নিশি, বন্ধুরে মোর পাইল কুমতি,
সারা রাত্রি বৈয়া রৈলাম কান্দিতে নিশি;
যাইবার কালে প্রাণনাথ! দিয়া যাইও মোরে দরশন॥
আমার বাসি হৈল এ যৌবন।
আর নি আসিবে আমার রসিক পরাণ-বন॥
একলা মন্দিরের মাঝে, ও মুই কারে লই করিম্ শয়ন।
আর নি আসিবে আমার রসিক পরাণ-বন॥

(১) চাম = চাই।
(২) নয়ন অশ্রু সিক্ত হইল।
(৩) আইব নি = আসিবে কি? রস্যা = রসিয়া, রসিক।
পরাণবন = প্রাণবন্ধু।

মিনতি হাসিমের বাণী, শুনরে রসের কামিনী!
নারীর যৌবন জানো যেন জোয়ারের পানি॥

৫০

গীত—রামকেলী।

চল বন্ধুর রূপ দেখি গিয়া।
দেখিয়া বন্ধুর রূপ না ধরয় হিয়া॥ ধ্রু।
মালতীর মাল্য গলে রে শোভিয়াছে ভালা
মুখখানি পূর্ণিমা শশী বরণ চিকণ কালা॥
তরুয়া কদম্বতলে পত্র সারি সারি।
কুক্ষণে হইল দেখা পাসরিতে নারি॥
ডালে ডালে পুষ্প আর ফুটিয়াছে কলি।
ছন্দবন্ধ বৃন্দাবনে নাগর বনমালী॥
জলের উপরে বসি ঝলকে চমকে।
দেখিলাম সুন্দর রূপ বিজুলী চমকে

(অসম্পূর্ণ।)

৫১

(হকিয়ত।)

হেলায় হেলায় দিন যায় রে ভবের মাঝে রে!
আমার হেলায় হেলায় দিন যায়!! ধ্রু।
হেলায় দিন গোঁয়াইলুম, মুরসিদ না চিনিলুম,
পরকালে হৈব কোন গতি। ভবের মাঝেরে;
আমার হেলায় হেলায় দিন যায়॥
শিখরী গাছেতে, ওড়ফুল ফুটিয়াছে রে,
নুরে ধরে আলোক ছাতি।
নবির শোভাগণ, যত উন্মতগণ,
চান্দের শোভা যেমন তারা।
এসব দুনিয়ার বন্দা, সকল মরিয়া যাবে,
আজরাইল হইবে খাড়া॥

কেবা খানা খায়, কেবা নিদ্রা যায়,
চৈতন্য করিল কে ?
যখনে আছিলুম্, কুলুপের ভিতরে,
কুঞ্চি খুলিয়া দিল কে রে !!
আল্লায় জিজ্ঞাস্ করে, ও দোস্ত্ মহম্মদ !
দুনিয়া সৃজিলা কি ?
দিন হাজারবার, বন্দা গুণাগার,
পাপী বন্দার উপায় কি রে !!
মাটীর আসন, মাটীর বসন,
পুড়িলে হৈ যাইবে ছাই।
শকুনে শৃগালে, বেড়িয়া খাইবে,
এতনের ভরসা নাই রে ॥
ভবের মাঝে রে।
আমার হেলায় হেলায় দিন যায় ॥*

৫২

গীত—বেলাবলী।

একি অপরূপ হে বনেতে ব্রজরায়।
বাজায় মোহনবাঁশী সুললিত রায় ॥
খসিল মোহন চূড়া উড়ে মন্দ বায়।
বান্ধিতে ছান্ধিতে চূড়া ধবলী চলি যায় ॥

* পাঠকগণের সুবিধার জন্য আরব্য ও পারস্য শব্দের অর্থ দেওয়া গেল—
মুরসিদ = গুরু ; নূরে = জ্যোতিঃ। দোস্ত্ = বন্ধু।
নবি = হজরত মহম্মদ (দং)। উম্মত = মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী।
বন্দা = লোক। আজরাইল = যমদূত। গুণাগার = পাপী।
তন = তনু, জড়দেহ। কুঞ্চি = কুঞ্চিকা, চাবি।
এই গীতে দুই দুই পদের পর " ভবের মাঝেরে ; আমার হেলায় হেলায় দিন যায় " এই ধুয়াটী আবৃত্তি করিতে হইবে।

রহ রহ ধবলী শামলী বলি ধায়।
নীলগিরি পাছে করি চান্দ চলি যায়
শ্যামল সুন্দর তনু ধূলায় ধূসর।
আড়ে আবরিল চান্দ নবজলধর॥
ঘামে তিতিল তনু মন্দ মন্দ ঝরে।
মরকত মাণিক্য জিনি মুকুতা উদগারে

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)

৫৩

গীত—ধানশী।

বন্ধের বাঁশীটিরে নিষেধ কর গিয়া।
সহজে ত্যজিমু বাঁশী জাতি কুল দিয়া॥ ধু।

কুলবধূ নারী হৈয়া, না জানি ঠেকিনু গিয়া,
আসিতে নী জানি বাঁশী এত বিনোদিয়া॥

আমিত সরলা নারী রহি গৃহবাস।
না জানি শ্যামের বাঁশী কারে করে আশ॥

খাইতে নারি শুইতে নারি রৈতে নারি ঘরে।
নিরবধি ডাকে বাঁশী রাধার নাম ধ'রে॥

—বল্লভে কহে শুন ধর্ম্মকথা।(১)
মোরে ভজি রৈলা বাঁশী সাধপুরে যথা॥

৫৪

গীত—কামোদ।

আরদিন আসিতে বন্ধু নেপুর না দিও পায়।
শুক্ল বস্ত্রখানি না পরিও, না দিও চন্দনের ফোটা;
আঁধার ঘরখানি প্রকাশ হৈবে কপালে তিলকের ফোটা

(১) বল্লভ=“মোটক” বা “যোটক” বল্লভ নাম হিন্দুর মধ্যে আছে কি? হস্তলিখিত পুস্তকে ঐ রকমই একটা ভণিতা আছে দেখা যায়।

যখনে শ্যামরায়, আমার ঘরেতে যায়,
তখনে ননদিনী জানে।
অবলার প্রাণি, কতকাল বুঝাইব,
খোঁটা দিবে রাত্রদিনে॥
যখনে শ্যামরায়, মুরলী বাজায়,
তখনে আমি নারী রান্ধি।
কাঁচা খাড়িগাছি অনলেতে দিয়া,
ধূমের ছলে বসিয়া কান্দি॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্ত)

৫৫

(বিরাগ—সঙ্গীত।)

ও পামর মন! তোরে বলি বারে বার।
মিছা প্রেমানলে দহি হইবি অঙ্গার॥
সেই জ্বালা পরিহর,
ধর মোর বাক্য সার,
কলঙ্ক না কর,
নিষেধ মানহ আমার॥
আগে পাছে না গুণিলে;
মায়াজালে বন্দী হৈলে;
এইবার বুঝি মরণ তোমার॥

শ্রীআছনজ্জমাঁ চৌধুরী।

ক্রমশঃ

কর্ম্ম ফল মাত্র। অনন্তর যখন তাহারা শোকে দুঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে তখনি কোন আশু ফলপ্রদ পদার্থের অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; অনিত্যতাদি দেখিয়া, ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগে বৈরাগ্য জন্মিলে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মাত্মার একত্ব অবগত হইবার জন্য ব্যস্ত হয় ও ক্রমে আপনাকে জানিবার জন্য ইচ্ছা করে।

এইরূপে হৃদয় সন্তাপানলে দগ্ধ হইলে তাহার কর্ম্মফলের প্রায়শ্চিত্ত হইল, ক্রমে তাহাতে বৈরাগ্য আসিয়া দেখা দিল, অনন্তর যেরূপ সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি বিনষ্ট হইয়া জগতকে প্রতিভাত করে, সেই রূপ অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হইয়া পূর্ণ জ্ঞানালোকে তাহার হৃদয়কে প্রতিভাত করে। অতএব আমাদের এই অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রকৃত জ্ঞানের আবশ্যক হয় যেহেতু,

"জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যামিতি"

এক্ষণে বৎস! স্মরণ রাখিও যে

"ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাংহৃদ্দেশে—তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি মন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥"

অতএব

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্"

সংসারের সকল সত্ত্বা ভুলিয়া তাহাতে সর্ব্বতোভাবে হৃদয় সর্ব্বস্য সমর্পণ কর হৃদয়ে শান্তি পাবে। এই বলিয়া তিনি বজ্র গম্ভীর স্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন

নমস্তে দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম্॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রপিতামহশ্চ প্রজাপতিস্ত্বং।
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং
জগদীশ রক্ষয় মাং॥

স্তোত্র সমাপ্ত করিয়া পুনরায় বলিলেন "বৎস রাত্রি অধিক হইয়াছে গৃহে যাও। সময়ান্তরে দেখা হবে। আমার বাক্য স্মরণ রাখিও পুনরায় বলিতেছি যে

যাঁহাকে চিন্তা করিলে সংসারের সকল চিন্তা দূর হয়—যাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতি হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে মন প্রফুল্লিত হয়—যাঁহাকে জানিতে পারিলে সংসারের সকল বন্ধন মোচন হয়, সেই অপার করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু হরিকে স্মরণ কর হৃদয়ে শান্তি পাবে।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়া গেলেন আমি বাহ্য জ্ঞান হারা হইয়া বসিয়া রহিলাম। কি যেন এক অমৃতময় প্রেমপীযূষে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। তখন যেন আমার বোধ হইতেছে আমার চতুর্দ্দিকে সেই এক মধুময় ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিয়া যেন তরঙ্গিণীকে বলিতেছে, তরঙ্গিণী কল কণ্ঠে নিনাদিত করিতেছে সেই এক স্বর——

"নমস্তে দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ।"

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

পুরাণ প্রেম।

১

নূতন বরষ আজ
পুরাতন গেছে চলি,
আবার এ নববর্ষ
অতীতে পড়িবে ঢলি,

২

যাক্ চলি' পুরাতন
তার তরে কিবা ব্যথা,
পুরাতন তরে বল
কে করে মমতা কোথা?

৩

পুরাতন গেলে হয়
নূতনের আগমন,
নূতনে পাইলে আর
কেবা স্মরে পুরাতন?

৪

ত্যজি পুরাতন বাস
সবাই আনন্দ মনে,
নূতন বসন পরে
পুরাণে কি স্মরে মনে ?

৫

পুরাণ কুসুম লতা
শুকাইয়া গেলে পর,
দেখা দেয় নব লতা
ধরি বেশ মনোহর।

তখন স্মরণ করে
কেইবা অতীত কথা ?
অভাবে অতীত ঊষা
কে পায় পরাণে ব্যথা ?

৭

জগতেরি রীতি এই
নূতন পাইলে হায়,
ভুলে পুরাতনে কেহ
স্মরিতে নাহিক চায়।

৮

কেবল পুরাণ প্রেম
না ত্যজে হৃদয়তল।
কেবল ভুলিতে তারে
পারেনা প্রেমিকদল।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

কায নাই।

১

কোলে টেনে লও আর থাকিতে না চাই,
সংসারের জ্বালানলে,
হৃদয় যেতেছে জ্বলে,
কত যাতনায় প্রাণ পুড়ে হয় ছাই।
কোলে টেনে লও নাথ আর কায নাই।

২

কোলে টেনে লও নাথ আর কায নাই,
সংসারের সুখ ছাই,
আর আমি নাহি চাই,
হৃদয়ে আগুন জ্বলে কাঁদিয়া বেড়াই,
কোলে টেনে লও নাথ আর কায নাই।

৩

কোলে টেনে লও বিভো লওগো আমায়,
পঞ্চ পুত্র শোকে হায়,
মা বাপ পাগল প্রায়,
দেখিতে পারি না তাহা প্রাণ জ্বলে যায়।
কোলে টেনে লও বিভো লওগো আমায়।

৪

লও নাথ দয়া করি' কোলে টেনে লও।
সংসারের কঠোরতা,
বুকে বড় দেয় ব্যথা,
এ পোড়া দেশেতে নাই নিঃস্বার্থ কোথাও।
লও নাথ দয়া করি' কোলে টেনে লও।

৫

লও নাথ দয়া করি' কোলে টেনে লও,
হেথা ভরা হিংসাদ্বেষ,
নাহি বিন্দু সুখলেশ,
কেন আর রাখি' মোরে পরাণ পোড়াও ?
লও নাথ দয়া করি' কোলে টেনে লও।

৬

দাও নাথ দাও ঠাঁই ও চরণতলে,
নতুবা গো বাপ মা'র
নিভাও শোকের ভার,—
ভগ্নহিয়া মাঝে তব প্রেমামৃত ঢেলে।
দাও নাথ দাও ঠাঁই ও চরণতলে।

৭

দাও নাথ দাও ঠাঁই ও চরণতলে,
নতুবা গো হিংসাদ্বেষ
দূর কর পরমেশ,
সবারে ডুবায়ে দাও প্রেমসিন্ধুজলে।
দাও নাথ দাও ঠাঁই ও চরণতলে।

৮

দাও মোরে দাও ঠাঁই তোমার ও পায়।
নতুবা প্রাণের হরি
নিভাও গো দয়া করি
যে আগুনে সদা মোর বুক জ্বলি' যায়।
দাও নাথ দাও ঠাঁই তোমার ও পায়।

৯

না না না কিছুই আমি চাহি নাক আর
মোহ ঘোরে আর হায়,
প্রাণ না ডুবিতে চায়,
তাই কর ইচ্ছাময় যা ইচ্ছা তোমার।
নাহি এ জগতে আর প্রার্থনা আমার।

শুধু চাই দাও ঠাঁই তোমার ও পায়।
জগতের কিছু হায়,
এ প্রাণ নাহিক চায়,
ভুগেছি অনেক ভোগ এ পোড়া ধরায়।
দাও মোরে দাও ঠাঁই তোমার ও পায়।

১১

তোমার চরণ পেতে সদা প্রাণ চায়।
আমার কামনা এই,
তা ছাড়া কিছুই নেই,
সংসারের যত বাধা দলি যেন পায়।
দাও নাথ দয়া করি ঠাঁই ওই পায়।

১২

কোলে টেনে লও নাথ আর কায নাই,
ত্যজি দেশ ত্যজি ঘর,
এসেছি বিদেশে "পর,"
আকুল পরাণে আজ দেশে যেতে চাই।
কোলে টেনে লও নাথ আর কায নাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

বিয়োগবেদনা।

শ্মশান।

সহর হুগলীর সমীপবর্ত্তী ভাগীরথী তটে কালীতলার ঘাটে যে পবিত্র শ্মশান আছে, উহা আমার বড়ই পরিচিত। আমি প্রতিদিন হৃদয়ে কত ভাব লইয়া ঐ স্থানে বিচরণ করিয়াছি। লোকে শবদাহ দেখিলে শঙ্কিতমনে সরিয়া যায় কিন্তু আমি আগ্রহ সহকারে প্রজ্জ্বলিত চিতানলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে কত শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যাহা গ্রন্থে পাই

নাই তাহা তথায় পাইয়া হৃদয়ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি। এই স্থানে দাঁড়াইয়া যুধিষ্ঠিরের সেই মহতী কথার আবৃত্তি করিয়াছিঃ—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

আবৃত্তি করিতে করিতে দেখিয়াছি কত অগণিত জনস্রোত চলিয়া যাইতেছে কেমন উল্লাসভরে আশ্বস্ত হৃদয়ে সকলে চলিতেছে, কেহই একবার স্তম্ভিত হৃদয়ে ঐ চিতানলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না। কেহ কেহ আবার শবদাহ করিতে আসিয়া কত কৌতুক ও আমোদ করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত সকল গান করিতেছে। এই দৃশ্য সকল দেখিয়া বুঝিয়াছি যুধিষ্ঠিরের ঐ কথায় কি সুমহান সুগভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। আবার কোন কোন দিন একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্যবাণী হৃদয়ে তুমুল উচ্ছ্বাস তুলিয়াছেঃ—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ
কস্য ত্বংবা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

প্রতিদিন এইরূপ শ্মশান চিন্তায় যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে মনে করিয়াছিলাম এবার হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছে,নশ্বর জগতের শোক তাপ আমাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না—আমি নির্ব্বিকার চিত্তে নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের কর্ত্তব্য সকল সাধন করিয়া যাইতে পারিব, আমি মোহভূমি অতিক্রম করত উন্নত ভূমিতে অধিরোহণ করিয়াছি, আমার আবার ভাবনা কি?

আজ বঙ্গাব্দ ১৩০৩-সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সময়ে আমার সে তত্ত্বজ্ঞান কোথায় গেল—এত দিনের সে শিক্ষা নিমেষমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল? আজ কেন সে বড় সাধের শ্মশানের দিকে আর তাকাইতে পারিতেছি না? আমার আত্মীয় স্বজন সকলে আজ সন্ধ্যার সময়ে মিলিত হইয়া কেন চিতানল জ্বালিয়া দিল? অশ্রুসিক্ত নয়নে আজ কাহাকে তাহারা ঐ চিতানলে তুলিয়া দিল? দেখিতে দেখিতে কাহার অঙ্গ ব্যাপিয়া ঐ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল? আমার জ্যেষ্ঠ কুমার কাহার মুখে ঐ অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিয়া

উঠিল। আমার স্নেহশীল ভ্রাতুষ্পুত্রগণ কেন এত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছে? আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেন এত আর্ত্তনাদ করিতেছে? আজ এ হাহাকার রোদনধ্বনিতে আমি ডুবিয়া যাইতেছি কেন?

আজ আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার হৃদয়প্রতিমা পত্নী ঐ চিতানলে জ্বলিতেছে। এত দিন যাহাকে বুকে ধারণ করিয়া কত শান্তি কত তৃপ্তি পাইয়াছি—আজ তাহাকে অনলে অহুতি দিয়া শূন্য হৃদয় লইয়া হাহাকার করিতেছি। আমার যাহা কিছু সার, যাহা কিছু উপাদেয় ছিল তাহাই আহুতি দিয়াছি। সরলতার মধুরতা যে মুখমণ্ডলে পরিলিপ্ত ছিল, কোমলতার উৎস যে নয়ন যুগলে প্রতিনিয়ত উৎসারিত হইত, আনন্দের আভা যথায় চিরবিরাজিত ছিল তাহাই আহুতি দিয়াছি। স্নেহ মমতা যে হৃদয়ে অবিরত তরঙ্গ খেলিত, তাহাই আহুতি দিয়াছি। যে কুসুমের সৌরভে আমি চির সৌরভান্বিত ছিলাম, যাহার মধুর দৃশ্যে সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া চিরানন্দে মগ্ন হইতাম, অম্লানবদনে সকল ক্লেশ সহ্য করিতাম, আজ তাহাই আহুতি দিয়াছি। আজ আমার হৃদয় হইতে কোমল লতিকা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আমি শোভাহীন তরুর ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছি।

ঐ না শ্মশান জ্বলিতেছে। জ্বলিতে থাক, আমি আর ও দিকে তাকাইব না, তাকাইতে পারিব না। আমাকে লইয়া তোমার আর প্রয়োজন কি? আমি হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া আহুতি দিয়াছি, আর যে আমার কিছুই দিবার নাই। তুমি পরিতৃপ্ত হইয়া জ্বলিতে থাক—নিবিবার প্রয়োজন নাই। যখন নিবিবার সময় আসিবে, আমাকে লইয়া যাহাতে পুনরায় জ্বলিতে পার তাহাই করিবে, কিন্তু আমার এই মিনতি আমাকে ফেলিয়া হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইও না।

মনের মত বস্তু পাইয়া অনলের কতই আনন্দ তাই চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি যতই হাহাকার করিতেছি ততই আগুন আরও দ্বিগুণতর জ্বলিতেছে। এরূপ তেজে কখনও চিতানল জ্বলিতে দেখি নাই।

এ কি দৃশ্য! ঐ চিতানল নির্ব্বাপিত করিয়া আমার প্রাণপ্রতিমা তপ্ত কাঞ্চনবৎ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিতা হইয়া দিব্য পুষ্পরথে আরোহণ

করিয়া হাসিতে হাসিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন—দেখিতে দেখিতে দূরে নক্ষত্রা-লোকে বিলীন হইয়া গেলেন।

দাঁড়াও মোহনমাধুরি! একবার প্রাণ ভরিয়া তোমাকে জন্মের মত দেখিয়া লই। তোমার যে মধুর ছবিতে আমি মুগ্ধ ছিলাম, তাহা অপেক্ষা শতগুণে উজ্জ্বল এ মূর্ত্তি কোথায় পাইলে? তোমার ভিতর যে এত মধুরতা ছিল তাহাত জানিতাম না। একবার অবতীর্ণা হইয়া আইস, আমি হৃদয় মন্দিরে তোমার এই নবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতি-নিয়ত তাহারই ধ্যানে মগ্ন হই।

সংসারে যাহাকে আত্মীয় স্বজন বলে, যাহারা থাকিলে লোকে স্ত্রীলোকদিগকে সৌভাগ্যবতী বলে তোমার সে সবই আছে, সকলেই তোমার জন্য হাহাকার করিতেছে, কিন্তু এ সকল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে তোমার মুখে কাতরতার চিহ্ন মাত্র নাই কেন? তুমি সজ্ঞানে হাসিতে হাসিতে হরিনাম করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছ, ইহার গূঢ় মর্ম্ম কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অন্য সময়ে আমার একটু ক্লেশ দেখিলে তোমার বুক ফাটিয়া যাইত, তুমি যার পর নাই ব্যাকুল হইতে, কত আগ্রহ সহকারে সে ক্লেশ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে, কিন্তু আজ আমার এ বিষম শোকের সময়ে তোমার মুখ খানি এত প্রফুল্ল কেন?

বুঝিয়াছি। এ জীবনের যবনিকার অন্তরালে যে চিরশান্তি নিকেতন আছে তাহা দেখিতে পাইয়াছ, তাই আজ তোমার এত আনন্দ। সেই নিকেতনের বিধাতা তোমাকে ডাকিতেছেন, তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিবে কেন? ঐ প্রসারিত করে তিনি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া-ছেন, তুমি এ জগতের স্বপ্নের কথা ভাবিবে কেন? এ ভব তিমিরের অপর পারে দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছ, এ আর্ত্তনাদ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিবে কেন? আজ নিশ্চিন্তপুরের অধিবাসিনী হইয়া পরম শান্তি উপভোগ করিতেছ, তোমার মনকে আর কে বিচলিত করিবে? প্রেমময়ি! আজ তুমি প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছ, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের তুচ্ছ প্রণয় কি আর তোমাকে ফিরাইতে পারে? তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না—হায় আমার উপায় কি হইবে?

জীবনের প্রত্যূষে এক দিন উভয়ে মহোল্লাসে যাত্রা করিয়াছিলাম। কত দেশ দেশান্তর দেখিলাম। কত বন উপবনে উভয়ে আনন্দে বিহার করিলাম, কত প্রেমনদীতে অবগাহন করিয়া জীবনের সন্তাপ ভুলিলাম। ক্রমে আসিয়া বৈতরিণী নদীতীরে উপনীত হইলাম—কোথা হইতে এক তরঙ্গ আসিয়া তোমাকে অপর তীরে ভাসাইয়া লইয়া গেল—আর আমি শূন্য হৃদয়ে আকুলিত চিত্তে বসিয়া রোদন করিতেছি। আমার এ অশ্রুতে বৈতরিণীর সলিলরাশি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, আমার এ নিশ্বাসবায়ুতে প্রবল তরঙ্গ উঠিতেছে, হৃদয়ের মোহে নদীবক্ষে ছায়াপাত হইয়া তোমার মূর্ত্তি নয়নের অন্তরাল হইতেছে, তাই শোকের সীমা পরিসীমা থাকিতেছে না।

এ নদীতীরে বসিয়া কতদিন আর রোদন করিব? যে তরঙ্গ তোমাকে লইয়া গিয়াছে তাহা কি আর ফিরিয়া আসিবে না? যে পথে তুমি গিয়াছ সে পথ কি আমার ভাগ্যে উন্মুক্ত হইবে না? বিরহ যে আর সহ্য হয় না। এমন করিয়াও কি কাঁদাইতে আছে? এই কি প্রণয়ের পরিণাম? যাহার বক্ষে এতদিন শোভা পাইতেছিলে, তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে কি একটু মমতা হইল না? পরকালের সুখশান্তির অধিকারিণী হইয়াছ বলিয়া কি এতদিনের প্রাণসখাকে ভুলিতে আছে? তোমার এ অবিচার আমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল চিরদিনের তরে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে, যদি কখনও দেখা হয় তবে একবার তোমাকে দেখাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইব নতুবা এ ক্ষোভ এ দুঃখ কিছুতেই যাইবে না।

ঐ চিতানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে, সকলে বিষণ্ণবদনে হরিনাম করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতেছে। হায় সকলই ফুরাইয়া গেল। কোন প্রাণে পূর্ব্বের ন্যায় এ শ্মশান ক্ষেত্রে বিচরণ করিব? এ যে কি ভয়াবহ স্থান তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, তাই নির্ব্বোধের ন্যায় এখানে ভ্রমণ করিয়াছি। আজ উহা মনে ভাবিলেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে।

তবে এ চিরপরিচিত স্থান একেবারে ভুলিতে পারিব না। কালে বিধাতার নিয়মে যখন শোকের প্রবাহ কমিয়া আসিবে, তখন রজনীর অন্ধকারে লুকাইয়া আসিয়া এই স্থানে বসিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিব। এক দিন গঙ্গার পবিত্র বারিতে যে চিতানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল সেই স্থানে এ নয়নের অশ্রু বিসর্জ্জন করিব এবং একান্তমনে ভগবানের নিকট এই

প্রার্থনা করিব যেন অন্তিম কালে এই বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া শয়ন করিতে পারি। কাশীর মণিকর্ণিকা অপেক্ষাও এই স্থান আমার অধিকতর প্রার্থনীয়।

হাসিকান্না।

বাল্যে বেশী হাসিলে অনেকে নিবারণ করিয়া বলিত—যত হাসি তত কান্না। তখন সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কে জানিত ঐ কথার মধ্যে এত সত্য নিহিত আছে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্ত্তনশীল জগতে দেখিলাম—একদিকে রোদ অপরদিকে বৃষ্টি, একদিকে আলো অপরদিকে ছায়া, একদিকে পূর্ণশশী বিরাজিত, অপরদিকে করাল রাহু তাহাকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত। উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিয়াছি—একদিকে কত ফুল ফুটিতেছে, অন্যদিকে কত ফুল শুকাইতেছে। তখন সে দৃশ্য দেখিয়া গম্ভীরভাবে কত ভাবিতাম, কে জানিত যে সে দৃশ্যে আজ আকুল প্রাণে কাঁদিতে হইবে?

জীবনের একদিন বসন্ত ছিল, সে বাসন্তিক শোভা বহির্জগতে সমাকীর্ণ দেখিয়াছি। পৃথিবী যেন স্থধাময় বলিয়া বোধ হইত। পূর্ণিমা রজনীতে সৌধোপরি দাঁড়াইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছি, সকলকেই কেমন হাসিতে দেখিয়াছি। গঙ্গার তরঙ্গে সে হাসি মিশিয়া যে সুধা বহিয়াছে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। অমানিশায়ও আকাশপটে অগণিত তারকাকে হাসিতে দেখিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। আমি প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া কতই হাসিয়াছি কতই তৃপ্তি পাইয়াছি। তখন মনে করিতাম এ জগতে হাসিতে আসিয়াছি, হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইব। কে জানিত যে জীবনে এত কাঁদিতে হইবে। হাসি ও কান্না যে জগতের নিয়ম তাহাত কখনও বুঝিতে পারি নাই। প্রেমপ্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া আজ আর বুঝিতে কিছুই বাকি নাই।

বঙ্গাব্দ ১২৮৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার আমার জীবনের এক প্রধান দিন। উহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে জীবনে এক তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহাতেই দিবারাত্রি ভাসিতেছিলাম। তখন মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল বিবাহ করিব কি না, আর যদি করি তবে কিরূপ পত্নী মনোনীত করিব? আগে ভাবিতাম বিবাহ করিব না নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যার অনুশীলন করিয়া স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন ক্ষেপণ করিব। আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে সে সঙ্কল্প

বিদূরিত হইল। বিবাহ করিতে হইবে তবে কিরূপ পত্নী হইলে সুখী হইতে পারিব তাহাই বিবেচনার বিষয় হইল।

সমাজের নিয়ম জানি, তাই মনোনীত পত্নীলাভ ভাগ্যাধীন মনে করিয়া নিজের বলবুদ্ধি ভুলিয়া বিধাতার চরণে শরণ লইলাম। কত কাঁদিলাম, কত প্রার্থনা করিলাম যেন বিবাহ করিয়া শেষে কাঁদিতে না হয়। বিধাতা সে প্রার্থনা শুনিয়া আমাকে অতুল সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন।

যে যেরূপ অবস্থার লোক তাহার কল্পনা ও আশা তদনুরূপ হইয়া থাকে। অতুল রূপরাশি আসিয়া আমার গৃহ সমুজ্জ্বল করিবেন, বিদ্যা বুদ্ধিতে সকলকে মুগ্ধ করিবেন সে কল্পনা কখনও মনে স্থান পায় নাই। দরিদ্রের কুটীরে তাহা শোভা পাইবে কেন? সরোবরে যে কমল ফুটিয়া থাকে তাহা ক্ষুদ্র জলাশয়ে ভাসিবে কেন? আমার কল্পনা ছিল—একটী গৃহস্থের কন্যা আসিয়া আমার গৃহকার্য্যে প্রাণপণে মন দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবে, আমাকে পাইয়া অমূল্যনিধি জ্ঞানে আত্মহারা হইয়া যাইবে, আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে প্রীতভাবে দেখিবে ও তাহাদের স্নেহপাত্রী হইয়া সংসারকে অমৃতময় করিয়া তুলিবে।

এইরূপ কল্পনা যাহার মনোরম উদ্যানের দিকে তাহার লক্ষ্য পড়িবে কেন? সযত্নে পালিত কত কুসুম ফুটিয়া আছে, তাহা আমার হস্তে শোভা পাইবে কেন? আমি সে সব শোভায় আকৃষ্ট না হইয়া বীরভূমির একটী পল্লী হইতে আমার মনোমত একটী বনফুল তুলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম। বিধাতার কৃপায় সে ফুল ফুটিয়া যে এত শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি নিজেকে যার পর নাই সৌভাগ্যবান মনে করিয়া পরিতৃপ্তচিত্তে সংসারসুখে লিপ্ত ছিলাম। জগৎকে আনন্দময় বলিয়া বোধ হইত। সেই যে ২৭ জ্যৈষ্ঠের শুভ রজনীতে অপূর্ব্ব মিলনের কি এক চিত্তহারী স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম এই ষোল বৎসরকাল আমি সেই সুখস্বপ্নে নিমগ্ন ছিলাম। মনের বল ভরসা কিছুতেই ফুরাইত না। রোগতাপ যন্ত্রণা দুঃখ কিছুই এ প্রাণকে কাতর করিতে পারিতনা। দুঃখ আসলে সেই মুখখানি একবার দেখিয়া সব ভুলিয়া যাইতাম। স্নেহাদরে আমি মুগ্ধ হইতাম; কেমন সুখের অপূর্ব্ব হিল্লোলে এ জীবন ভাসিতেছিল। কে জানিত যে হঠাৎ আমাকে অতল জলে ডুবিতে হইবে।

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে দেখিলাম এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে একটী কমল ফুটিয়া রহিয়াছে, প্রমত্ত মধুকর উল্লাসে মধুপান করিতেছে, হঠাৎ মেঘ ছুটিল, বায়ু বহিল, তরঙ্গ উঠিল, সোণার কমল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া জলমগ্ন হইল, মধুকরও মৃতপ্রায় হইয়া ভাসিতে ভাসিতে দৈবাৎ তটে আসিয়া রক্ষা পাইল। সে দৃশ্য দেখিয়া একদিন হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু হায় কে জানিত যে আমারও দশা ঐরূপ ঘটিবে।

আমার বাসগৃহের নিকট একটী ক্ষুদ্র বন ছিল সেই বন আকুল করিয়া একটী পাখী প্রতি রজনী কতই ব্যাকুল ভাবে কাঁদিত, মনে করিতাম কবিদের প্রিয় চক্রবাক ঐ কাঁদিতেছে। একদিন সে কথা পত্নীকে জানাইলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন "চক্রবাক কি অত কাঁদিতে জানে? নিশ্চয়ই চক্রবাকী কাঁদিতেছে।" সে কথার উত্তর তখন দি নাই শুদ্ধ একবার সস্নেহে চুম্বন করিয়াছিলাম—আজ সে কথার বেশ উত্তর দিতে পারি কিন্তু হায় কাহাকে বলিব, কে আর সে কথা শুনিবে?

অতীতের স্মৃতি আজ হৃদয়ে কতই আগুন জ্বালিয়া দিতেছে—একে একে কত কথাই মনে পড়িতেছে। একদিন গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে দুইজনে ছাদের উপর শুইয়াছিলাম, একটী তারাকে তীরবৎ ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলে "আমিও একদিন ঐ তারার ন্যায় কোথায় ছুটিয়া যাইব, তুমি কি আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিবে?" "পারিব" বলিয়া আমি তোমাকে সযত্নে সুদৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধরিয়াছিলাম কিন্তু ধরিয়া রাখিবার আমার যে শক্তি নাই তাহা এখন বেশ বুঝিয়া হতাশহৃদয়ে ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতেছি। জীবনের তারা! তুমি কোথায় গেলে, একবার বলিয়া দেও, আমি তোমার সহিত সম্মিলিত হই।

প্রাণের প্রতিমা! একদিন স্বার্থপরতা সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল, উহা যে গুরুতর পাপ তাহাই বলিতেছিলাম, তুমি প্রীতা হইয়া আমার চরণের ধূলি মস্তকে লইয়াছিলে। আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলাম, তোমাকে যেন বিধবার ক্লেশ পাইতে না হয়। তুমি হাসিয়া বলিয়াছিলে "তবেত তুমি স্বার্থপর।" আমি আগ্রহ সহকারে বলিয়াছিলাম "না আমি স্বার্থপর নহি, আমি তোমার বিরহে দুঃখ ক্লেশ পাই সেও ভাল, তথাপি যেন আমাকে হারাইয়া তোমাকে কাঁদিতে না হয়।" তুমি প্রফুল্ল মুখে বলিয়াছিলে

"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, এ বিষয়ে আমি যেন স্বার্থপর হই।" হায়! আমার আশীর্ব্বাদ যে এত শীঘ্র ফলিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, নিঃস্বার্থ হইতে যাইয়া এখন যে মারা যাই। এত কষ্ট জানিলে কখনও সেরূপ আশীর্ব্বাদ করিতাম না।

সধবা মরিবার তোমার বড়ই সাধ ছিল। কোন গণক আসিলে ব্যস্ত হইয়া আগে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে। সকলেই একবাক্যে তোমার মনের মত কথা বলিত, তাহাতে কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে। ললাটে বেশী করিয়া সিন্দূর পরিতে, তাহাতে "পাড়াগেঁয়ে" বলিয়া কেহ কেহ ঠাট্টা করিত তুমি হাসিয়া বলিতে "ইহারই জোরে আমি পা'ড় দিয়ে এগুয়ে যাইব।" আহা! সিন্দূরে তোমার মুখের কি উজ্জ্বল শোভাই হইত! যখন সে দৃশ্য দেখিতাম তখনি জানি যে একদিন আমার কপাল ভাঙ্গিবে।

এত যে অশ্রু ঢালিতেছি তথাপি কি অতীত স্মৃতির অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না? এ রাবণের চিতানল কি চির দিন জ্বলিতে থাকিবে? এত যে বর্ষণ হইতেছে, বায়ু বহিতেছে তথাপি মেঘ অপসারিত হয়না কেন? জীবনের এ অন্ধকারের কি নিবৃত্তি হইবে না? আকাশের তারা কি আর হাসিবে না? হাসির দিন কি আর আসিবে না—এই যে কান্নার দিন আসিয়াছে ইহায় কি অবসান হইবে না? এ মহা প্রলয়ে কি আমাকে চির দিন মগ্ন থাকিতে হইবে? নিরাশ জগতে আজ কোন কথারই উত্তর পাই না তাই প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষকেও যে এত ভাসিতে হয় তাহা আগে কে জানিত? একদিন এই হৃদয়কে শান্তিকুণ্ড বলিয়া জানিতাম—কত প্রেমের উৎস উৎসারিত হইয়াছে, আনন্দ হিল্লোল মৃদু প্রবাহে বহিয়াছে, ভাবের সুকোমল স্নিগ্ধতায় কতই মুগ্ধ হইয়াছি, সঙ্গীতের মৃদুমধুর উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হইয়াছি, আজ সে ভাব গেল কোথায়? আজ অকস্মাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, শান্তিকুণ্ড আজ অনলকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। আজ নদনদীগিরি-গুহা চরাচর বিশ্বে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যের প্রখর তেজ পরাস্ত করিয়া ঐ অগ্নি জ্বলিতেছে। চন্দ্রের সুধাভাণ্ডারে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাই উৎক্ষিপ্ত হইয়া গগনতল ছাইয়া ফেলিয়াছে। হে মহাকালাগ্নির

হোতা! একবার নিবৃত্ত হও, এ সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি পরিহার করত সচ্চিদানন্দ রূপে প্রকাশিত হও—আমি সেই প্রেমহ্রদে ডুবিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই।

একদিন সাগরে অপূর্ব্ব তরঙ্গবিস্তার শোভা পাইয়াছে। কত অর্ণবযান আনন্দে নৃত্য করিয়াছে। কত জলচর জীবজন্তু উল্লাসে বিচরণ করিয়াছে। অনন্ত সাগরের অনন্ত প্রবাহে কতই শোভা বিকশিত হইয়াছে। কত আনন্দ বাষ্প উদ্গত হইয়া করুণার ধারারূপে মেদিনীমণ্ডল অভিসিঞ্চিত করিয়াছে। কত মৃদুমন্দ নির্ঘোষে চপলতাকে গম্ভীরতায় পরিণত করিয়াছে। এই সাগরবক্ষে বালারুণ নিপতিত হইয়া কাঞ্চনময় করিয়া তুলিয়াছে আবার চন্দ্রের রশ্মিসম্পাতে অমৃতের প্রবাহ বহিয়াছে। বিভ্রান্ত চকোর উভয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে ও নামিয়াছে। এই সাগর বক্ষে স্ব স্ব মুখের অতুল শোভা দেখিবার জন্য তারাদল সমবেত হইয়াছে এবং নিশানাথের উদয়ে সকলে তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছে। একদিন সাগরের উল্লাস ও বিলাসভঙ্গিমার সীমা পরিসীমা ছিলনা, অনন্ত সলিল রাশি বুকে করিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বে তাহার হৃদয় প্রতিনিয়ত স্ফীত হইত। পরিবর্ত্তনের স্রোত যে তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া যাইবে তাহা কেহই মনে করে নাই। দেখিতে দেখিতে অসম্ভব সম্ভব হইল। কালের অঙ্গুলিসঙ্কেতে কোথাকার সাগর কোথায় চলিয়া গেল। অগাধ বারিধিতল প্রখর সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, অনন্ত সলিল রাশির পরিবর্ত্তে অনন্ত বালুকাকণার আবির্ভাব হইল। কালে সেই বালুকাকণা বায়ুবিতাড়িত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। অতীতের সাগর আজ বর্ত্তমানের মহামরুতে পরিণত হইল। আজ দেখ সাহারার মরুভূমি কি ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়াছে। আজ উহারই অভ্যন্তরে মোহমরীচিকা কেমন অবাধে ক্রীড়া করিতেছে। হায়! কে জানিত যে আমার দশাও ঐরূপ ঘটিবে?

এতদিন হাসিয়াছি, আজ কাঁদিতে বসিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল কাঁদিতে হইবে। আমি কে যে বিধাতার এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিব? দেও তোমার নিয়মের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করিয়া দেও, আমি আর কিছুই বলিব না, অবনত মস্তকে সকলই সহ্য করিব। এই যে রোদ ও বৃষ্টি হইতেছে আর ঐ উন্নত আকাশে কেমন বিচিত্র ইন্দ্রধনুর সমাবেশ হইয়াছে—এই

হাসিকান্নার ভিতরে আমার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের ইন্দ্রধনু বিরচিত করিয়া দেও, আমি তাহারই শোভায় সমাকৃষ্ট হইয়া শোকতাপ সকল ভুলিয়া যাই।

সাধারণ নিষ্ঠ অধিকার।

য়ুরোপ ব্যক্তি-নিষ্ঠ অধিকারের (individualism) সপক্ষ। ইহার পণ্ডিত মণ্ডলী এই অধিকার-বাদ সংস্থাপনে ব্যস্ত। য়ুরোপীয় ধর্ম্মধ্বজীরা ও এই অধিকার-বাদতন্ত্র বাজাইতেছেন। ইহার বিজ্ঞানবিদেরা প্রত্যেককে আত্ম রক্ষার্থ অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে উপদেশ দিতেছেন। জীব-বিজ্ঞানেরও এই কথা—এবং ক্রমোন্নতিবাদীরাও এই মন্ত্রে দীক্ষিত। য়ুরোপে এই "একোলসেঁড়েমির" কথা প্রায় সর্ব্বত্র সকল বিষয়েই প্রচারিত। বোধ হয় তথায় ইহা ধর্ম্মের বীজমন্ত্র। য়ুরোপ তারস্বরে সকলকে বলিতেছেন "কেবল আত্ম সুখ প্রতি লক্ষ্য কর; অন্যের কি হইতেছে, না হইতেছে তাহার খোঁজ করিবার আবশ্যক নাই।"

য়ুরোপের কথিত মন্ত্র, দীক্ষা ও শিক্ষা সত্বে ও তথায় পল্লী-সমাজ (village community)র অভাব নাই। এই উনবিংশতি শতাব্দের পরিশেষে, সর্ব্ব প্রকার বিজ্ঞান ও তত্ত্ব বিদ্যার প্রায় চরমাবস্থাতেও সাধারণ-নিষ্ঠ-অধিকার তথায় অনেক প্রদেশেই প্রচারিত। অলপাইন ক্ষেত্র সমূহের এবং সুজারল্যাণ্ডের বার আনা ভূমি সাধারণের সম্পত্তি। ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি প্রদেশেরও অনেক ভূমি পল্লী-সমাজের অধিকৃত। রুষের কৃষিজীবীরা এই অধিকার তন্ত্র দ্বারা রক্ষিত হইতেছে এবং স্বচ্ছন্দে দিনপাতে সক্ষম। এই সমস্ত প্রদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র, ফলফুলের বাগান, পশুচারণ ও পশু রক্ষণের স্থান, লোক সাধারণের লোক সাধারণ সমবেত হইয়া খাল পুকুর-খনন, বিলাদির সংস্কার এবং প্রয়োজনাতীত জল নির্গমের ব্যবস্থা করে। শস্য ছেদন এবং জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য সক্ষম লোক সকলকে বৎসরে কিছু দিন ধরিয়া মাঠে এবং জঙ্গলে থাকিতে হয়। সংগৃহীত শস্য ও কাষ্ঠাদি সামঞ্জস্য মতে সকল লোক পরিবার মধ্যে বিতরিত হয় এবং সকলে মিলিয়া সংসারের

আবশ্যক সমস্ত কার্য্য করে। একের বোঝা অন্যে বয় এবং সকলেই লোক সাধারণের সুখ দুঃখের ভাগী।

জাপানিজরা আজ কাল জগতের মধ্যে এক অতি প্রধান জাতি। জাপানস্থ পল্লী-সমাজ (village community) সম্বন্ধে ডাক্তার সিম্-সানের মন্তব্য (নোট) ১৮৯১ সালে যে, এচ, উয়িগমোর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে তথাকার গ্রাম্য ক্ষেত্র (mura) সমূহ সাধারণ সম্পত্তি। নর নারীর সংখ্যা অনুসারে এক একটি গ্রাম তাহাদের মধ্যে বিভক্ত, কিন্তু বিভক্তাংশ সকল পরিবারস্থ কর্ত্তার অধিকৃত। কর্ত্তা স্বীয় অধীনস্থ পরিবারের ব্যক্তিদের ভরণ পোষণ ও সর্ব্ববিধ সুখ দুঃখের দায়ী। কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি অথবা বণিকের হস্তে কোন জেলার (district) সমস্ত ভূমি না যাইতে পারে এজন্য আইন দ্বারা পারিবারিক ভূমি (family land)র বিক্রয়াদি নিষিদ্ধ। সাধারণাধিকার ভুক্ত গ্রাম মধ্যে বাসের জন্য একটি স্থান মনোনীত করিয়া তথায় বাসোপ-যোগী গৃহাদি নির্ম্মিত হয়। একে অন্যের সান্নিধ্যে থাকে। সমস্ত পরিবার লইয়া এক একটি গোষ্ঠি (kumi)র সৃষ্টি এবং গোষ্ঠিপতির সম্মতি ব্যতীত কেহই তমসুক অথবা ভূমি বন্ধক দিতে সক্ষম নহে। প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তা তদন্তর্গত ব্যক্তি সমূহের এবং তাহাদের দাস দাসীদেরও দুষ্কৃতির জন্য দায়ী। গ্রামস্থ কোন গৃহ গঠন কিম্বা সংস্কার করণে সকলেই সহায়তা করিতে বাধ্য। উৎসবাদি, বিদেশীয়ের আতিথ্য সৎকার এবং সাধারণ গৃহাদির সংস্কার সাধরণ ব্যয়ে সম্পন্ন হয়।

আমাদের মধ্যেও এই সাধারণ-নিষ্ঠ-অধিকার বর্ত্তমান। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা বিলুপ্ত হইবার নহে। পল্লীসমাজের ভারতে বহুল প্রচার এবং তাহা দৃঢ় সম্বন্ধ।

পরম সভ্যতা এবং বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-বিদ্যা-ভূমি য়ুরোপে যখন ইহা এখনও বর্ত্তমান তখন অন্যত্রও যে ইহা থাকিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু মূলতঃ ইহার বিশেষ কোন শক্তি না থাকিলে মানব জাতির মঙ্গল সাধনে ইহা অনুকূল না হইলে, ইহা আজ পর্য্যন্ত কখন জীবিত থাকিত না। ভারতের কথা আমরা কহিতে চাহি না, কেন না ভারতীয় নজির কানন আমাদের উপস্থিত যুবকবৃন্দের নিকট তত আদরণীয় নহে। মনুষ্যকুল

প্রতি প্রীতিমান হইবার জন্য কোমৎ সকলকে উপদেশ দিতেছেন। বলিতেছেন এই মহান্ উপদেশ পালনেই মানবের মঙ্গল পরমোন্নতি। মন্বাদি মহর্ষি অনুমোদিত এই সাধারণ-নিষ্ঠ-অধিকার বাদও ঐ কথা বলেন। স্বার্থ ত্যাগে পরার্থপরতাতেই মানবের পরম মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রাদি জলদ-গম্ভীর স্বরে এই পরম কথা কহিয়া থাকেন। কোমতের মানব-বৃন্দ কাল্পনিক পদার্থ, তাঁহার লক্ষ্যভূত দেবতা প্রত্যক্ষ দেবতা নহে। সাধারণ-নিষ্ঠ-অধিকার বাদের দেবতা কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর। পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নী, প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন পল্লী-সমাজের প্রত্যক্ষ দেবতা। ইহাদের অগ্রে তুমি স্বার্থ বলিদানে বাধ্য। স্বীয় শ্রমোর্জ্জিত ধন ধান্য দানে পল্লীসমাজ ইহাদের পূজা করিতে বাধ্য। আর্য্যসুতগণ প্রতিদিন এই প্রত্যক্ষ দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। এই পূজানুসরণে পরার্থপরতায় সুশিক্ষিত হইয়া চিত্তের মহত্ব এবং পবিত্রতা লাভে মানুষ পরিণামে স্বর্গ রাজ্যে নীত হন। এই এক মাত্র মহোচ্চ ধর্ম্ম জন্য সাধারণ-নিষ্ঠ-অধিকার-বাদ জগতে চিরবর্ত্তমান থাকা উচিত। এই পরম ধর্ম্ম গুণেই ইহা চিরদিন মানব সমাজে বর্ত্তমান থাকিবেক।

একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবার এই পরম সুন্দর বাদের অন্তর্ভূত। কঠোর পাশ্চত্য সভ্যতা হেতু এই উদার প্রথার দিন দিন ব্যাঘাত ঘটিতেছে। “ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই” এই বিষময় কথা আমাদের কর্ণ কুহরে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইংরাজের হাতে আমরা বানর, এই একান্ত অসার অশ্রেয়স্কর কথা তাঁহার নিকট শুনিয়া আমরা লাপাইতেছি। তুমি কৃতী, দশ টাকা আনিতেছ। তোমার ছোট ভাইটি রোজগারী নয়, বসিয়া বৃথা কাল হরণ করে। ভাইটি সপরিবার তোমার গলগ্রহ। এ অবস্থায় ইংরাজ, ইংরাজি নবিস যুবক তোমাকে বলিবেন ‘এসব ঝন্ ঝট্ তুমি কেন সহ্য কর; তোমার উপার্জ্জনের টাকার তুমিই মালিক; তাহার অংশ তুমি কেন অন্যকে দিবে; তুমি স্বীয় সুখ ব্রতী হও; ...ই পরম ধর্ম্ম; আত্ম রক্ষাই মানবের প্রধান কার্য্য।’ ইংরাজের, ইংরাজী ... এবং ...থা শুনিতে আমরা তোমায় মানা করিনা। কিন্তু সকল বিষয়ের সকল লোক্ দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। মানুষ সামাজিক অন্যকে সাহায্য ক... তাহার স্বভাব। সেই প্রবল স্বভাব সহায়হীন

তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য করিতে তোমাকে-বাধ্য করে। সেইহেতু সেই নিরাশ্রয়, নিঃসহায় ভ্রাতাকে সাহায্যদানে অবশ্যই তোমার চিত্তে পরমানন্দ হয়। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য যদি তুমি সাহায্যদানে প্রবৃত্ত হও, তবে নিরন্ন সহোদর, স্বজনকে অন্ন দিতে তোমার আপত্তি কি? তোমার বিদেশী ইংরাজ উপদেষ্টারা বলিতেছেন "লোকের দান কার্য্য তাহার স্বীয় গৃহ মধ্যেই প্রথমতঃ হওয়া উচিত" charity must begin at home. অন্ততঃ এই উপদেশানুসারে স্বীয় সহোদরের সহায়তা করা তোমার উচিত। এ ভিন্ন তোমার পরিবারস্থ হইয়া তোমার ভ্রাতা এবং তাহার স্ত্রী পুত্র অনেক বিষয়ে তোমার সাহায্য করিতে পারে। তোমার ভ্রাতার বণিতা অনেক বিষয়ে তোমার বণিতার সহকারিণী এবং তোমার ভ্রাতাও তোমার সংসার ভার বহনে সাহায্যকারী হইতে পারে। দুই তিন ভ্রাতায় একত্র থাকায় যে কেবল অসুখ ও ঝন্‌ঝট এমত নহে। ইহাতে বিশেষ সুখও আছে। পীড়াদি সময়ে, আপদ বিপদ কালে, শোক তাপে, ভ্রাতৃ মুখ, ভ্রাতৃ হস্ত পরম আশা-প্রদ, দুঃখ যন্ত্রণা, বিপদভার এবং শোকের তীব্রতা ও কঠোরতার নূন্যতা-কারক। আর সহোদর সহ আনন্দোপভোগে স্বতঃই তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু মনুষ্যের স্বভাবই এমি যে উপকার লাভ করিলে তিনি আপনা হইতেই প্রত্যুপকারে প্রবৃত্ত হন। এক ভাই আর এক ভায়ের গল-গ্রহ হইয়া যে বৃথা খায়, এরূপ দেখা যায় না। সাহায্যকারী ভ্রাতার যে সে কোন কিছু করেনা, এমত নহে। উপায়ক্ষম কর্ম্মী ভ্রাতা স্বার্থ ত্যাগে পরার্থপরতা রূপ পরম ধর্ম্ম পালন করিয়া ক্রমশঃ চিত্তের উৎকর্ষ, উন্নতি এবং পূততা প্রাপ্তে স্বর্গাভিমুখে গমন করিতে থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর কি উচ্চ লাভের প্রত্যাশা মানুষ করিতে পারে?

হটেন্‌টটদের মধ্যে এই পরম পবিত্র রীতি প্রচলিতঃ—"কেহ অভুক্ত থাকিলে আমার গৃহে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ কর" তিন বার তারস্বরে এইরূপ আহ্বান করিয়া পরে বর্ব্বর হটেনটট সম্মুখে স্থিত অন্ন ব্য[illegible] উদরসাৎ করে। প্রাচীন আর্য্যসুত মাত্রও এইরূপ করিতেন। মনু বলেন, যে ঐরূপ না করিয়া গৃহী পান ভোজন করিলে নরকগামী হন। হয়ত ইংরাজী নবীস বলিবেন, এরূপ করিবার আবশ্যক কি? হয় ত তিনি বলিবেন "গরিবের জন্য দাতব্য [illegible] দিয়া থাকি, এরূপ করিব

কেন ?” জিজ্ঞাসা করি, দ্বারস্থ ক্ষুধার্থকে অন্ন দানে এবং মাস মাস দাতব্য ফণ্ডে কিছু কিছু দেওয়া, এই উভয় কার্য্য মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না ? আমরা বলি, প্রভেদ বিস্তর। তোমার সম্মুখে বসিয়া অভুক্ত ক্ষুধার্থ গরিব পান ভোজন করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া তোমাকে দুহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে তোমার যে অপরিসীম বিমল আনন্দ হয়, দাতব্য ফণ্ডে অর্থ দানে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা বিরল। প্রথমোক্ত কার্য্যে হৃদয় নিহিত তোমার সুকুমার বৃত্তির যুগপথ চরিতার্থতা হইয়া থাকে এবং তোমার কৃত দানাদি দ্বারা তোমার সন্তানাদি ও অন্য জনের দানাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ হওয়া একান্ত সম্ভব। প্রকৃত হিন্দুর দ্বার হইতে অসন্তুষ্ট চিত্তে ভিক্ষুক প্রায় ফিরিয়া যায় না। হস্তে কপর্দ্দক না থাকিলেও হিন্দুর দানশীলতা গুণে এখনও নাগা ফকির স্বচ্ছন্দে হিমালয় পদপ্রান্ত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে পারে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার প্রতিপক্ষেরা বলেন, যে ইহা আলস্য, উদ্যমহীনতার প্রসূ। একথা সমীচীন ও ঠিক নহে। এরূপ হইলে উদ্যম-ভূমি য়ুরোপেও সাধারণ-নিষ্ঠ-অধিকার সমাদৃত হইবে কেন ? সকল জিনিসেরই অপব্যবহার সম্ভব। একান্নবর্ত্তী পরিবারের নেতা, কর্ত্তা সুবিবেচক, দৃঢ়চিত্ত, বহুদর্শী-দূরদর্শী এবং সমদর্শী ন্যায়পর ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হইলে, সর্ব্বথা শুভ সাধিত হইবারই সম্ভাবনা।

শ্রীদীননাথ ধর।

শ্রীধাম নবদ্বীপ ও গৌরগৃহ।

নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। হিন্দু মাত্রেই এই নগরের নাম অবগত আছেন। এককালে এই নগর বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই নগরেই জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালী [illegible] ‘নব্যন্যায় দর্শন” এই নগরেই সমুদ্ভূত হইয়াছিল। [illegible] সীর তীর্থস্থান।

[illegible] রথীর মধ্যস্থ একটী চর বা দ্বীপ। ঐ চরের উপর নূতন [illegible] নাম নবদ্বীপ হয়। প্রাচীন কালে ভাগীরথী

ইহার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া অন্যান্য ভূমি হইতে এই পবিত্র নবদ্বীপ ভূমিকে পৃথক রাখিয়াছিল। অদ্যাপি বর্ষাকালে সুরধুনী ইহার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া দ্বীপ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। চরের একটী সাধারণ ধর্ম্ম এই যে তাহার সকল স্থান সমান উচ্চ হয় না। মধ্যে মধ্যে খাল বা সোঁতা থাকে। নবদ্বীপে এই প্রকার অনেক সোঁতা ছিল। ঐ সকল সোঁতা প্রায়ই পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে তাহার ৪।৫ টী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল খালের মধ্যবর্ত্তী স্থান উচ্চ ভূমি। সে সকল স্থানেই লোকের বসবাস হইয়াছিল। নবদ্বীপের সর্ব্বোত্তরে সিমুলিয়া, তাহার দক্ষিণে নদীয়া বা নবদ্বীপ, কেহ কেহ নদীয়াকে আতপুর কহেন। তাহার দক্ষিণে চিনা ডাঙ্গা, এবং তাহার দক্ষিণে বৈঞ্চীচি আড়া ও পরে পাটডাঙ্গা। একটী একটী খালের দ্বারা ঐ সকল স্থানের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ষাকালে ঐ সকল সোঁতায় জল প্রবেশ করিয়া ঐ সকল স্থানকে পৃথক পৃথক দ্বীপে পরিণত করিত। বর্ষা অন্তে আবার সবগুলি একত্রিত হইয়া যাইত। এই সকল দ্বীপের মধ্যে নদীয়া বা নবদ্বীপ প্রধান ছিল বলিয়া ঐ সকল স্থানের বিশেষ বিশেষ নাম থাকিলেও তাহারা নবদ্বীপ বলিয়া উক্ত হইত। নবদ্বীপ যে ভাগিরথীর দ্বীপ তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থকার রাজা যুধিষ্ঠিরের বনবাসসময় অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। যথা

"এই কতো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥"

উপরোক্ত পদ্যে সুরধুনী বেষ্টিত বলায় নবদ্বীপ যে ভাগীরথীর দ্বীপ তাহা উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু নদীর উভয় শাখাই কখনও প্রবল থাকে না। ক্রমশ এক শাখা প্রবল হইয়া আইসে ও অপরটীর স্রোত মন্দীভূত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপ সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ইহার পশ্চিমের স্রোত প্রবল ও পূর্ব্বের স্রোত মন্দীভূত হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বের ধারায় খড়িয়া নদী প্রবাহিত থাকিয়া নবদ্বীপকে দ্বীপাকারেই রাখিয়াছিল।

চৈতন্য ভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাই গৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য কাঁটোয়া গমন করেন তখন ভাগীরথী পার হইয়া গিয়াছিলেন যথা—চৈ ভা

"গঙ্গাপার হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর॥" ১৩১

আবার বংশীশিক্ষায়—

গঙ্গাপরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন, শ্রীশচী নন্দন
চড়ি নিজ মনোরথে॥ ১৮০

উপরের দুইটী বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে গৌরাঙ্গ ভাগীরথী পার হইয়া কাঁটোয়ায় গিয়াছিলেন। কাঁটোয়া ভাগীরথীর পশ্চিম পারে বরাবর আছে। সুতরাং তৎকালে নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভাগীরথী নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত রহিয়াছেন। এখন কাঁটোয়া যাইতে হইলে আর ভাগীরথী পার হইতে হয় না।

আবার যখন গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফুলিয়া ও শান্তিপুরে আসেন সেই সময়ে নবদ্বীপ বাসীরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তৎকালেও তাঁহারা নবদ্বীপের নিকট নদী পার হইয়াছিলেন। যথা

"এসব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হৈঞা॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সবে বলি হরি হরি॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥" চৈ ভা ১৮২

অতএব নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিকেও নদী ছিল জানা যাইতেছে।

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ বল্লালসেন ও তদ্বংশীয়গণ নবদ্বীপে বাস করিতেন। বর্ত্তমান [illegible]াদ থাকা[illegible] প্রায় ৩।৪ মাইল উত্তরে সিমুলিয়া নামক স্থানে তাঁহাদের রাজ ঢিবী নামে একটা[illegible] শুনা যায়। ঐ রাজ প্রাসাদের চিহ্ন মাত্র নাই। তবে বল্লাল [illegible]প্রকাণ্ড ঢিবী ও তাহার প্রায় এক পোয়া দক্ষিণে বল্লাল

দীঘি নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী ও একটী দীঘির ভগ্নাবশেষ আছে। ইহাতে ঐ স্থানে বল্লালসেনের রাজ প্রাসাদ থাকা অনুমিত হয়।

অতএব উপরোক্ত বর্ণনায় জানিতে পারাযায় যে নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল, এখন পূর্ব্বদিকে আছেন। এবং প্রাচীন রাজধানী বর্ত্তমান নবদ্বীপ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার কাহার মনে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সে প্রাচীন নবদ্বীপ নয় এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন বর্ত্তমান নবদ্বীপ আদৌ নবদ্বীপ নহে, ঐ স্থান আদৌ গৌরাঙ্গের জন্মস্থল নহে। তাঁহারা বলেন বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব ভাগীরথীর পর পারই নবদ্বীপ এবং তদন্তর্গত মিঞাপুর নামক ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লীতেই গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বা গৃহ ছিল। তবে কি এই নবদ্বীপ সেই প্রাচীন নবদ্বীপ নয়? এই স্থানেই কি সেই নব্য ন্যায় দর্শন উদ্ভূত হয় নাই? এই স্থান কি গৌরাঙ্গ দেবের জন্মভূমি নহে? এই যে, গৌরাঙ্গদেবের সময় হইতে বৎসরে বৎসরে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া গৌর দর্শন করিয়া ও নবদ্বীপের ধূলি মাখিয়া পবিত্র হইতেছে তাঁহারা কি পুরুষানু ক্রমেই ভ্রান্ত হইয়া আসিতেছেন? ভাগীরথী দেবী কি চির-দিনই বর্ত্তমান নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত আছেন? না তাহা নয়— এই নবদ্বীপই সেই প্রাচীন নবদ্বীপ। এই স্থানেই ন্যায়দর্শন সমদ্ভূত হইয়াছিল। এই নবদ্বীপই গৌরাঙ্গের জন্মস্থল এই নবদ্বীপের পশ্চিমেই ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। এবং ইহারই অংশ বিশেষে বাস করিয়া বল্লালসেনাদি রাজাগণ নদীয়ার রাজা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ের সমাধান করাই এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান নবদ্বীপই সেই প্রাচীন নবদ্বীপ। চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে যে সকল লোকের নাম প্রকাশিত আছে অদ্যাপি তদ্বংশীয়গণ পুরুষ পরম্পরায় এই নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ সনাতন মিশ্রের ভিটা অদ্যাপি মালঞ্চ পাড়ায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। অল্পদিন হইল তদ্বংশীয় গণ ঐ ভিটা ত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গের বাটীর নিকট বাস করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ কৃষ্ণ আগম বাগীশ ভট্টাচার্য্যের "সিদ্ধপীঠ" অদ্যাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপ পরিশোভিত করিতেছে। তথায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার ব্যয়ে কার্ত্তিকের অমাবস্যায় অর্থাৎ ৬শ্যামা পূজার দিন এক প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছে।

জগাই মাধইএর বংশীয়গণ এই নবদ্বীপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়দেব তর্কালঙ্কারের অপরিবর্ত্তিত বসত বাটী অদ্যাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপের আম্পুলিয়া পাড়ায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ কু 'র সান্ন্যালের নিকট ১০৮৭ সালের যে সনন্দ পাওয়া যায়, তাহাতে নদীয়ার 'জয়দেব তর্কালঙ্কার বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহা হইলে তিনি ঐ সময়ে বা উহার পুর্ব্বেই নবদ্বীপের আম্পুলিয়া পাড়ায় ঐ ভিটায় বাস করিয়াছেন। কথিত আছে যে আম্পুলিয়া ভট্টাচার্য্যরাই নবদ্বীপের আদিম নিবাসী। তাঁহাদের ভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাঁহাদের নাম অনুসারেই ঐ পাড়া আম্পুলিয়া পাড়া বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি এই শ্রীনবদ্বীপ পরিশোভিত করিতেছে। এই সকল প্রাচীন বংশ ও প্রাচীন স্থান সকল বর্ত্তমান থাকিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপই যে প্রাচীন নবদ্বীপ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বর্ত্তমান নবদ্বীপেরই পশ্চিমে যে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে আমরা তিনটী খাল দেখিতে পাই, ঐ সকল খাল ভাগীরথীর খাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার প্রথমটী নবদ্বীপের লাগাও পশ্চিমে, ঐখালই নবদ্বীপের পশ্চিম সীমা। উহার নাম পলতা। ঐখালের পশ্চিমে আর একটী খাল আছে। তাহার নাম কোবলার বিল। তৃতীয়টী আবার তাহার পশ্চিমে, নাম চাঁদের বিল। ভাগীরথী প্রথমে এই চাঁদের বিলে প্রবাহিত ছিলেন। পরে সে ধারা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিকে সরিয়া আসিয়া কোবলা, বাসুদেবপুর আদি গ্রামের পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হন। পরে আবার সে ধারা ছাড়িয়া পলতা নামক খালে প্রবাহিত থাকেন। কোবলা গ্রামের পূর্ব্ব দিকস্থ খাল কোবলার বিল বলিয়া পরিচিত হয়। উহাকে গোঁসাইগঙ্গা বলে এবং ঐস্থানে একটী ঘাটকে গোঁসাই ঘাট ও বলে। কেন বলে তৎসম্বন্ধে পরে বলিব।

[illegible] নবদ্বীপের মহারাজারা সময়ে সময়ে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে [illegible]জমি দান করিয়া সনন্দ দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল সনন্দে বর্ত্তমান মাঠে এবং [illegible] ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা জানিতে পারা যায়। নবদ্বীপের সকল [illegible] দেখিয়া ও [illegible] ও প্রসন্নকুমার চৌধুরীদিগের পূর্ব্ব পুরুষ

অন্যকে সাহায্য ক[illegible]

৺শ্যামসুন্দর চৌধুরী মহাশয় যে সকল সনন্দ পাইয়াছিলেন নিম্নে তাহার উদ্ধৃত করিলাম।

"নদীয়ার শ্রীশ্যাম চৌধুরী সুচরিতেষু—
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ নমস্কারা প্রযোজনঞ্চ বিশেষ অধিকারে তোমার বৃত্তি নাই। অতএব অধিকারের ৺পূর্ব্বকূলে সেওয়ায় পলাসী ও বেলগাঁ ও হাবেলিসহর ও কলিকাতা ও ধুলিয়াপুর পরগণায় বেওয়ারেশ গর জমাই সমেত পতিত জঙ্গল ভূমি ১৬ ষোল বিঘা বৃত্তি দিলাম। নিজ জোত করিয়া ভোগ কর। ইতি ১১৫৯ সাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ।"

উহার চিহ্নিতনামা।

"চিহ্নিতনামা জমি তরফ নদীয়ার মৌঃ দেওয়ানগঞ্জ ব্রহ্মত্তর নিজ নদীয়ার শ্যাম চৌধুরির সনন্দ ১১৫৯ সাল তারিখ ৩১ জৈষ্ঠ বিঃ ১৬ ষোল বিঘা জমি সন ১১৬০ সাল তারিখ ২রা অগ্রহায়ণ।

আসামী	জমি
পশ্চিম মাঠ	৸৹ পতিত
নিকিরী পাড়া নিম্নদহ	১৷৹ "
জায়গরের ঘাটের দক্ষিণ ১বন্দে	১০/ "
তাহার দক্ষিণ	২৷৹ "
গ্রামের ভিতর	১।৹ "

গর জমাই বেওয়ারেশ বাজে জঙ্গল চিহ্নিত করিয়া দিলাম।"

"নদীয়ার শ্রীশ্যামসুন্দর চৌধুরী সুচরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ নমস্কারা প্রয়োজনঞ্চ বিশেষ অধিকারে তোমার বৃত্তি নাই অতএব অধিকারের ৺পূর্ব্ব কূলে সওয়ায় পলাসী ও বেলগাঁ ও হাবেলি সহর ও কলিকাতা ও ধুলিয়াপুর পরগণায় বেওয়ারেস গর জমাই সমেত পতিত জঙ্গল ভূমি ৫৭ সাতান্ন বিঘা বৃত্তি দিলাম। নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ। ইতি ১১৫৯ সাল তারিখ ৩১ জৈষ্ঠ।"

চিহ্নিতনামা।

"ইঃ ফর্দ্দি ব্রহ্মত্তর ভূমি নদীয়ার
শ্রীশ্যামসুন্দর চৌধুরী ১১৫৯ সাল ৭ শ্রাবন

আসামী	জমি
তরফ নদীয়ার উমাপুর	৩৮/
দেওয়ানগঞ্জ	১৮/
মহিসুড়া	১০/"
	৬২/•

উপরি উদ্ধৃত দুই খানি সনন্দে যে যে জমি দান করিয়াছেন ঐ সকল জমিই ৺পূর্ব্ব কূলে অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্ব কূলে দেওয়া হইয়াছে দেখা যাইতেছে, কিন্তু ঐ জমি সকল কোন্ গ্রামে বা কোন্ স্থানে দেওয়া হইয়াছে তাহা সনন্দে প্রকাশিত নাই কিন্তু, উহার চিহ্নিত নামায় প্রকাশিত আছে।

১১৫৯ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৺পূর্ব্ব কূলে যে ১৮/• বিঘা জমি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ১১৬০ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখের চিহ্নিতনামায় বিবরিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জান্নগরের ঘাটের দক্ষিণ ১০/• বিঘা জমি লিখিত আছে ঐ জমি আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। উহা জান্নগরের পূর্ব্ব দিকে যে ভাগীরথীর প্রাচীম খাত আছে সেই খাতের পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ বর্ত্তমান নবদ্বীপের লাগাও পশ্চিমদিকে আজও গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ পুরুষানুক্রমে দখল করিতেছেন। আবার "জান্নগরের ঘাট" এই শব্দ থাকায় তৎকালে নবদ্বীপ হইতে জান্নগার যাইবার পার ঘাট থাকা এবং এই স্থানে ভাগিরথী প্রবাহিত থাকা প্রতিপন্ন হইতেছে। ঐ চিহ্নিত নামায় আর যে সকল জমি চিহ্নিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহার উত্তরাধিকারী গণ দখল করিতেছেন।

১১৫৯ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে দ্বিতীয় সনন্দে ৺পূর্ব্ব কূলে যে ৫৭/• বিঘা জমি দেওয়া হয় তাহা ১১৫৯ সালের ৭ই শ্রাবণ তারিখে চিহ্নিত করিয়া আছে কিন্তু ইহাতে একটু অনৈক্যও দেখা যায়। সনন্দে ৫৭/• নামায় ৬২/• বিঘা লিখিত আছে। যাহা হউক ঐ সকল জমি গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ আজ পর্য্যন্ত দখলি-

ভাগীরথী খাতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছে। বর্ত্তমান বাবলাড়ীর নামই দেওয়ানগঞ্জ। শ্রীগৌরাঙ্গের রথের সময় ঐ স্থানে গুণ্ডবাড়ী হইত। এবং তাঁহারই অপভ্রংশে উহার নাম বাবলাড়ী হইয়াছে। ঐ বাবলাড়ীর দক্ষিণ ও নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ কুঠী নামক খ্যাত স্থান উমাপুর। এবং নবদ্বীপের লাগাও দক্ষিনে মহিসুড়া গ্রাম হইতেছে। প্রথমোক্ত দুইটী স্থানই বর্ত্তমান নবদ্বীপের সংলগ্ন ও অংশ। তাহা হইলে আমরা ঐ সময়ে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৬০ ও খ্রীঃ ১৭৫৩ সালে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা দেখিতে পাই।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজ্যের সীমা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও ঐ সকল দলিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছে। যথা

“ রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥ ”

নবদ্বীপ কৃষ্ণনগরের রাজ বংশের প্রাচীন জমিদারী। ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে এই বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরই তাঁহার রাজ্যের প্রধান নগর ছিল। তাহা হইলে পশ্চিম “ সীমা ভাগীরথী খাদ ” এই কথা থাকাতেই বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল ইহা বুঝা যাইতেছে। ভারতচন্দ্র রায়ের উক্ত গ্রন্থ ১৬৭৪ শাক বা খৃঃ ১৭৫২ সালে লিখিত হয়। উক্ত দলিল সকলের তারিখেও ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে আছে। অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে ১৭৫৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল তাহা নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হইল।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন প্রমাণিত হইল। পশ্চিমের কোন খাতে কখন প্রবাহিত ছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, পশ্চিমের ধারা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিম সীমা এইরূপ দেখিতে পাই যে, পশ্চিমে ভাগীরথী ও তাহার পার্শ্বে পূর্ব্বস্থলী জা- বিদ্যানগর, আদিগ্রাম। উত্তরে যেখানে বল্লাল সেনের প্রাসাদ ... নাম সিমুলিয়া পরে বিল্বপুষ্করিণী। দক্ষিণে মাহিসুড়া সমুদ্র... পূর্ব্ব দিকে খড়িয়া নদী। এই খড়িয়া নদী কোন স্থা...

তাহা নিশ্চিত জানা যায় না, সম্ভবত আমঘাটা গ্রামের পশ্চিম দিকস্থ 'অলকানন্দ' নামক খালই খড়িয়ার খাদ। খড়িয়া নদী ঐ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকস্থ ভাগীরথীর স্রোতহীন খাতে মিশিয়া দক্ষিণে সমুদ্রগড়ের পূর্ব্বদিকে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছিল। এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত সমগ্র ভূভাগ সাধারণত নবদ্বীপ নামে আখ্যাত হইত। ইহার মধ্যে নিজ নবদ্বীপ গঙ্গার মধ্যস্থ অর্থাৎ অন্তরস্থ বলিয়া ইহাকে অন্তর্দ্বীপও বলে। নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে যে নদী ছিল তাহা পূর্ব্বে চৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান গিয়াছে। ঐ নদীটী যে খড়িয়া বা জলঙ্গী, পরবর্ত্তী দলিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজপেচী
শ্রীমন্মহারাজেন্দ্র
রাজ শিবচন্দ্র
রায়ের

"শ্রীশ্যামসুন্দর চৌধুরি সুচরিতেষু—

লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে মহিসুড়া গ্রামে তোমার সাবেক ব্রহ্মত্তর ১৬/০ ষোল বিঘা জমি ছিল সনন্দ দৃষ্টি করা গেল সে ভূমি খড়িয়ার ভাঙ্গনে সিকস্তি হইয়াছে অতএব তাহার মধ্যে এওজ গর জমাই বাজে জঙ্গল বেওয়ারিস জমি ১০/০ বিঘা এওজ দেওয়া গেল নিজ জোতে ভূমি হাসিল করিয়া পুত্র পৌত্র পরম সুখে ভোগ করহ ইতি ১১৯১ সাল ৬ আশ্বিন।"

উক্ত সনন্দে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে খড়িয়ার ভাঙ্গনে মহিসুড়ার জমি সিকস্তি হইয়াছে। ঐ মহিসুড়া গ্রাম নবদ্বীপের দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম উত্তর ছিল। তাহা হইলে ঐ গ্রামের পূর্ব্ব দিকে খড়িয়া থাকা প্রতিপন্ন হইতেছে সুতরাং নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিকেও খড়িয়া প্রবাহিত থাকা জানা যায়। উক্ত সনন্দ মহারাজ শিবচন্দ্র রায় ১১৯১ সালে ও ইংরাজী ১৭৮৪ সালে দিয়া-

...আমরা রেনলগু সাহেবের নক্সা হইতে ১৭৬৩ সালে বর্ত্তমান নবদ্বীপের ...ভাগীরথী প্রবাহিত দেখিতে পাই; তাহা হইলে মহিসুড়ার জমি ... দ্বারা সিকস্তি হইয়াছিল ইহাই অনুমান করিতে হইবে।

...য়াছি যে সেনবংশীয় রাজারা নবদ্বীপে রাজত্ব

করিতেন। কিন্তু নিজ নবদ্বীপে তাঁহাদের রাজপ্রসাদ ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ ঘটক প্রবর ধ্রুবানন্দ পঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠীকথায় লিখিয়াছেন,—

"মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নু নগরোত্তরে করে যে বাসস্থান॥
নিজ সভাসদে দেন নবদ্বীপে (অন্তর্দ্বীপে) ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস কিম্বা দ্বিজে তর॥
ক্রমে নবদ্বীপ হ'ল বাণীর নিবাস।
পুণ্যতীর্থ বলি হৃদি সবার বিশ্বাস॥"

উক্ত বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ জান্নগরের উত্তর ছিল। সুতরাং বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ছিল বলিতে হইবে। এবং আপন সভাসদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিজ নবদ্বীপে (অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ গঙ্গার গর্ভ দ্বীপে) বাস করিতে দেন, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাঁহার নিজ বাসস্থান নবদ্বীপ ছিল না। নবদ্বীপে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বাস ছিল। যে স্থানে রাজাদের বাস ছিল উহার নাম সিমুলিয়া বা সীমন্ত দ্বীপ। ঐ স্থান নবদ্বীপের প্রান্তবর্ত্তী। যথা—

"নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥" চৈঃ ভাঃ

এই সেন বংশীয় রাজারা সমস্ত বঙ্গ ভূমির অধিপতি ছিলেন। রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের প্রায় এক লক্ষ সেনা ছিল। ঐ সকল সৈন্যের সমাবেশ হইতে পারে নবদ্বীপে এমন স্থান ছিল। ঐ সকল স্থানই রাজপ্রসাদের নিকটবর্ত্তী ছিল। সুতরাং সেন রাজাদিগের রাজপ্রসাদ, দুর্গ, সেনানিবেশ এবং অন্যান্য স্থানে ঐ স্থানের এক মাইলের অধিক স্থান ব্যাপ্ত ছিল বলিতে হইবে। তাহারই দক্ষিণে ভাগীরথীর স্রোতহীন খাদ রাজ্যের পরিখার ন্যায় পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত থাকিয়া সিমুলিয়া ও নবদ্বীপকে বিভাগ করিতেছিল। যাহা হউক ভাগীরথীর ভাঙ্গনে ঐ বাটী দুর্গাদি বিলুপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর পড়িয়া
এখন যেথানে বামুনপুকুর বল্লালদীঘি, মিঞাপাড়া,
ভারুই ডাঙ্গা আদি পল্লী আছে, তৎসমুদয় স্থানই
ছিল। বল্লালদীঘি যে রাজপ্রসাদের অন্তর্গত

নাই। মিশ্রাপাড়া এই বল্লালদীঘির দক্ষিণ পাহাড়ের উপর সংস্থিত সুতরাং মিশ্রাপাড়া রাজপ্রসাদের অন্তর্গত ছিল বলিতে হইবে।

মহারাজ লাক্ষ্মণেয় নবদ্বীপের শেষ রাজা। ইনি আজীবন নবদ্বীপেই বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁরই সময়ে মুসলমানেরা নবদ্বীপ অধিকার করে। মুসলমান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী, বেহার ও মিথিলা রাজ্য লুণ্ঠন ও অসংখ্য নর নারীর প্রাণ বধ করিয়া হিন্দু মাত্রেরই বিশেষ ভীতিজনক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য লোলুপ হইয়া ক্রমে বঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন। এবং নবদ্বীপের অদূরে বন মধ্যে সৈন্য সামন্ত লুকাইয়া রাখিয়া দূতবেশে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা পূর্ব্ব হইতেই বখ্‌তিয়ারের ভয়ে ভীত ছিলেন। এক্ষণে সেই শত্রু রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া তিনি সপরিবারে চিরদিনের নিমিত্ত খিড়কী দিয়া পলায়ন করিলেন। বখ্‌তিয়ার এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে নবদ্বীপ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে সামান্য একটি যুদ্ধ হইল। এদিকে বন হইতে অসংখ্য যবন সৈন্য আসিয়া পড়িল। তাহারা যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যেই রাজ- প্রাসাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল নরশোণিতে লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। কেহ কেহ বা ভয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল। এবং যাঁহারা বিদ্যোপার্জ্জনে বা অর্থোপার্জ্জনে বা বানিজ্যার্থে বা চাকরি উপলক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই পলাইলেন। এবং অধিবাসীর মধ্যেও অনেকেই চির দিনের নিমিত্ত নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। নবদ্বীপ লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। রাজ প্রাসাদ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল মহা শ্মশানে পরিণত হইল। এই সময়ে নবদ্বীপ হইতে যে, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাইয়া গিয়াছিলেন তাহা এডু- মিশ্রের গ্রন্থে বিশেষ প্রকাশিত আছে।

বখতিয়ার কেবল নবদ্বীপ লুণ্ঠন ও প্রাণীহত্যা করিয়াই ছাড়িলেন না। ...বার সময় রাজপুরী রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি মুসলমান সৈন্য ... তাহারা নিকট নিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিতে ...কেও কাহাকেও বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে ...য এবং কেহবা অনুগ্রহ পাইবার প্রত্যাশায়

মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এইরূপে তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হিন্দুশূন্য হইয়া পড়ে এবং ঐ স্থান একটী সামান্য মুসলমান পল্লীরূপে পরিণত হয়।

যবনাধিকার হইতে নবদ্বীপের বিশেষ অবনতি হইল। ইহার সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত ও বাণিজ্য বিলুপ্ত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল; নবদ্বীপ একটী সামান্য পল্লীরূপ ধারণ করিল!

সিমুলিয়া ও বল্লালদীঘি আদি যে ঐ সময়েই নবদ্বীপ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে তাহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে প্রকাশিত আছে। যথা—

"প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আম্রপুরে॥
ওহে শ্রীনিবাস এই আম্রপুর স্থান।
বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম॥
ঐছে কত কহি সঙ্গে লৈয়া তিন জনে।
সিমুলিয়া গ্রামে প্রবেশিল কতক্ষণে।"

ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, নবদ্বীপ (মায়াপুর) ও সিমুলিয়া; ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থান বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং আদি স্থান গৌরাঙ্গের জন্মের বহুপূর্ব্বে নবদ্বীপ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। এবং সেই সেই স্থান তাহাদের নামানুসারে স্ব স্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, পরে ভাগীরথী দেবী ঐ সকল গ্রামকে সর্ব্বতোভাবেই নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

কিরূপে পশ্চিমের গঙ্গা পূর্ব্বদিকে আসিল তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি সিমুলিয়া সর্ব্বোত্তরে ছিল, তাহার দক্ষিণে একটী সোঁতা ছিল। ঐ সোঁতাই ভাগীরথীর পূর্ব্ব ধারার স্রোতহীন খাত। উহারই দক্ষিণে প্রকৃত নবদ্বীপ। পশ্চিমের ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিমোত্তর ভাগ গ্রাস করিতে করিতে আসিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরের ও সিমুলিয়ার দক্ষিণের ঐ সোঁতা দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বদিকে খড়িয়ার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ বাহিনী হন।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান নবদ্বীপ ভূমির পশ্চি... রথী প্রবাহিত ছিলেন। এবং রেনলড্ সাহেবের নক্সায় ১৭... মান নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত থাক... ১৭৫৩ হইতে ১৭৮৩ সালের মধ্যে পূর্ব্বদিকে...

আরম্ভ হয়। অনেক কাল উভয় দিকেই ভাগীরথী প্রবাহিত থাকেন। তাহা উক্ত সাহেবকৃত ১৭৮০ সালের নক্‌সা দৃষ্টে জানা যায়। ক্রমে পশ্চিমের ধারা স্রোতহীন হইয়া পূর্ব্বের ধারা প্রবল হইয়া পড়ে। পশ্চিমের গঙ্গা ভগীরথখাত, বা আদিগঙ্গা; বা বুড়ীগঙ্গা নামে অভিহিত হয়। গঙ্গানগর, গাদিগাছা, সিমুলিয়া মাঁজিদা আদি গ্রাম গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব্ব-পারে পড়িয়া নবদ্বীপ হইতে পৃথক হইয়া যায়। এ প্রদেশে গঙ্গার গতি যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই। যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই তাহা অনুমান করিতে পারেন। আজ ভাগীরথী যে গ্রামের উত্তর দিকে প্রবাহিতা আছেন, পরবৎসর তাহার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইলেন, আজ যে গ্রামের পশ্চিমে বাহিতা আছেন, পরবৎসর তাহার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইলেন। আজ যে গ্রামের নিকটে বাহিতা আছেন, পরবৎসর সে গ্রামে পরিত্যাগ করিয়া তাহার বহুদূরে গিয়া পড়িলেন ইত্যাদি ঘটনা প্রায়ই ঘটীয়া থাকে। নবদ্বীপের উত্তরে গঞ্জের ডাঙ্গা ও এদ্রাকপুর বলিয়া যে দুইখানি পল্লী আছে, তাহা ৬০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার দক্ষিণ দিকে ছিল; এখন উত্তর ধারে আছে। এইরূপে ভাগীরথী নবদ্বীপের উত্তরে প্রবাহিত হইয়া প্রথমত নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ভাগ গ্রাস করিতে করিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দক্ষিণ দিকে সরিয়া আসিতে লাগিলেন এবং অধিবাসীরা ক্রমশ উঠিয়া আসিয়া তাহার দক্ষিণ ভাগে বাস করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপের উত্তরে ব্রাহ্মণ পল্লী ছিল। প্রথমেই সেই পল্লীতে ভাঙ্গন ধরে অর্থাৎ দেয়াড় পড়ে। ঐ ব্রাহ্মণেরা নবদ্বীপের দক্ষিণে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু দেয়াড় হইতে উঠিয়া আসায় তাঁহারা যে পল্লীতে বাস করেন তাহা দেয়াড়াপাড়া নামে খ্যাত হয়। দেয়াড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র শিরোমণির বাটী গঙ্গার শিকস্ত হইলে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১১৮৭ সালে ২২শে ফাল্গুণ তারিখে দেয়াড়াপাড়ায় বাস করিবার নিমিত্ত সনন্দ পান। উহাতে আছে রামদেব বিশ্বাসের ফৌতী ভিটায় তাঁহাকে বাস করিতে দেওয়া হইলে আমরা সর্ব্ব প্রথমে ১১৮৭ বা ১৭৮০ (খৃঃ) সালে এই ভাঙ্গন দেখিতে পাই।

পল্লী ছিল ঐ পল্লীতেই গৌরাঙ্গের গৃহ ছিল, কথিত

আছে যে গৌরাঙ্গের একটী প্রস্তরের মন্দির ছিল। ঐ মন্দির গঙ্গার ভাঙ্গনে পতিত হওয়ায় সেবাইতগণ কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি মালঞ্চপাড়ায় আনীত হয় ঐ মন্দিরের কয়েক খণ্ড প্রস্তরও আনীত হয়। তাহার একএক খণ্ড অদ্যাপি ঐ স্থানে পড়িয়া আছে, ও এক খণ্ড বর্ত্তমান গৌরাঙ্গদেবের মন্দিরের দ্বারদেশে নিহিত আছে। এবং আর এক খণ্ডে বর্ত্তমান বুড়াশিবের আসন হইয়াছে। যাহা হউক ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম উত্তর ভাগ গ্রাস করিতে করিতে মালঞ্চ পাড়া ও গাবতলা পর্য্যন্ত আসিয়া পাগলাপীর তলার পশ্চিম দিয়া উত্তর বাহিনী হইয়া পূর্ব্বাংশ নবদ্বীপের উত্তর দিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া দক্ষিণ বাহিনী হন। অর্থাৎ তৎকালে ভাগীরথী নবদ্বীপের উত্তরে একটী ইংরেজী ∽ এস্ আকারে বাহিত ছিলেন, তদনন্তর ভাগীরথী মালঞ্চপাড়ায় উত্তরস্থ ঐ ধারা পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের পশ্চিমে যে অংশ গ্রাস করিয়াছিলেন তাহা দক্ষিণে রাখিয়া আবার উত্তরে প্রবাহিত হইলেন। যে অংশে গৌরাঙ্গের বাটী আদির চর পড়িয়াছিল তাহা নবদ্বীপের সামিল হইল।

বুঝিলাম বর্ত্তমান নবদ্বীপই প্রাচীন নবদ্বীপ, এবং এই নদীয়ার পশ্চিমেই ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। এবং আরো বুঝিলাম যে গৌরাঙ্গ দেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে সিমুলিয়া আদি স্থান নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন নবদ্বীপের কোন স্থলে গৌরাঙ্গের গৃহ ছিল তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গৌরগৃহ গঙ্গার ভাঙ্গনে বিলুপ্ত হইয়াছে। একথা যে আমি বলিতেছি, তা নয়, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। যাঁহারা সম্প্রতি মিঞাপাড়ায় শচীগৃহ নির্ণয় করিয়াছেন তাঁহারাও স্বীকার করেন। ৪র্থ বর্ষ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৪১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে

"আমাদের প্রভুর জন্ম স্থান মায়াপুর অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। জীবের সৌভাগ্যের নিমিত্ত তিনি গঙ্গার গর্ভ হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মিঞাপাড়ায় যে স্থানে গৌরগৃহ অবিস্কৃত হইয়াছে। উহা কখন গঙ্গাগর্ভস্থ হয় নাই। উহা আসলি ভূমি। দীঘি নামক দীঘির দক্ষিণ পাহাড। ঐস্থান গঙ্গার ভাঙ্গনে নষ্ট নাই। উহা বল্লাল সেনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন আছে। তবে গৌরগৃহ কোথায়?

একটী লুপ্ত স্থান উদ্ধার করিতে হইলে যে যে উপাদানের আবশ্যক গৌরগৃহ সম্বন্ধে তাহার কিছুই নাই। তবে কি গৌরগৃহ নির্ণীত হইবে না? অবশ্য হইবে। যদিও গৌরগৃহ সম্বন্ধে প্রাচীন চিহ্নাদি কিছু নাই তথাপি চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থই তাহার গৃহের বিশেষ সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা চৈতন্য ভাগবত পাঠে চৈতন্য দেবের বাটী সম্বন্ধে এই কয়টী বিষয় জানিতে পারি।

১। তাঁহার বাটী নবদ্বীপে ছিল।

২। গঙ্গার নিকটে তাঁহার বাটী ছিল। এমন কি তাঁহার নিজের একটী ঘাট ছিল।

৩। বার কোনার ঘাট তাঁহার বাটীর নিকটে ছিল।

৪। তন্তুবায় পল্লীর নিকটে তাঁহার বাটী ছিল!

৫। শ্রীধরের বাটী ও সর্ব্বজ্ঞের ঘরও তাঁহার বাটীর নিকটে জানা যায়।

১। চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গ্রন্থের সকল স্থলেই তিনি নদীয়া বা নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রাচীন কোন পুস্তকেই মায়াপুরের নাম গন্ধ নাই। বর্ত্তমান নবদ্বীপ যে সেই নদীয়া তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তবে বর্ত্তমান বসতি সীমার মধ্যে তাঁহার ভূমিষ্ট হওয়ায় স্থান টুকু নাই। তাই বলিতেছি যে, তাঁহার ভূমিষ্ট হওয়ায় সেই বিঘৎ পারমান ভূমিই যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে এই নবদ্বীপকে কেহ নবদ্বীপ না বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি, যে নদীয়া নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নগর যদি জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হয়, তবে সেই নবদ্বীপ আজো বর্ত্তমান। যেখানে গৌরাঙ্গদেব ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরে অদূরে চরের মধ্যে পড়িয়াছে। যদিও বর্ত্তমান নবদ্বীপের অনেক স্থল চিনাডাঙ্গা পাটভাঙ্গা আদি বলিয়া অভিহিত তথাপি মালঞ্চপাড়া আগমেশ্বরী পাড়া ও যোগনাথ শিবতলা আদি স্থান নিজ নবদ্বীপ বা নদীয়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ রামদুলাল পাঠকেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ...১১ অগ্রহায়ণ তারিখে যে ৩৩৬/০ বিঘা ভূমির সনন্দ প্রাপ্ত ...হার বসতভিটা ২/০ বিঘা নিজ নবদ্বীপ বলিয়া লিখিত ...না মালঞ্চ পাড়ায় বর্ত্তমান আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

উমেশচন্দ্র তর্করত্ন ঐ ভিটা দখল করিতেছেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব-পুরুষ নবদ্বীপে ১২/০ বিঘা জমি ব্রহ্মত্তর পান, তাহাতেও ঐ ভূমি নিজ নবদ্বীপ বলিয়া লিখিত আছে। ঐ ভূমিতে এক্ষণে তাঁহারা বাস করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত চৌধুরী দিগের বাটীর ১১৮১ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখের আর একখানি সনন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখন যেখানে মাধব বিদ্যারত্ন প্রভৃতির বাটী আছে; ঐ স্থান নদীয়ার বেদজ্ঞ পাড়া বলিয়া পরিচিত ছিল। উক্ত রাজারা যখন যাহাকে যে দলিল দিয়াছেন, তখন সেই সেই দলিলে উক্ত জমি যে স্থানে দিয়াছেন তাহা বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দলিলে নিজ নবদ্বীপ লিখিত থাকায় ঐ স্থান ও উহার উত্তরবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ নদীয়া বা নবদ্বীপ ছিল। ঐ অংশেই আগমবাগীশের ভিটা বর্ত্তমান আছে। অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মালঞ্চপাড়া, আগমেশ্বরীপাড়া ও তাহার উত্তরবর্ত্তী স্থান সকল নিজ নবদ্বীপ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং আমরা উহারই কোন অংশে গৌরাঙ্গের গৃহ ছিল দেখিতে পাই।

২। ভাগীরথীর নিকটে তাঁহার বাটী ছিল। যথা

" আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥ "

বর্ত্তমান ভাগীরথীতে গৌরাঙ্গের ঘাট কি মাধায়ের ঘাট কোন ঘাট নাই কিম্বা ঐ ঘাট থাকার কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতি নাই। অথচ এই ভাগীরথীতে নিশিন্দাতলার ঘাট প্রভৃতি অন্যান্য বিলুপ্ত ঘাটের জনশ্রুতি আছে। যদি গৌরাঙ্গের ঘাট এই গঙ্গায় থাকিত, তবে তাহার জনশ্রুতিও থাকিত। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে গৌরাঙ্গের সময়ে এই স্থানে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন না সুতরাং ঘাটেরও কিম্বদন্তী নাই পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। তাহা হইলে তাহার নিকটে অর্থাৎ নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে গৌরাঙ্গের বাটী থাকা দেখিতে পাই।

৩। বারকোণার ঘাট নবদ্বীপের পারঘাটও তাঁহার বাটীর নিকটে ছিল।

" মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাটীর সমীপ ॥

উপরোক্ত বর্ণনায় প্রকাশ পাইতেছে যে গৌরাঙ্গ বারকো[illegible]
নবদ্বীপ আসিয়া ছিলেন এবং ঐ ঘাট তাঁহার বা[illegible]

গৌরচন্দ্র যে ঘাট পার হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য কাঁটোয়া গিয়াছিলেন সেটীও পারঘাট এবং সেই ঘাটকে নদীয়া বাসীরা নিদয়ার ঘাট বলে।

"ওরে দেবী নিরদয়া হইয়ে যেমন।
নিমায়েরে করিলি পার সন্ন্যাস কারণ॥
তেঁই আজ হৈতে তোর নিরদয়া নাম।
অবনী ভরিয়া লোক করিবেক গান॥
আর তোর এ ঘাটের নাম আজ হৈতে।
নিরদয়া ঘাট হৈল জানিহ নিশ্চিতে॥" বং শি

ঐ নিদয়ার ঘাট ও ঘাটের উপরে নিদয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আজও বর্ত্তমান আছে। তাহা হইলে ঐ নিদয়ার ঘাট পার ঘাট সুতরাং বার-কোণার ঘাট ছিল। অতএব আমরা উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গৌরাঙ্গের বাটী দেখিতে পাই। এখন ঐ নিদয়া গ্রাম নবদ্বীপের উত্তর পশ্চিমাংশে পরপারে বর্ত্তমান আছে।

৪। গৌরাঙ্গ দেবের বাটী তন্তুবায় পল্লীর নিকটে ছিল ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা

"ভোজন অন্তরে করি তাম্বুল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥
কতক্ষণ যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥
উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্কারে॥ ১৬৭ চৈ ভা।

এই বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে গৌরাঙ্গ দেব বাটী হইতে বাহির হইয়াই প্রথমে তন্তুবায় পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন আবার যখন কাজিকে দমন করিয়া গৃহ প্রবেশ করেন তখনও তন্তুবায় পল্লীর পরেই গৃহ গমনের উল্লেখ আছে। যথা

"এই মত সকল নগরে শোভাক'রে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে।
[illegible] চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥

জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি—
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।" ৬৮২ চৈভা।

বর্ত্তমান গাবতলা ও তাহার উত্তরবর্ত্তী স্থান তন্তুবায় পল্লী ছিল। অদ্যাপি ঐ স্থানে তন্তুবায় দিগের পরিত্যক্ত ভিটা বর্ত্তমান আছে। এবং নবদ্বীপের অধিকাংশ তন্তুবায়গণ গাবতলার উত্তরবর্ত্তী চটীর মাঠের ভাঙ্গনে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন জানা যায়।

৫। শ্রীধরের বাটী মালঞ্চ পাড়ায় ছিল, শ্রীধর খোলা বিক্রয় ব্যাবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। খোলা বিক্রয় ব্যাবসা কখনই ব্রাহ্মণের ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে কেহ কাহারও ব্যবসায় অতিক্রম করিতেন না। তৎকালে খোলাকাটার কার্য্য গৃহাচার্য্য গণের ছিল ইহাতে বোধ হয় যে, শ্রীধর গৃহবিপ্র ছিলেন নবদ্বীপের জ্যোতিষী আচার্য্য গণের বর্ত্তমান মালঞ্চ পাড়ায় বাস। এবং তাঁহারা প্রাচীন কাল হইতে ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। গৌরাঙ্গদেব নগর ভ্রমণ কালে সর্ব্বজ্ঞের বাটীর পরেই শ্রীধরের বাটীতে গিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা

"তবে ইচ্ছাময় গৌর চন্দ্র ভগবান।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়াণ॥
সর্ব্বজ্ঞ বলয়ে তুমি চলহ এখনে।
বিকালে বলিব মন্ত্র জপি ভাল মনে॥
ভাল ভাল বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥"

চৈতন্য ভাগবতে, গৌরাঙ্গ দেবের নগর ভ্রমণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, নবদ্বীপের অধিবাসীগণ, সামাজিক নিয়মানুসারে এক এক জাতি এক এক পল্লীতে বাস করিতেন। উপরোক্ত বর্ণনায় শ্রীধরের বাটীর পরেই সর্ব্বজ্ঞের বাটী যাওয়ার উল্লেখ আছে। সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ গৃহাচার্য্যের কার্য্য আজ পর্য্যন্ত আচার্য্য গণেরই আছে পঞ্জিকাদি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনায় নবদ্বীপের আচার্য্যগণ বিশেষ বিখ্যাত। বর্ত্তমান মালঞ্চ পাড়ায় ইহারা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছেন। অতএব শ্রীধরের বাটীর পরেই সর্ব্বজ্ঞে উল্লেখ থাকায় শ্রীধরের বাটীও মালঞ্চ পাড়ায় থাকা জানি
অতএব পশ্চিমে ভাগীরথী উত্তরে নিদয়া দক্ষিণে তন্তুবায়

ইহারই মধ্যে কোন স্থলে আমরা গৌরগৃহ থাকা দেখিতে পাই। ঐ স্থানেই গৌরগৃহ ছিল তাহা পরবর্ত্তী কালে সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ও নির্ণয় করিয়া ছিলেন।

গৌরগৃহ লুপ্ত হইবার প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব সুতরাং চৈতন্য দেবের পরম ভক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ চৈতন্য দেবের জন্ম ভূমি বলিয়াই তিনি নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে গৌরগৃহ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। নবদ্বীপ নিবাসী ৺রামকানাই ভাদুড়ী উক্ত দেওয়ান মহাশয়ের নবদ্বীপের বাটীর সরকার ছিলেন। লেখক উক্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলেন যে তিনি যে সময়ে গৌরগৃহ আবিষ্কারে প্রবিত্ত হন, সে সময়ে গৌরাঙ্গদেবের গৃহ দেখিয়াছিলেন এমন অনেক লোক বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সেই সকল লোকের সাহায্যে এবং তৎকালের চিঠাদির দ্বারা ঐ স্থান নির্ণয় করেন। এবং সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ৺রাধা গোবিন্দজীর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও চৈতন্য দেবের গৃহাদির, পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা কোন মান চিত্র ছিল না। তথাপি যাঁহারা গৌরাঙ্গের গৃহ দেখিয়াছিলেন এমন লোকের সাহায্যে ঐ স্থানটী নির্ণীত হওয়ায় এবং চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনায় নির্দ্দিষ্ট স্থানের সহিত অনেক ঐক্য হওয়ায় তাঁহার আবিস্কৃত স্থানটী আমরা অনেকাংশে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পরেই ভাগীরথী আবার ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন এবং তাহাতেই ঐ মন্দির ভাঙ্গিয়া গঙ্গা গর্ভে পতিত হয়। আবার যখন ভাগীরথী উত্তর দিকে সরিয়া যান তৎকালে ঐ মন্দির বাহির হইয়া পড়ে। সে আজ ২০।২৫ বৎসর হইবে। ঐ মন্দির বাহির হইলে অনেকেই দেখিয়াছেন। ঐ মন্দির বর্ত্তমান মালঞ্চপাড়ার উত্তর ও নিদয়ার দক্ষিণে প্রোথিত আছে। আমরা চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে আমরা ঐ স্থান বা উহার নিকটবর্ত্তী উ[illegible] স্থান গৌরাঙ্গ দেবের গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

[illegible]নটী চৈতন্য দেবের গৃহ বলিয়া নির্ণীত হইল অর্থাৎ বর্ত্তমান [illegible]ব ঐ স্থানটী যে গৌরাঙ্গের গৃহ ছিল, তাহা চৈতন্য ভাগ-[illegible] আদি গ্রন্থের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়।

চৈতন্য ভাগবতের কাজি উদ্ধার প্রকরণে যেরূপ বর্ণিত আছে। তদনুসারে ভ্রমণ করিলে ঐ স্থান হইতে এইরূপে ভ্রমণ করা যায়। যথা প্রথমে বাটী হইতে বাহির হইয়া অগ্রে পশ্চিম মুখে আপনার ঘাটে, পরে উত্তর মুখে মাধায়ের ঘাটে, তদন্তর উত্তর মুখে বারকোণার ঘাট (বর্ত্তমান নদীয়ার ঘাট) পর্য্যন্ত গিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর মুখে গঙ্গানগর তথা হইতে উত্তর মুখে সীমুলিয়া পরে পূর্ব্ব ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণ মুখে কাজী পাড়া হইয়া দক্ষিণ মুখে আসিয়া পরে পশ্চিম মুখে শাঁখারীপাড়া ও তদন্তর পশ্চিম দক্ষিণ মুখে তন্তুবায় পল্লী ও তদন্তর মালঞ্চপাড়ায় শ্রীধরের বাটী হইয়া উত্তর মুখে স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাটী হইতে কাজি বাটী যাইতে হইলে যে সহজ পথে পাওয়া যায় সেই পথ দিয়া গিয়া অপর পথ দিয়া আসিয়াছেন উত্তম উপলব্ধি হইতেছে।

এখানে একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মৎ প্রণীত "নবদ্বীপ মহিমা" নামক পুস্তকের নবদ্বীপ সম্বন্ধীয় বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার কোন কোন বিষয় অনৈক্য থাকা দৃষ্ট হইবে। তাহার কারণ এই যে আমি তৎকালে অনেক বিষয় দূরদর্শী-অভিজ্ঞ-গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের "নবদ্বীপ মাহাত্ম্য" নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন প্রাচীন পুস্তক, প্রাচীন দলিল ও স্থানীয় সংবাদ আদির দ্বারা সেই সেই বিষয় ভ্রান্তিমূলক জানিয়াছি। যদি কখন নবদ্বীপ মহিমার পুনঃসংস্করণ হয়, তাহা সংশোধন করিয়া দিব।

শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৬

গীত——নট।

জানিও রে গুণনিধি!
তুয়া বিনে আর নাহি জানি॥ ধ্রু।
মাঠে থাকে, ধেনু রাখে, গলে দোলে মালা।
তুমি ত সুন্দর রাধে! কানু কেন কালা॥
হাতে শঙ্খ, কাণে সোণা, পরি মোহন সাড়ী।
কর আঁখি স্বনে ডাকে রাধিকা সুন্দরী॥
যে কাজে যমুনার ঘাটে কার সঙ্গে যাইব।
কে দিবে আনিয়া শ্যাম, কোথা গেলে পাইব॥
বাপে দিল জনম, জননী দিল ক্ষীর।
কহেন মর্ত্তুজা আলি জনমের ফকির॥

২৭

গীত——বিভাস।

ঝামর দেখি নন্দের কানাই।
ঝামর কেন দেখি॥ ধ্রু।
চূড়ার উপরে, মালতীর মালা,
প্রভাতে নীহার ঝরে।
পীত ধড়াগাছি, ধরিতে ধরিতে,
ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে॥
রঙ্গের রঙ্গিয়া, রজনী জাগিয়া,
আছিলাম বিবিধ আশে।
হাঁটিয়া যাইতে, ঢলিয়া পড়ল,
মদন মোহন লাসে॥

অপ্রকাশিত।

(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সুবর্ণবণিক্-বৈশ্য। শ্রীগোপালচন্দ্র পাল দ্বারা প্রকাশিত। হুগলী সাবিত্রী যন্ত্রে মুদ্রিত। আমাদের দেশের সুবর্ণবণিক্‌গণ ক্রমশঃ ধনে, মানে ও বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিতেছেন। দিন দিন তাঁহাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং হিন্দুসমাজে গণ্য মান্য হইবার প্রয়াস জন্মিতেছে। এই নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ মল্লিক মহাশয় এই পুস্তক খানি রচিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে মল্লিক মহাশয় শাস্ত্রীয় বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে সুবর্ণবণিক্‌গণ পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলেন এবং বৈশ্য আচার পালন করিতেন। কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও কুসীদগ্রহণ বৈশ্যের এই চারিটী বৃত্তি ছিল; সুবর্ণবণিক্‌গণ ক্রমশঃ কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অপর দুই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা বিনাপরাধে রাজা বল্লাল সেনের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। বল্লালের চরিত্র ও কিরূপে সুবর্ণবণিক্ গণ তাঁহার বিরাগভাজন হইলেন তাহা গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। উহা পাঠ করিলে বল্লালের উপর ঘৃণা জন্মে। গ্রন্থকার ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে যদি দুই এক জন সুবর্ণবণিক্ দোষ করিয়া থাকেন তাহাতেও সমস্ত জাতিকে পতিত গণ্য করা বিচার সঙ্গত হয় নাই। রাজা বল্লাল সেনের বিচার বর্ত্তমান বিচারনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই পতিত জাতি পুনরায় সমাজে বৈশ্য বলিয়া কিরূপে পরিগণিত হইবেন ইহাই এখন স্বজাতিহিতৈষী সুবর্ণবণিক্ গণের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। তাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা ও সভা সংস্থাপন করিতেছেন। পরস্পরের মধ্যে একতাস্থাপনের বিশেষ উদ্যোগ হইতেছে। এই সৎকার্য্যে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। আমরা গ্রন্থকারকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় দক্ষতা, অভীজ্ঞতা ও স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার স্বজাতীয় ব্যক্তি[illegible] সহকারে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবে[illegible] প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া স্বজাতির গৌরববৃদ্ধি বিষয়ে[illegible] করিবেন।

২। অশ্রুমালা। শ্রীকায়কোবাদ প্রণীত। গ্রন্থকার একজন মুসলমান। তিনি এই কবিতাগ্রন্থে স্বীয় কবিত্বের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ভাষা অতীব মধুর, ভাব যারপর নাই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। আমরা গ্রন্থকারের নিকট অনেক প্রত্যাশা করি। গ্রন্থকারের বাঙ্গালা ভাষায় রচনা শক্তি প্রশংসনীয়। ইনি যদি মুসলমান সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বঙ্গানুবাদ করেন তবে বঙ্গীয় মুসলমান গণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। এদেশীয় মুসলমানগণ পারস্য কিম্বা আরবী ভাষায় একপ্রকার অনভিজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি যদি উক্ত ভাষার গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ করেন তবে মুসলমানসমাজ বড়ই উপকৃত হন। আশা করি গ্রন্থকার আমাদের এই কথায় কর্ণপাত করিবেন।

৩। আদর্শ বিশ্বাসী। শ্রীরাজেন্দ্রলাল সিংহ প্রণীত মূল্য ৵০আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মার্কিণ দেশের বালক চার্লি কুলসনের জীবনচরিত বিবৃত হইয়াছে। এই বালক ১৭ বৎসর বয়সে যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যল্পকাল পরেই মানবলীলা সংবরণ করে। ঈশ্বরে ভক্তি ও মাতৃভক্তিতে বালকের হৃদয় পূর্ণ ছিল। বালকের এতদূর সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব ছিল যে বিনা ক্লোর-ফরমে হস্তপদাদিচ্ছেদন করিতে দিয়াছিল। ডাক্তার একজন নাস্তিক ইহুদি ছিলেন তিনি তাহার মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়া ছিলেন। এইরূপ সদ্গ্রন্থ যতই প্রচারিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। ভাষা বেশ সরল হইয়াছে।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৪র্থ ভাগ। } মাঘ, ফাল্গুন, ১৩০৩ সাল। { ১০, ১১শ সংখ্যা।

মধুময়ী গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ।

ক্ষেত্র কি ?—জ্ঞান কি ?—অজ্ঞান কি ?—জ্ঞেয় কি—
প্রকৃতি পুরুষ—কে কিরূপে সাধন করেন—নাশে
অবিনাশ—দর্শন—যোগীর ব্রহ্মত্ব।

অর্জ্জুন কহিলেন—

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ—এসব
জ্ঞান, জ্ঞেয়, কিযে মোরে কহ তা কেশব। ১

শ্রীভগবান কহিলেন—

শরীর কে "ক্ষেত্র" বলে ; শরীর যে জানে
"ক্ষেত্রজ্ঞ" বলেন তাকে তত্ত্বজ্ঞানিগণে। ২
সমুদয় ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া,
ভারত, আমিই আছি "ক্ষেত্রজ্ঞ" হইয়া।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থ পৃথক যে জ্ঞান,
মম অভিমত সেই মুক্তির নিদান। ৩
সে ক্ষেত্রের স্বরূপ কি, কি ধর্ম্ম তাহার,
ভিন্নতা কিরূপ তবে, কিরূপ বিকার,—

প্রকৃতি-পুরুষ-রূপ যাহা হ'তে হয় ;
ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি, কি প্রভাবময়,
সংক্ষেপে শ্রবণ কর ; যাহা ঋষিগণ ৪
বেদবিধি যুক্তিযোগে করেন কীর্ত্তন। ৫

পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র তাহার, — *
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব এই কহিনু তোমায় ; ৬
ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ, মনোবৃত্তিময়"
চেতনা, শরীর, ধৈর্য্য — ইন্দ্রিয়বিকার
সমুদয় নিয়া "ক্ষেত্র" কহিলাম সার। ৭

অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, ধৈর্য্য, সবলতা,
অহিংসা, অনহঙ্কার, শৌচ, নিষ্ঠা তথা, ৮
সংযম, বৈরাগ্য, গুরুসেবা, মন দিয়া
আলোচনা জন্ম মৃত্যু দুঃখদোষ নিয়া, ৯
পুত্রদার গৃহাদিতে লোভত্যাগ, আর
তাহাদের সুখে দুঃখে মননির্ব্বিকার, ১০
ইষ্টানিষ্টে সমচিত্ত, শুদ্ধদেশে বাস,
আমাতে একান্তা ভক্তি, অটল বিশ্বাস,
প্রকৃত লোকসমাজে সর্ব্বদা বিরাগ, ১১
মোক্ষে লক্ষস্থির, আত্মতত্ত্বে অনুরাগ, —
"জ্ঞান' বলি উক্ত হয় এই সমুদয় ;
বিপরীত যাহা তাহা "অজ্ঞান" নিশ্চয়। ১২

"জ্ঞেয়" শুন, মোক্ষহেতু অনাদি বিদিত,
সদসৎ নহে, সর্ব্ববিষয় অতীত, ১৩
সেই পরব্রহ্ম ; হস্ত মস্তক নয়ন
সর্ব্বত্র সমান যার, সর্ব্বত্র শ্রবণ, ১৪

---

*ইন্দ্রিয় — পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়।
পঞ্চতন্মাত্র — রূপ, রব, গন্ধ, রস, স্পর্শ।

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাস, কিন্তু সেই মত
সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাধারভূত,
অথচ নিঃসঙ্গ সদা, ত্রিগুণ পালক
অথচ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক ; ১৫
স্থাবর জঙ্গম তিনি বহিরন্তঃস্থিত,
অজ্ঞেয় দূরস্থ, জ্ঞানে নিত্যসন্নিহিত ১৬
অভিন্ন কারণরূপে, বিভক্ত কার্য্যেতে,
সেই "জ্ঞেয়" সর্ব্বভূতে পালক স্থিতিতে,
প্রলয়েতে সর্ব্বগ্রাসী, সৃষ্টিতে আবার
আপনি উৎপন্ন হন বিবিধ প্রকার। ১৭

তিনিই জ্যোতির জ্যোতি অজ্ঞানের পর,,
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য, নিয়ন্তা সবার। ১৮

ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই কহিনু তোমায়,—
জানিয়া আমার ভক্ত লভেন আমায়। ১৯

প্রকৃতিপুরুষ পার্থ অনাদি উভয়,
প্রকৃতি হইতে গুণবিকার উদয়। ২০

দেহেন্দ্রিয় বিষয়ের প্রকৃতি কারণ,
পুরুষ ভোগের হেতু জীবরূপ হন ;
জীবরূপী সে পুরুষ দেহে অবস্থিত,
প্রকৃতির দেহে ভোগ করেন নিয়ত ; ২১
সদসৎ ইন্দ্রিয়ের সংসর্গে নিশ্চয়,
সদসৎজন্ম প্রাপ্তি পুরুষের হয়। ২২
আদিতে জানিবে কিন্তু পুরুষ যে জন
প্রকৃতির গুণযুক্ত কভু নাহি হন ;
সাক্ষী ভর্ত্তা মহেশ্বর পরমাত্মা তিনি। ২৩

পুরুষ-প্রকৃতি হেন,—জানেন তা যিনি,
যদিও করেন তিনি বিধি উল্লঙ্ঘন,
আর তাঁর নাহি জন্ম, শান্তি প্রাপ্ত হন। ২৪

ধ্যানেতে করেন কেহ আত্মার দর্শন ;
প্রকৃতি-পুরুষ কেহ ভেদানুশীলন
করিয়া দেখেন আত্মা, কেহ সযতনে
করেন অষ্টাঙ্গযোগ ; কর্ম্মযোগিগনে
নিষ্কাম সে কর্ম্মযোগ করে আচরণ ;
হেন রূপে করে সবে আত্ম দরশন। ২৫

কেহ বা না জানি তত্ত্ব, আচার্য্যের পাশে
শুনি করে উপাসনা, মুক্ত হয় শেষে। ২৬

স্থাবর জঙ্গম পার্থ যাকিছু সকল,
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে উৎপন্ন কেবল। ২৭

সর্ব্বজীবে সম স্থিতি, নাশে অবিনাশ
যে দেখে সে দেখে সত্য আত্মার প্রকাশ। ২৮

আত্মদর্শী নষ্ট নাহি হন অবিদ্যায়,
চরমে পরমাগতি পান ধনঞ্জয়। ২৯

প্রকৃতিই কর্ম্মশীলা, আত্মা কর্ম্মহীন—
যে দেখে সে দেখে সত্য, জ্ঞানেতে প্রবীন। ৩০

ভূতগণ ভিন্নভাব একস্থ দর্শন,
সৃষ্টিতে বিস্তরে তার দেখেন যখন,
তখন সে যোগীবরে ব্রহ্ম বলা যায়। ৩১

অনাদিত্ব নিগুর্ণত্বহেতু ধনঞ্জয়,
পরমাত্মা অধিকারী ; শরীরে থাকিয়া
কিছু না করেন তিনি নির্লিপ্ত বলিয়া। ৩২

সূক্ষ্মাকাশ সর্ব্বগত,—পঙ্কে লিপ্ত নয়,
দেহে থাকি আত্মা তথা দোষী নাহি হয়। ৩৩

হে ভারত, একাদিত্য বিশ্ব উদ্ঘাটক,
সেইরূপ এক ক্ষেত্রী ক্ষেত্র প্রকাশক। ৩৪

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ—মোক্ষের উপায়,
প্রকৃতি হইতে যারা জানিবারে পায়,
তাহারা ভরতর্ষভ, যায় ধীরে ধীরে
আমার আনন্দধাম প্রকৃতির পারে! ৩৫

ইতি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গ কোথায় ?

"This world is not a fleeting show
For man's illusion given;
He that hath soothed a widow's woe
Or wipe an orphan's tear, doth know
There is something here of heaven."

এক ধর্ম্মমন্দিরে আচার্য্য মহোদয় স্বর্গের বিষয় উপদেশ প্রদান করিতে ছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক যুবক উপস্থিত ছিলেন। এই যুবক এক ধনবানের পুত্র; জনকজননীর মৃত্যুর পর ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। একে যৌবন কাল, তায় অতুল বিভবের অধিকার-প্রাপ্তি; সুতরাং যৌবন-স্বভাব-সুলভ যাবতীয় দোষে যুবক-জীবন কলুষিত হইয়া পড়ে। তিনি অসার রঙ্গরসে ও বিলাস তরঙ্গে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; সুখ বসন্তের অনুচর সহচরবর্গকে লইয়া বারবিলাসিনী-সহবাসে ঘৃণিত ও জঘন্য আমোদ প্রমোদে, নৃত্যগীত হাস্য রসিকতায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রবৃত্তির তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেও কিন্তু যুবক কিছুতেই হৃদয়ে শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। কালক্রমে তাহার অন্তঃকরণে শান্তির পিপাসা এত প্রবলা হয় যে তিনি উচ্ছৃঙ্খলকারী সহচরবর্গের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসমাজে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন। ধর্ম্মমন্দিরে তিনি অন্যান্য উপাসকবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হন, ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ মননে দিন দিন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে থাকেন। তিনি যতই ভগবৎ-পূজায় নিযুক্ত হইতে লাগিলেন, যতই ভগবৎ-চিন্তা ও ধ্যানধারণায় মনপ্রাণকে বিনিয়োগ করেন, ততই তাহার শান্তির পিপাসা বলবতী হইতে লাগিল। যুবকের মানসিক অবস্থা যখন এই প্রকার সেই সময়ে এক দিবস ধর্ম্ম-মন্দিরে পূর্ব্ব কথিত মত স্বর্গ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইতেছিল। তিনি উপদেশ শ্রবণ করিয়া আচার্য্যদেবকে কতকটা বিদ্রূপচ্ছলেই জিজ্ঞাসা করেন—"মহাশয়! আপনারা 'স্বর্গ' 'স্বর্গ' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, স্বর্গ জিনিসটা কি, আমাকে দেখাইতে পারেন?

আমি স্বর্গের ছবি দেখিবার জন্য অনেক অর্থব্যয় করিয়াছি; সুরাদেবীর অনেক স্তবস্তুতি করিয়াছি, বহু বারবিলাসিনীর চরণ বন্দনা করিয়াছি, অনেক সুহৃদসখার পরিচর্য্যা করিয়াছি, কিন্তু সমস্তই বৃথা! সুরা কাল হলা হল, বারবিলাসিনীগণ বিষেভরা ভুজঙ্গিনী, সুখ-সহচর অনুচরগণ সৎপথের কণ্টক-স্বরূপ। তাহার পর ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করিয়াও দেখিতেছি ভগবৎ-জ্ঞান যতই বর্দ্ধিত হইতেছে, শান্তির পিপাসা, স্বর্গরাজ্য দেখিবার লালসা ততই প্রবলতর হইতেছে। কিন্তু কই, স্বর্গত দেখিতে পাইতেছি না। স্বর্গ সম্বন্ধে আমার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে ঠিক করিয়া বলুন দেখি, প্রকৃত পক্ষে কি স্বর্গের অস্তিত্ব নাই, স্বর্গ কি একটা কাল্পনিক পদার্থ? যদি কাল্পনিক হয়, তবে আপনারা ধর্ম্মোপদেশক হইয়া সরলপ্রাণ মানব-মণ্ডলীকে স্বর্গের নামে বিভ্রান্ত করেন কেন?" ধর্ম্মাচার্য্য যুবককে ধনবানের পুত্র বলিয়া জানিতেন, তিনি তাহাকে ধর্ম্ম-পিপাসু দেখিয়া তাহার প্রশ্নোত্তরে বলেন, "তুমি যদ্যপি স্বর্গরাজ্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাক, তবে স্বর্গরাজ্য নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। আমিও তোমাকে স্বর্গরাজ্য দেখাইতে পারিব।"

যুবক বলিলেন—"আমি স্বর্গরাজ্য দেখিবার জন্য বস্তুতই ব্যাকুল হইয়াছি, আপনি অনুকম্পা বিতরণে আমাকে স্বর্গরাজ্য দেখান।"

আচার্য্য প্রত্যুত্তর করেন—"তোমার প্রচুর অর্থ আছে, তাহার কিয়ৎ অংশের বিনিময়ে তুমি কিছু খাদ্যসামগ্রী, কিছু বস্ত্র এবং কিছু ঔষধপথ্য ক্রয় করিয়া অমুক দিবসে আমার কাছে আসিবে, আমি তোমাকে স্বর্গ দেখাইতে লইয়া যাইব।"

যুবক তথাস্তু বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন এবং নিজাবাসে গমন করিয়া প্রচুর পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র, ঔষধ এবং পথ্য সংগ্রহ করেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তিনি সকল কার্য্য পরিহার করিয়া উপরোক্ত দ্রব্য সমূহ লইয়া ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হন। ধর্ম্মাচার্য্যও তাঁহাকে লইয়া স্বর্গ দর্শনে বহির্গত হন।

আচার্য্যদেব যুবককে লইয়া এক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নগরে উপস্থিত হন। তথায় অসংখ্য নরনারী বালকবালিকা অনাহারে কঙ্কালসার ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে; ক্ষুধার জ্বালায় গর্ভধারিণী জননী স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া

ক্রোড়স্থ জীবিত শিশুসন্তানের মাংস ভক্ষণে জঠরানল নির্ব্বাণ করিতেছে; পতি পত্নীর, পত্নী পতির, পিতা পুত্রের, পুত্র পিতার, মাতা কন্যার এবং কন্যা মাতার রক্তপান করিতেছে, চারিদিকে হাহাকার ও আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, লজ্জা নিবারণের জন্য নরনারী মলিন জীর্ণবাসও পাইতেছে না, তাই মাতাকে যুবক পুত্রের কাছে, যুবক পুত্রকে মাতার কাছে, যুবতী কন্যাকে পিতার কাছে, পিতাকে যুবতী কন্যার কাছে, পুত্রবধুকে শ্বশুরের কাছে এবং শ্বশুরকে পুত্রবধুর কাছে উলঙ্গ ও উলাঙ্গিনী থাকিতে হইয়াছে। অনশনে কত লোক উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে, রোগশয্যায় কত নরনারী ঔষধ পথ্যের অভাবে অকালে কালকবলিত হইতেছে। জীবিতে ও মৃতে কোলাকুলি হইতেছে। চারিদিকে হা হুতাশ! চারিদিকে দীর্ঘশ্বাস! চারিদিকে আর্ত্তনাদ! চারিদিকে ক্রন্দনের রোল। এই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে যুবকের হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল, তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে প্রবল বেগে বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি কাতরতার সহিত আচার্য্যদেবকে বলেন, "মহাশয়! এ কোথায় আনিলেন? স্বর্গের দৃশ্য দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া এই ভীষণ হাহাকারের রাজ্যে নরকের আবর্ত্তে কেন আনয়ন করিলেন? আমিত কখনও আপনার শত্রুতাচরণ করি নাই, তবে আমাকে এইরূপ নিদারুণ যন্ত্রণা দিবার জন্য কেন এখানে আনয়ন করিলেন?"

আচার্য্য উত্তর করেন—"বৎস! উতলা হইওনা। দুঃখী নরনারীর কষ্ট যাতনা যখন তোমার হৃদয় মনকে ব্যথিত এবং তোমার নয়নাশ্রু নির্গত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন ত তুমি স্বর্গের সোপানে অধিরোহণ করিয়াছ। আর একটু অগ্রসর হইলেই ত তুমি স্বর্গ দেখিতে পাইবে। তোমার সঙ্গে যে খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিয়াছ, সে সমস্ত এই ক্ষুধিত নরনারীগণের মধ্যে বিতরণ কর; যে সমস্ত নব বস্ত্র আনয়ন করিয়াছ সে সমস্ত এই নরনারীকে লজ্জা নিবারণের জন্য প্রদান কর; যে সমস্ত ঔষধ পথ্য আনিয়াছ, তাহা রুগ্ন আতুরগণকে সেবন করাও।" যুবক তাহাই করিলেন। ক্ষুধিতকে খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং রোগীকে ঔষধপথ্য প্রদান করিয়া যুবক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন এবং নয়ন নিমীলন করিয়া বিশ্বস্রষ্টাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে গিয়া অন্তরের অভ্যন্তরে স্বর্গের প্রতিবিম্ব

সন্দর্শনে মোহিত হইলেন। অবসর বুঝিয়া আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বৎস! স্বর্গরাজ্য দেখিতে পাইলে?" যুবক উত্তর করিলেন, "আপনাকে শত ধন্যবাদ, আপনার অনুকম্পায় স্বর্গরাজ্য জাজ্জ্বল্যমান দেখিলাম।" তৎপরে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত দীনদুঃখীদিগের সাহায্যার্থ স্বীয় সঞ্চিত সমস্ত অর্থ উৎসর্গ করিয়া অপরিসীম আনন্দপরাসুখ-আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন।

উপরোক্ত সত্যমূলক আখ্যায়িকা হইতে আমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে আত্মপ্রসাদ লাভই আনন্দ ও স্বর্গসুখ। আত্মপ্রসাদ কেমন করিয়া লাভ করিতে হয়, তাহাও আমরা উপরোক্ত ধনী সন্তানের দৃষ্টান্তে কতকটা বুঝিতে পারি। উপরোক্ত ধনীযুবকের দৃষ্টান্তে এবং আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে "বিষয়সুখে মন তৃপ্তি না মানে।" আমরা যতই বিষয়সুখ সম্ভোগ করি, আমাদিগের বিষয় বাসনা, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বর্দ্ধিত হয়। পক্ষান্তরে ধন ঐশ্বর্য্য আজ আছে, কাল নাই। "আজ যে রাজচক্রবর্ত্তী, কাল তার ভিক্ষাবৃত্তি, হ'তেছে অবলম্বন," জগতে এবম্প্রকার দৃশ্য ত আমরা নিত্য সন্দর্শন করিতেছি। ধন-ঐশ্বর্য্যেই এ সংসারে মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি; যাহার ধন ঐশ্বর্য্য নাই, তাহার মানসম্ভ্রমও নাই; যাহার ধন ঐশ্বর্য্য পরিসমাপ্ত হয়, তাহার মানসম্ভ্রমেরও শেষ হয়। তবেই ধন মানের সুখ অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর। ধন মান উপার্জ্জনে মানব স্থায়ী সুখ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং ধনমান লাভে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না। এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয় এবতে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥" গীতা ৫।২২

অর্থাৎ, "বিষয় জনিত যে সকল সুখ সে সকল নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং আদি ও অন্তবিশিষ্ট, অর্থাৎ অনিত্য, এজন্য বিবেকী ব্যক্তি সে সকলে রত হন না।" কপিলবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহ বিষয়বাসনা পরিহার পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিলে ছন্দক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলেন—

"বিবর্জিতাঃ সর্পশিরা যথা বুধৈ
র্বিগর্হিতা মীতঘটা যথা শুচিঃ।

বিনাশকাঃ সর্ব্ব সুখস্য ছন্দক
জ্ঞাত্বা হি কামান্ ন বিজায়তে রতিঃ ॥”

ললিত বিস্তর ১৫।১০।১

অর্থাৎ, “পণ্ডিতেরা যেমন সর্পমস্তক পরিহার করেন, অশুচি মুত্রিত ঘট সকল যেমন অতি গর্হিত, হে ছন্দক ! বিষয় বাসনা সেইরূপ ঘৃণিত, পরিহার্য্য এবং সর্ব্ববিধ সুখের বিনাশক, এইরূপ জানিয়া আর তাহাতে আমার অনুরাগ হয় না।” বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে লইয়া আত্মা অনেকটা তৃপ্তিলাভ করে বটে, কিন্তু তাহাতে ত স্থায়ী শান্তিসুখ নাই। স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি ত আমাদিগের অনন্তকালের সাথী নহে। শৈশবে দীর্ঘিকার তীরে গোচারণের মাঠে, বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত কাননের অভ্যন্তরে যে সহচর সহচরীগণের সহিত আনন্দে খেলাধুলা করিয়াছি তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ত মর্ত্তের অভিনয় শেষ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। যে জনকজননীর স্নেহভালবাসায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, মর্ত্তের মলিন মৃত্তিকায় এখন ত তাঁহারা আর পদার্পণ করেন না। আজ যে প্রণয়িনীর ভালবাসায় বিমুগ্ধ হইয়া সংসারমরুভূমে নন্দনকাননের সুখসম্ভোগ করিতেছি বলিয়া মনে করিয়া থাকি, কাল তাহার অদর্শন জনিত বিরহ সন্তাপে পুড়িতে হইবে। আজ যে পিতামাতা শিশুসন্তানের আধস্বরে শ্রবণ শীতল করিতেছেন, কাল তাঁহাদিগকে তাহার মৃতশরীরে শোকাশ্রুপাত করিতে হইতেছে। অতএব ধন, মান, আত্মীয় স্বজন, পুত্রকলত্র পরিবেষ্টিত থাকিলেই যে সুখ ও শান্তি লাভ হয়, তাহা নহে। যে সুখশান্তি অনন্তকাল স্থায়ী নহে, তাহাকে আমরা কেমন করিয়া সুখশান্তি বলিয়া গণ্য করিতে পারি ? যে সুখ সুখের কারণ, যে সুখ পুনরায় সুখকেই আনয়ন করে, তাহাই প্রকৃত সুখ। যে সুখ দুঃখের জনক তাহাকে কেমন করিয়া সুখ নামে অভিহিত করিবে ?

তবে সুখশান্তি লাভ হয় কিসে ? সুখশান্তির পথ অতীব সূক্ষ্ম। হিন্দুশাস্ত্র এ পথ ক্ষুরধারের ন্যায় ভয়াবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও উক্ত আছে মহর্ষি ঈশা শৈলশেখরে উপদেশ দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন—“Strait is the gate, narrow is the way which leadeth unto life” (Mathew VII. 14)

অর্থাৎ, সংসারপঙ্কে নিমজ্জিত মৃত প্রাণকে সজীব করিবার যে পথ তাহা অতীব সঙ্কীর্ণ। যুগযুগান্তর ধরিয়া কঠোর তপস্যাতেও সুখশান্তির রাজ্যে গমন করা সুদূর পরাহত। প্রাচীনকালের বিধিব্যবস্থায় মোক্ষ লাভের পথ সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ বলিয়া কথিত হইলেও কলিকালে—নূতন বিধানে—দয়াময় হরি জীবের ধর্ম্মে মতিরতি শিথিল দেখিয়া জীব তরাইবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সে উপায় "নামে রুচি আর জীবে দয়া"। যাঁহা হইতে জীবন পাইয়াছি, যাঁহার স্নেহ ভালবাসায় এই মর্ত্তধামে জীবিত রহিয়াছি, লালিতপালিত হইতেছি, জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়াছিলেন, যিনি ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসায় জল দিতেছেন, যাঁহা হইতে ধন জন আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র পরিবার লাভ করিয়াছি, এমন উপকারী বন্ধুর প্রতি কাহার না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত? এমন হৃদয়ের ধনের নাম জপমালা করা কাহার না সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য? কিন্তু মানব অকৃতজ্ঞ, নরাধম। বিশ্বনিয়ন্তার এই সমস্ত উপকারের বিষয় স্মরণ করে না। মানব সংসারপঙ্কে, পাপকলঙ্কে ডুবিয়া বিধাতার মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে পায় না, তাঁহার মঙ্গল বিধান বুঝিতে পারে না। সংসার কোলাহল, পাপ হলাহল যাহাকে ঘেরিয়া রাখিযাছে, তাহার পক্ষে বিশ্বাসীর ন্যায় ভগবানের নামে রুচি হওয়া সহজ নহে। ভগবানের মধুময় নামে রুচি করিবার পূর্ব্বে মানব মাত্রেরই নিজের সহিত ভালরূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আমার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না অবিশুদ্ধ, পবিত্র না অপবিত্র, সারথির শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় আমার ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত হইয়াছে কি না, ইহা ভালরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি দেখি যে নামে রুচি হইতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে যে আমার ইন্দ্রিয় দমন হয় নাই, আমার অন্তঃকরণ এখনও অবিশুদ্ধ ও অপবিত্র রহিয়াছে। অগ্রে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও পবিত্র করিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

আত্মানাং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তস্তোক্তে ত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

যস্ত্ব বিজ্ঞানবান্ ভবত্য যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্য বশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তুবিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত্ব বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
নসতৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধি গচ্ছতি॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োনজায়তে॥
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

অর্থাৎ, "জীবাত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, আর মনকে প্রগ্রহ স্বরূপ জান। ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব, বিষয় সকল তাহাদিগের চলিবার পথ, আর ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত যে আত্মা সেই ভোক্তা, অর্থাৎ জীবাত্মারূপ রথীই শুভাশুভ ফল ভোগ করেন, মনীষিরা এ প্রকার বলেন। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান আর সর্ব্বদা অযুক্তমনা, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান আর সর্ব্বদা যুক্তমনা, সারথির শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হয়। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্, অবশচিত্ত ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সংসার গতিই প্রাপ্ত হয়। যিনি বিজ্ঞানবান্, স্ববশ আর সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্মপদ লাভ করেন যাঁহা হইতে তাহার পতন হয় না। বিজ্ঞানই যাহার সারথি, মন যাহার প্রগ্রহ, তিনি সংসার পার সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।"

মানব-শাস্ত্র প্রণেতা মনু বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান যন্তেব বাজিনাং॥

অর্থাৎ, "যেমন সারথি রথে নিয়োজিত অশ্ব সমূহের নিয়মনে যত্নবান হয়, সেইরূপ বিদ্বান মনুষ্যেরা চিত্তাকর্ষণকারী বিষয় সমূহে ভ্রাম্যমান ইন্দ্রিয়গণের সংযমনে যত্নবান হইবেন।"

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্য সংশয়ং।
সংনিয়ম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥

অর্থাৎ, "ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে আশক্তি বশতঃ মানব দোষী হন, তৎসমুদয়কে নিয়মিত করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হয়।" অতএব ইন্দ্রিয় বশীভূত না করিলে মোক্ষলাভের, সিদ্ধিলাভের, পবিত্রতা লাভের উপায়ান্তর নাই। পরমেশ্বর পবিত্র স্বরূপ, তাঁহার নামও পবিত্র। যে হৃদয় পাপমলিনতায় পরিপূর্ণ তাহাতে পবিত্র স্বরূপের পবিত্র নাম স্থান পাইবে কিরূপে? অতএব সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও পবিত্র করা আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পুরাতন জীবন পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিতে হইবে, মরিয়া আবার বাঁচিতে হইবে। এই মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম স্থূলদেহ সম্বন্ধে নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র একবাক্যে উপদেশ দেন যে মুক্তির প্রার্থীকে, শান্তির ভিখারীকে নবজীবন লাভ করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে যে দীক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহা নবজীবন লাভের নামান্তর মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দীক্ষান্তে নবজীবন লাভ করিয়া দ্বিতীয়-বার জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ইহাঁরা দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হন। ভক্ত ঈশা বলিয়াছেন, 'Verily, verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the Kingdom of God". (John III. 3)

অর্থাৎ "মানব পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ না করিলে স্বর্গরাজ্য দেখিতে পাইবে না।" ইহার অর্থ এই যে মানুষ রিপু দমন ও পুরাতন পাপরাশি, অভ্যস্ত কুসংস্কার ও কুঅভ্যাস সমূহ পরিহার করতঃ শুদ্ধস্ব ও নির্ম্মল না হইয়া এক-বারে নূতন না হইলে, ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অধুনা শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত দীক্ষা প্রকৃতরূপে হইতেছে কি না, মানুষ প্রকৃতপক্ষে নবজীবন লাভ করিতেছে কি না, এ বিষয়ের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। তবে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলে পুরাতন পাপ, কুঅভ্যাস ও কুসংস্কার প্রভৃতি পরিহার করিয়া খাঁটী না হইলে মুক্তির পথ তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইবে না। যিনি নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া ব্রহ্মসত্ত্বায় অচল ও অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে দীন ও কৃপাপাত্র জ্ঞানে তাঁহারই মুক্তিপ্রদ অভয়প্রদ চরণপ্রান্তে প্রাণ

উৎসর্গ করিয়া শান্তির জন্য, মুক্তির জন্য ব্যাকুল হন, বাঞ্ছাকল্পতরু তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও পাপ কুঅভ্যাস, অহঙ্কার অভিমান সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবজীবন লাভ করিয়া দীনাত্মা হইতে হইবে। তাহার পর পরব্রহ্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিমান হইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে নিশিদিন ডাকিতে হইবে। দীন সন্তানের কাতরতায় তিনি কখনও বধির হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি তাহার নিকট শান্তির রাজ্য আনয়ন করিবেন, আর দীন সন্তান ভগবদ্ভক্তিতে বিগলিত হইয়া আত্মহারা হইবে। আত্মপরিচয়ে পরমাত্মার সহিত তাহার পরিচয় হইবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিস্ফলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

অর্থাৎ, "যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মস্বরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠকোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতিরজ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।" দীনাত্মা স্বীয় হৃদয় কোষ মধ্যে হৃদয় রত্নের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারেন যে তিনি

প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্য
স্মাৎসর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা॥ উপনিষদ্

তাই তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হন, সংসারের শোক মোহের অতীত লোকে স্বর্গ নিকেতনে গমন করিয়া শান্তি সম্ভোগ করেন। পৃথিবীর সুখ সৌভাগ্য তখন আর তাহাকে হৃষ্ট এবং শোক দুঃখ ম্রিয়মান করিতে পারে না। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ তিনি মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান বলিয়া সমভাবে গ্রহণ করেন, সুতরাং শান্তিলাভ করিতে তাহার আর বাকি থাকে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন

যংহি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

গীতা ২।১৫

অর্থাৎ "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখদুঃখে যিনি ব্যথিত না হইয়া ধীর থাকেন, তিনি মোক্ষ লাভ করেন।

পরিত্রাণার্থী মানবের ভগবদ্ভক্তি ও "নামে রুচি"র সঙ্গে সঙ্গে জীবে দয়া হওয়া আবশ্যক। জীবে দয়া যাহার নাই, তাহার ভগবৎ-প্রেমও নাই বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানকে ভাল বাসিবেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার জন করিতে পারিবেন, বিশ্বপ্রেম তাঁহার অন্তঃকরণে স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। বিশ্ববিধাতার জীবন্ত সত্বা তিনি সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থে উপলব্ধি করিয়া সকলকেই ভালবাসিবেন।

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্যাসনম।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য ভোজনম্॥

মহাভারত। বনপর্ব্ব ২.৫৪

শাস্ত্রের এই অনুশাসন বাক্যে তাঁহার প্রাণ স্বতই সায় দেয়। দীন দুঃখীর দারিদ্র্যে তিনি ব্যথিত, রোগীর রোগযন্ত্রণায় তিনি কাতর, বিপন্নের বিপদে তিনি দুঃখিত হন, সাধ্যমত তাহাদিগের সাহায্য করিয়া দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন। ভগবদ্ভক্তিতে যিনি অনুপ্রাণিত, দীনদুঃখীর দুঃখ বিপত্তিতে তিনি নয়নাশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল নরনারীর প্রতি কেন, পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁহার অপরিসীম দয়া, বৃক্ষলতার প্রতিও তিনি দয়া প্রকাশে উদাসীন নহেন। জগতে তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা বিশ্বপিতার প্রিয়কার্য্য বোধে দীনদুঃখীর সেবায়, রুগ্ন আতুরের শুশ্রূষায় আপনাদিগের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, কারণ আত্মপ্রসাদের বিমল আনন্দ তাঁহারাই সম্ভোগ করেন, ভগবানের নিত্য আবির্ভাব তাঁহারাই উপলব্ধি করেন। তাঁহাদিগেরই জীবন সার্থক! এই মর্ত্তভূমে তাঁহারাই স্বর্গসুখ অনুভব করেন। দীনদুঃখীর প্রতি দয়া, উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেই জীবে দয়ার পর্য্যাপ্ত হইল না; কিন্তু শত্রুর শত্রুতাচরণ ভুলিয়া গিয়া তাহাকেই মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিতে হইবে, অনিষ্টকারীকে ক্ষমা করিতে হইবে, যিনি আমাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আমাদিগকে পথের ভিখারী করেন, তাহাদিগের প্রতিও কোন প্রকার কুভাব মনে পোষণ করিব না, তাহাদিগকেও সুহৃৎ সখা স্বরূপে জ্ঞান করিব, শত্রু হউক, মিত্র হউক কাহারও প্রতি কথনও কোন প্রকার কুভাব পোষণ করিব না, সকলকেই প্রীতিনয়নে দেখিব, তবে ত জীবে দয়া সম্যক প্রকাশিত হইবে। বিশ্বাসী মহাত্মা ঈশা শত্রুনির্য্যাতনেও বিচলিত হন নাই, শত্রুগণকে মিত্রের ন্যায় ভাবিয়াছিলেন,

অন্তিমকালে তাহাদিগের কৃত অপরাধের জন্য বিশ্বপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর নামজপ পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে তাঁহাকে নানারূপ নির্য্যাতন করা হয়, তাহার পৃষ্ঠে কতই না কষাঘাত হয়, কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি বৈরীভাব প্রকাশ করেন নাই। তিনিও ঈশার ন্যায় উৎপীড়নকারীগণের মঙ্গলের জন্য কঠোর নির্য্যাতনের সময়ে মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের ভক্তিচন্দ্র গৌরচন্দ্রের প্রতি কত লোকে কত প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল, কিন্তু তিনি সকলকেই প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্বজনীন প্রেম না হইলে আর কি হইল ? নবজীবন লাভ করিয়া যে হৃদয় ভগবদ্-পিপাসু হইয়া তাঁহার অমৃতময় নামে মাতিয়াছেন, তাঁহার ভক্তিতে মজিয়াছেন, আর বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাঁহাব মানবজন্ম গ্রহণ করা সার্থক হইয়াছে। মানব নশ্বর দেহের বিনাশের পর আপনার দুস্কৃতি সুকৃতির ফলে পাপ পুণ্যের পরিণামে স্বর্গ নরক ভোগ করিলেও ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ও বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক দীনাত্মাগণ এই মর্ত্তধামেই স্বর্গরাজ্য দেখিয়া থাকেন, স্বর্গের সুখ অনুভব করেন। কিন্তু হায়! এইরূপ ভক্তিমান বিশ্বপ্রেমিকের সংখ্যা জগতে বড়ই বিরল।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল সিংহ।

জীবনের খেলা।

নিশার স্বপনসম জীবনের খেলা,
ঘুমের আবেশে সুমধুর,
হেরি যেন তরুকোলে ফুল্ল-ফুল-মালা,
দূর হ'তে আনন্দ প্রচুর।
জীবনের নব নব প্রবৃত্তি বরষে
প্রস্ফুটিত হয় কতফুল,
যথা সুখে মধুপান করিছে হরষে,
প্রমত্ত প্রসূনে অলিকুল।

ভাবেনা ইহারা ভাবি-কালের গরাসে,—
যবে নষ্ট হবে এ কানন,
তখন মধুর আশে অলি মধুমাসে,
কোথা বসি করিবে গুঞ্জন?

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ।

বঙ্গলক্ষ্মী।

কে আছে অধিনী হেন অবনী মাঝার?
হেরি নিত্য বিদলিত পর-পদতলে
স্বর্ণতনুখানি মাগো! তপ্ত অশ্রুজলে
সপ্তকোটি শিশু কার করে হাহাকার?
কিন্তু অয়ি জন্মদাত্রী জননী আমার!
আজিও এ বক্ষ মোর উল্লাসে উথলে
স্মরি' কীর্ত্তিরাশি তোর; প্রেম-পুণ্যবলে
আজিও অজেয় তুই গর্ব্ব বসুধার।
যে মহিমা—শৈলশিরে রাজরাজেশ্বরী
আছিস্ বসিয়া, দেবভোগ্য সে বিভব
আর লভিয়াছে কেবা এ ভব-ভুবনে?
কি ছার সম্পদ-সুখ? চঞ্চল লহরী
কাল-সিন্ধুনীরে যথা নশ্বর সে সব;—
অনশ্বর স্বর্গ মাগো তোর ও চরণে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

মৃত্যুর পর।

(৫)

গতবারের প্রবন্ধে "লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় (যখন) ইহলোকে আগমন করে" এই কথাটি ছিল। অদ্য, পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ লোকে কিরূপে করে তাহারই আলোচনা করিব। কিন্তু এই ফলভোগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কতকটা সময়ও আছে কার্য্যও আছে। আত্মা কিরূপে দেহত্যাগ করিয়া যান অর্থাৎ কিরূপে মৃত্যু হয় তন্মধ্যে একটি কথা। সে কথার আলোচনা পরে করিব। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কি কি হয় তাহা৭ অনেক কথা তাহারও আলোচনা সময় পাইলে পরে হইবে। কিন্তু স্থূলত কথাটি বুঝিবার জন্য একটি কথা বলা আবশ্যক। মৃত্যুর পর যাঁহারা ধর্ম্মশীল নহেন এমন লোকের আত্মা এক-বৎসর কাল (আমাদের হিসাবে,—আধ্যাত্মিক বা আতিবাহিক জগতে তাহা একদিন মাত্র।) নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন। এই নিদ্রাকেই শাস্ত্রে মহানিদ্রা বলে। এক বৎসরের পর অর্থাৎ সপিণ্ডনকরণের পর আত্মকৃত কার্য্যের ফলভোগ আরম্ভ হয়। যাঁহারা ধর্ম্মশীল তাঁহাদিগের এইরূপ মহানিদ্রা নাই তাঁহারা ক্ষণকাল মরণরূপ মূর্চ্ছার পরই আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে আরম্ভ করেন। এই আত্মকৃত কার্য্যের ফলভোগ প্রায় সর্ব্বজাতিই স্বীকার করেন এবং কিরূপে ভোগ হয় তাহাও স্বীকৃত কথা। এই ফলভোগ প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত—সৎকর্ম্মের ভোগ আর অসৎ কর্ম্মের ভোগ। সাধারণে ইহাকেই স্বর্গভোগ ও নরকভোগ বলে। এই স্বর্গ নরকের ভাব সকল জাতিরই হৃদয়ে আছে। কেহ বলেন স্বর্গ, নরক, কেহ বলেন হেভেন, হেল্, কেহ বলেন জান্নৎ, জাঁহান্নম্; কেহ বলেন ইলিসিয়ম্, হেডিস্—কথা যাহাই হোক, ভাব এক। অর্থাৎ সৎ বা পুণ্যকর্ম্ম করিলে মৃত্যুর পর সুখময় একস্থানে স্থিতি, আর অসৎ বা পাপকার্য্য করিলে তদ্বিপরীত দুঃখময় অন্যস্থানে স্থিতি।

গীতায় স্বর্গ নরকের উল্লেখ আছে।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ॥

গীতা ১ম অ ৪১ শ্লোক

বর্ণসঙ্কর সকল কুলনাশক এবং কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। ইহাদের পিতৃগণ পিণ্ড তর্পণ বর্জ্জিত হইয়া নরকে নিপতিত হয়।

উৎসন্ন কুলধর্ম্মানাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩

হে জনার্দ্দন আমরা শুনিয়াছি উৎসন্ন-কুলধর্ম্ম জনগণের নিয়ত নরকবাস হইয়া থাকে।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃপার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

২—৩

হে পার্থ আপনা আপনি উৎপন্ন অনাবৃত স্বর্গ-দ্বার স্বরূপ এ প্রকার যুদ্ধ, সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয় সন্তানেরাই লাভ করিতে পারেন।

কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাম্
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি॥ ৪৩

২—৪৩

মূঢ়গণ, * * স্বর্গ ও কামনা বড় বলিয়া জন্মকর্ম্ম ফলপ্রসূ ভোগৈশ্বর্য্য লাভের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষ বহুল (যে সকল বিষবল্লী সদৃশ সাম্প্রতিক শোভনীয় স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতির কথা কহিয়া থাকেন) ইত্যাদি

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যেস্থিতং মনঃ

৫—১৯

যাহাদের মন সাম্যে অবস্থিত তাহারা ইহলোকেই স্বর্গজয় করিয়াছেন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১

৬—৪১

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকারিগণের লোক সকল পাইয়া বহুবৎসর বাসসুখ অনুভব করতঃ শুদ্ধ শ্রী সম্পন্ন ব্যক্তিগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।

অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

১৬—১৬

(এইরূপ) বিবিধ বিষয় বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি মোহজালাবদ্ধ ও ভোগাসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হয়।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

১৬—২১

কাম ক্রোধ ও লোভরূপ নরকের ত্রিবিধ দ্বার অতএব আত্মার নাশক এজন্য এ তিনটি পরিত্যাগ করিবে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্॥ ২০

৯—২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে। ২১

৯—২১

ত্রিবেদ বিহিত কর্ম্মকারী যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিয়া সোমরস পান পুরঃসর নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে, তাহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্য দেবভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করে। ২০

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যভূমে আগমন করে এবং উক্ত বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করত কামনাপরতন্ত্র হইয়া গতাগতি লাভ করে। ২১

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃস্যাত্রিভি গুণৈঃ। ৪০

১৮—৪০

পৃথিবীতে এবং স্বর্গে দেবগণের মধ্যেও এমন কোন প্রাণী নাই যে এই প্রকৃতিজাত গুণ হইতে মুক্ত আছে। ৪০

অগ্নির্জ্যোতি রহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫
শুক্লকৃষ্ণ গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬

৮ অঃ

অগ্নি, তেজ, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের যে পথ আছে মৃত্যুর পর ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিগণ সেই পথে গমনশীল হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৪

যোগীগণ মৃত্যুর পর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, ষণ্মাস ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগেব সমীপে ক্রমশ উপস্থিত হইয়া চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। সেইখানে হইতে ভোগাবসানে পুনরায় সংসারে আগমন করেন। ২৫

এই জগতের প্রকাশময় শুক্লা ও তমোময় কৃষ্ণাগতি এই দুইটী অনাদি গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার একটির দ্বারা মোক্ষ ও অপরটির দ্বারা জন্মান্তর ঘটিয়া থাকে। ২৬

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫

৯—২৫

দেবযজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি দেবলোকে, পিতৃযজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি পিতৃলোকে, ভূতযজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি ভূতলোকে এবং আমাপরায়ণ ব্যক্তি আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। ২৫

এক্ষণে চণ্ডী দেখুন।

নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। কীলকস্তব।
দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্ল্লভম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়া প্রসাদতঃ॥
তত্র গচ্ছতি ভক্তোঽসৌ পুনশ্চাগমনং ন হি।
লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ॥ দেবী কবচ।

ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বো তামুন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি। দেবীসূক্ত।

স্বর্গাগ্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥ ৭

২—৭

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দ্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি॥
২—৭০

ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মাণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদাল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥ ১৬
৩—১৬

এভির্হতৈর্জ্জগদুপৈতি সুখন্তথৈতে কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥ ১৮

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥ ২৩

ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্ত দন্তিকাম্॥ ৪৫—দেবীর স্তুতি।

এক্ষণে গীতামাহাত্ম্য হইতে দুই একটী শ্লোক উদ্ধার করিব।

পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্‌যান্তি স্বর্গতিম্॥

পিতৃলোকের উদ্দেশে যিনি শ্রাদ্ধকার্য্যে গীতা পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গে গমন করেন।

অহঙ্কারেণ মূঢাত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ॥

যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কার বশত গীতার অর্থ না মানে সে কল্পক্ষয়কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নামক নরকে পচিয়া মরে।

রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতেও স্বর্গনরকের কথা আছে। বস্তুতঃ হিন্দুশাস্ত্রে স্বর্গনরকের এত কথা ও এত বর্ণনা আছে যে সমুদায় একত্র সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব। করিলে, শব্দকল্পদ্রুমের ন্যায় রাশি রাশি বিশাল পুস্তক হইয়া পড়ে। বাইবেল, কি কোরাণ, কি জেন্দাবেস্তার কি ত্রিপিটকের আর সাহায্য লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না। য়ুরোপীয় যখন বাইবেল মানেন, মুসলমান যখন কোরান মানেন, পার্সী যখন জেন্দাবেস্তা মানেন, চীন যখন কংফুচী মানেন, বৌদ্ধ যখন ত্রিপিটক মানেন, তখন আপনি হিন্দুসন্তান হিন্দুর শাস্ত্র মানিবেন না কেন? ভাল, লক্ষিক

অনুসারে যেন আমি তর্ক করিতে নাই জানি, তবু কথাটা কি প্রাণে আঘাত করে না? এক্ষণে মহাভারত হইতে একটি প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া আজিকার মত বিদায় লইব। বিষয়টি যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন—স্বর্গারোহণ পর্ব্বে আছে।

"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন মহারাজ দুর্য্যোধন সাধ্য ও দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভামণ্ডলসম্পন্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তখন তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ যে লোভাকৃষ্টচিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমরা পৃথিবী উৎসন্ন ও বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমাদিগকে বনমধ্যে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে দুরাত্মা সভামধ্যে গুরুজন সমক্ষে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপরায়ণী দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মার সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। আর আমি উহার মুখদর্শন করিব না। এক্ষণে যেস্থলে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানেই গমন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে দেবর্ষি নারদ হাস্যবদনে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন অমন কথা কহিও না। স্বর্গে অবস্থান করিলে অন্যের সহিত বিরোধ থাকে না। দুর্য্যোধনের প্রতি ওরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে সকল নরপতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা এবং দেবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের সৎকার করিয়া থাকেন। উনি সর্ব্বদা তোমাদের হিংসা করিতেন বটে; কিন্তু ঐ মহাত্মা এক্ষণে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত সদগতিলাভ করিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে মহাভয়ের সময় উপস্থিত হইলেও ভীত হয়েন নাই। উহাঁর সেই পুণ্যবলে এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে। * * এ স্বর্গভূমি, এস্থলে বৈরভাব অবলম্বন করা উচিত নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন যে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত মনুষ্য ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীগণের সহিত পৃথিবী উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে, যাহার বৈরনির্য্যাতনার্থ আমরা কোপানলে দগ্ধ হইয়াছি, যদি সেই দুরাত্মার সনাতন বীরলোক

লাভ হইল, তাহা হইলে আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রবলপরাক্রম সত্যবাদী ভ্রাতৃ-গণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন! কুন্তীতনয় মহাবীর কর্ণের কোন লোক লাভ হইয়াছে?

* * *

ধর্ম্মনন্দন এই কথা বলিলে দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস, যদি তোমার ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে তাহা হইলে শীঘ্র তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিওনা। * * দেবগণ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া এক অতি ভীষণ পথ দিয়া তাঁহাকে আত্মীয়গণের নিকট লইয়া চলিলেন।

ঐ পথ অতি দুর্গম ও ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই সতত ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকে।* উহা পাপাত্মাদিগের দুর্গন্ধ, মাংস-শোণিতের কর্দ্দম, দংশ, মশক, ভল্লুক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, ক্রমী, ও কীটে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। অয়োমুখ কাক ও গৃধ্রগণ এবং সূচীমুখ পর্ব্বতাকার প্রেতগণ উহাতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ প্রেতগণের মধ্যে কাহার কাহার কলেবর মেদ ও রুধিরে লিপ্ত এবং কাহার কাহার ও বাহু, কাহার কাহার উরু, কাহার কাহার হস্ত, কাহার কাহার উদর, ও কাহার কাহার চরণ ছিন্ন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শব দুর্গন্ধযুক্ত অতি ভয়ঙ্কর স্থানে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন উষ্ণোদক পরিপূর্ণ নদী, নিশিত ক্ষুরসমাকীর্ণ অসিপত্রবন, লৌহময় ফলক সমুদায় ও তীক্ষ্ণ কণ্টকযুক্ত শাল্মলীবৃক্ষ ঐ স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে লৌহকলস পরিপূর্ণ তৈল ক্কাথিত হইতেছে এবং পাপাত্মারা নিরন্তর বিষম যন্ত্রণাভোগ করিতেছে। * * তখন দুঃখ শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানের দুর্গন্ধে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ করুণবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, 'হে ধর্ম্মনন্দন, আপনি আমা-দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থান করুন।

*পুণ্যকারীগণের শুক্লা ও কৃষ্ণাগতির পথের কথা গীতার অষ্টম অধ্যায়ের শ্লোক উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চ প্রপাঠ-কে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

আপনার আগমনে সুগন্ধ পুণ্যসমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমরা বহুকালের পর আপনাকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেছি অতএব আপনি ক্ষণ কাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন। আপনার আগমনে আমাদিগের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে।' পরম দয়ালু রাজা যুধিষ্ঠির সেই করুণ বাক্য শ্রবনে একান্ত দুঃখিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় বারংবার ঐরূপ বাক্য তাঁহার শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল, কিন্তু কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে ঐ বাক্য প্রয়োগ করি-তেছে তিনি কোন মতে তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই পরিদেবনশীল ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ তোমরা কে? আর কি নিমিত্তই বা এ স্থানে অবস্থান করিতেছ?

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একবারে চতুর্দ্দিক হইতে "আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্র" এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহা-দের বাক্য শ্রবন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, কি দৈব-বিড়ম্বনা! আমার ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, কর্ণ, দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে উহাঁদিগকে এই পাপযুক্ত ভীষণ স্থানে অবস্থান করিতে হইল! আমিত ঐ পুণ্যাত্মাদিগের কোন দুষ্কৃত দেখিতে পাই না। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র তনয় রাজা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত পাপপরায়ণ হইয়াও অধর্ম্মনিরত অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও পরম পূজিত হইয়া এই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছে, আর আমার ভ্রাতৃগণই বা কি নিমিত্ত, পরমধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপারদর্শী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিরত হইয়াও ঘোর নরকে নিমগ্ন রহিয়াছে? আমি ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি আমার নিদ্রিতাবস্থা, না জাগরিতাবস্থা? আমার কি চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে? রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুলিত চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

* * *

তখন দেবরাজ ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ, সমুদায়

দেবতা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। অতঃপর আর তোমাকে কষ্ট-ভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর। তোমার পরম সিদ্ধি ও অক্ষয়লোক লাভ হইয়াছে। তোমার নরকদর্শন হইল বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইওনা সকল রাজাকেই এক একবার নরক দর্শন করিতে হয়। মনুষ্য মাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাৎ তাহারে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরকভোগ করে পশ্চাৎ স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করে সে প্রথমে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্য সঞ্চয় ও অল্পমাত্র পাপানুষ্ঠান করে তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া তোমাকে প্রথমে নরক দর্শন করাইলাম। পূর্ব্বে তুমি ছল-পূর্ব্বক গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অশ্বত্থামার বিনাশ কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে ছল ক্রমে নরক প্রদর্শন করা হইল এবং তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীও সেই পাপে ছলক্রমে নরক ভোগ করিলেন। এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই নরক হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। * * আজি অবধি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে। অতঃপর তুমি রাজসূয়জিত লোক সমুদায় ও তপস্যার মহাফল উপভোগে প্রবৃত্ত হও। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ ও ভরত অন্যান্য সমুদায় ভূপতি অপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়া-ছেন, তুমি সেই লোকে অবস্থিত হইয়া পরম সুখ ভোগ করিবে। * *

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোক-পাবনী মন্দাকিনীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র জলে অবগাহন করিলেন। ঐ সলিলে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার মানুষদেহ তিরোহিত ও দিব্য মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার অন্তর হইতে শোক ও বৈরভাব একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল। তখন তিনি ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণে পরি-বৃত হইয়া ঋষিদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে যে স্থলে তাঁহার ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ক্রোধবিহীন হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিতে-ছিলেন. সেই স্থলে গমন করিলেন।"

(৬)

এক্ষণে যখন স্বর্গ নরক থাকাই সিদ্ধান্ত হইল, স্বর্গের সুখের কথা ছাড়িয়া দিয়া, নরক যন্ত্রণার কথা একটু বিশেষ করিয়া খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। সকল জাতির ধর্ম্মপুস্তকে বা সাহিত্যে ইহার স্থান আছে। আর ইহাও জানিবেন ইহা কবির কল্পনা নহে। ইহা যে কবির কল্পনা নহে সেই কথা বুঝাইবার জন্যই পূর্ব্ব প্রবন্ধে একটু আয়াস স্বীকার করিয়াছি। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন নরক আছে ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যমের তিনদ্বারে বিস্তর ধার্ম্মিক লোক দেখিয়া দশানন দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত—

দক্ষিণ দ্বারেতে যায় দেখে অন্ধকার
রাত্রি দিন নাহি তথা সব অন্ধকার

যত যত পাপীলোক সেই দ্বারে থাকে
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে

চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে
নরকে ডুবায়ে সবে যমদূতে মারে

যেই জন পরদার করেছে কৌতুকে
সেই জন কুম্ভীপাকে ডুবিছে নরকে
সুতপ্ত তৈলেতে কুম্ভ অগ্নির উথাল
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গার ছাল
পরস্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন
লোহময় স্ত্রী তথায় আনে যমদূতে
অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে
অগ্নিলোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল
পাপীসব তাহাতে ধরিয়া দেয় কোল
পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে
পরস্ত্রী লইয়া যেবা করেছে রমণ
চিরকালাবধি ভোগে নরকে সে জন

তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার
কোটী কল্প না হয় সে নরকে উদ্ধার
মরম হইতে তার হরয়ে পরাণ
করাতে চিরিয়া তারে করে দুই খান
বিপরীত রক্তেতে তালুকা তার শোষে
পানীয় চাহিতে যমদূতে মারে রোষে
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন
হস্তপদ বান্ধিফেলে দিয়া চর্ম্মদড়ি
তাহার উপর মারে দুহাতিয়া বাড়ী
ঘাড়েমুড়ে বান্ধিফেলে অগ্নির উপর
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর
পরধন যে জন করিল ডাকাচুরি
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি
মিথ্যা সাক্ষী দেয় পরে বলে বিথ্যা বাণী
তার প্রহারের কথা কি কব কাহিনী
উত্তপ্ত সাড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ী
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ
ব্রাহ্মণেরে মন্দবলে মারে জেষ্ঠ ভাই
মুষল তাহারে মারে তার রক্ষা নাই
পরহিংসা করে কহে অসত্য বচন
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন
অপাত্রকে কন্যা দেয় আর লয় কড়ি
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুপড়ি
মাংস লহ লহ বলি সদা ডাকছাড়ে
মাংসের রসানি তার বুকবয়ে পড়ে
অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা

একজন দান করে অন্যে দেয় হাতা
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাঁতা
সীমা হরে যেই জন পোড়ায় পর ঘর
বিষম প্রহারে তার যমের কিঙ্কর
উভয়ের ন্যায় এক পক্ষে পক্ষপাতী
কুম্ভপাকে ফেলে তায় করিয়া আঘাতি
লোকে পীড়া দিয়া যে তুষিয়াছে ঈশ্বর
পায় সে কুকুর জন্ম সহস্র বৎসর
লোকরক্ষা করিয়া যে রাজ্য করে নাশ
হইয়া শৃগালজাতি খায় মৃত মাস
না চিন্তায় রাজহিত চিন্তে প্রজাহিত
বিষম প্রহার তার কার্য্যের উচিত
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন
বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ
গুরুপত্নী গমনেতে যত পাপ হয়
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয়
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোকে না দেখি নিস্তার
ব্রাহ্মণ শূদ্রানী গমনে যে প্রমাদী
সে সবার পাপকর্ম্মে সধর্ম্ম হয় বাদী
চণ্ডাল জনম হয় শূদ্রানী গমনে
সর্ব্ব কর্ম্ম নষ্ট হয় তার দরশনে
রাজা হয়ে প্রজা না করে পালন
পরলোকে নরক তার না হয় খণ্ডন
যেই জন শূদ্র হইয়া হরয়ে ব্রাহ্মণী
তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি
লক্ষ লক্ষ সাড়াশিতে গায়ের মাংস টানে
খুলে খায় গায়ের মাংস সহস্র সন্ধানে

ডাঙ্গসের বাড়ী মারে হয় খান খান
কোটীকল্প ব্রাহ্মণের নাহিক এড়ান
যে জন করিয়া কর্ম্ম না করে শোধন
তার পিতৃলোকের সে যমের তাড়ন
বিঘত প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে
তথির উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উত্তাল
তথির উপরে ফেলে উঠে গায়ের ছাল
অগ্নিমধ্যে সাড়াসি তাতায় ভাল মতে
তাহা দিয়া গাত্রের মাংস কাটে যমদূতে
ইত্যাদি নরকভোগ করে বহুবার
ব্রাহ্মণের শাপে কার নাহিক নিস্তার
পরহিংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে
গলায় সাড়াসি দিয়া করে টানাটানি
খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি
দারুণ যন্ত্রণা তার কহিবার নয়
গলায় গরগণ্ড তার বড়ই সংশয়
দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা
ইহা হইতে বাইসগুণ নারীর ঘটনা
বড ছোট করিয়া করুক যত পাপ
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ।

এখন পাঠক মহাশয় একবার দান্তের অনুকরণে নরক বর্ণনা দেখুন—

(মায়াদেবীর সঙ্গে রঘুপতি রামচন্দ্র যমপুরে যাইতেছেন)

বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।*
লোহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে

*সাহিত্যের অনুরোধে "মেঘনাদবধ কাব্য" হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি। সত্বাধিকারী মহাশয়ের ঠিকানা জানি না নহিলে অনুমতি লইতাম। উদ্দেশে অনুমতি লইলাম। ভরসাকরি সত্বাধিকারী মহাশয় নিজ কমনীয় ক্ষমা গুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিবামগতি চৌদিকে উজলি!
আগ্নেব অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণমুখে—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখ দেশে চির দুঃখ ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এদেশে!"

* * *

কহিলেন মায়াদেবী * * কৃতান্ত নগরে,
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।
দক্ষিণ দুয়াব এই, চৌরাশি নরক
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।"

* * *

কতক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহাতে কোটী কোটী প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে! "হায়রে বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমাসবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর অনলে মোবা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু! আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত দারা,
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"
এইরূপে পাপিপ্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্য দেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে;—

"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা, স্বকরম ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে।"
নিরখিলে দৈববাণী, ভীষণ মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে;
কাটে কৃমি; বজ্রনখা মাংসাহারী পাখী
উড়ি উড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী ভুড়ী
হুহুঙ্কারে! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী!
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি;—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন রঘুমণি,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে!
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য! চল রথি, চল দেখাইব
কুম্ভীপাকে; তপ্ততৈলে যমদূতে ভাজে
পাপিবৃন্দ যে নরকে! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দন ধ্বনি! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!

* * *

"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে
না দমে ঔষধ যারে! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?

কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে!"

* * *

কতক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথি
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশি-কলা যথা
আকাশে, কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী
কহিছে—"চিকনি তোরে বাঁধিতাম সদা
বাঁধিতে কামীর মন, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলি
উন্মদা যৌবনমদে।" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি—"হায়, হীরা মুক্তাফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে," কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়ন-দ্বয় (নির্দ্দয় শকুনী
মৃতজীব আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপ চক্ষু, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষ শর; সুদর্পনে হেরি
বিভা তোয়, ঘৃণিতাম কুরঙ্গ নয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কিরে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
পশ্চাতে কৃতান্ত-দূতী, কুন্তল প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ চুষিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভি তলে;
নাসাপথে অগ্নি-শিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা;—"এই যে
নারীকুল, রঘুমণি দেখিছ সম্মুখে

বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত তুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামি মন মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা। এবে কোথা সে রূপ মাধুরি,
সে যৌবন-ধন ?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি—"এবে কোথা সে রূপ মাধুরি
সে যৌবন-ধন হায়! কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।

* * *

আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ নয়নে
মিষ্টতর সুধারস মধুর অধরে

* * *

রূপস পুরুষ-দল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি;

* * *

হেরি সে পুরুষদলে কামমদে মাতি
প্রকটে কটাক্ষশর হানিলা রমণী—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।

* * *

—রসিক নাগরে
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে নয়ন তা কহিলা নয়নে।
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে।
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত পদাঘাতে
ছিঁড়িচুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি বজ্রনখে।

মৃদুভাসে কহিলা সুন্দরী
মায়া,—
"জীবনে কামের দাস, শুন বাছা ছিল
পুরুষ, কামের দাসী রমণী মণ্ডলী।
কাম ক্ষুধা পুরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে
বর্জ্জি লজ্জা—দণ্ড এবে এই যমপুরে
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে
মরুভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকালে যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে।

* * *

হাসিয়া কহিলা মায়া "অসীম এ পুরী
রাঘব, কিঞ্চিৎমাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত নগরে, শূর, আমা, দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ! পূর্ব্ব দ্বারে সুখে
পতিসহ করে বাস পতি পরায়ণা
সাধ্বীকুল; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা
বাসন্তী সমীর চির বহিছে সুস্বনে
গাইছে সুপিক কুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃত ফল ফলিছে কাননে;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!

নরক যন্ত্রণা দর্শনে পাঠক মহাশয়ের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকিবে, এজন্ত সতীসাধ্বীর স্বর্গসুখ দেখাইয়া অদ্য বিদায় হইলাম।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

তোমারই।

কলেজ ঘড়িতে 'একটা' বাজিয়া গেলে যেমন সংস্কৃত অধ্যাপক তৃতীয় শ্রেণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, ছাত্র মৃগেন্দ্রকুমার অন্তদ্বার দিয়া পুস্তক হস্তে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ক্ষিপ্রপদে বাটীর দিকে প্রস্থান করিল। বাটী আসিয়া পাঠগৃহে পুস্তক নিক্ষেপ করিয়া মৃগেন্দ্র ইতঃস্ততঃ উকিমারিয়া দেখিল, পরে সাবধান-বিন্যস্ত পদে উপরে উঠিতে লাগিল। সোপান মধ্যে মাতার সহিৎ সাক্ষাৎ হইল। পুত্রকে অসময়ে কলেজ হইতে প্রত্যাগত দেখিয়া মাতা কিঞ্চিৎ বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃগেন্দ্র কর দ্বারা মস্তক পীড়ন করিয়া উত্তর করিল যে তাহার অত্যন্ত মাথার বেদনা হইয়াছে। স্নেহময়ী মাতা পুত্রের অসুস্থতা সংবাদে চিন্তিতা হইলেন এবং পুত্রের সহিত তাহার কক্ষে গমন করিয়া তাহার মস্তকে ল্যাভেণ্ডার আদি সিঞ্চন করিলেন। পরে পুত্রকে শয্যায় শায়িত করিয়া স্বহস্তে তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

মৃগেন্দ্রর অসুস্থতার কথা ক্রমে বাটীর মধ্যে প্রচার হইল। তখন তাহার ভ্রাতৃজায়া অনঙ্গসুন্দরী ও ভগ্নী মধুমতী তাহাকে দেখিতে আসিল। অনঙ্গসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিয়া ঈষদ হাস্যে ননদিনীর গাত্র পীড়ন করিল এবং পুত্রসেবায় নিবিষ্ট শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অজ্ঞাতে তাহার কর্ণে মৃদুস্বরে বলিল—'মাথা ধরাটা কি বুঝিচিস্! বুড়মাগী কেবল হাওয়া করে মরচেন্। এ কি যে সে মাথাধরা!'

মধুমতীও একটু হাস্য করিয়া সেইরূপ চুপে চুপে বলিল—'ছোট দাদারও দেখচি স্কুল পালান রোগ হ'ল। বউ এসে আর পড়াশুনায় মন থাকে না। তা দাদার ভাইত বটে!'

'বনের ভাই বল না! ঠাকুরজামাই যদি অফিস্ পালাতে পারে, এঁরা কি আর স্কুল পালাতে পারে না! স্কুল যেন পালাত কিন্তু অফিস্ ত পালিয়ে আসে না!'

সুন্দরীদ্বয় উভয়ে উভয়ের প্রতি ঈর্ষ্যাকটাক্ষ করিয়া ঈষদ্ হাস্য করিল। যেন প্রণয় গৌরবে রমণীর হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল।

এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতে মুহূর্ত্ত মাত্র সময় লাগিল। তারপর অনঙ্গ সুন্দরী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হস্ত হইতে তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল, মধুমতী আরও খানিক ল্যাভেণ্ডার ভ্রাতার মস্তকে সিঞ্চন করিয়া দিল।

'আহা বাছার বড় মাথার যাতনা হচ্চে, তোমরা একটু ব'সে হাওয়া কর' এই উপদেশ দিয়া মাতা চলিয়া গেলেন।

তখন অনঙ্গসুন্দরী অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিল এবং ননদিনীর প্রতি হাস্যকটাক্ষ করিয়া কথা কহিল—'ঠাকুরপো মাথা ধরা কি একটু ছাড়্‌ল?'

মৃগেন্দ্র কোন উত্তর করিল না।

অনঙ্গ—পড়ে পড়ে মাথা ধরচে নয় ঠাকুরপো? এখন ঘরে বাহিরে পড়া। আহা এত সয় কি?

মধুমতী—তা বুঝি? ছোট দাদাত বরাবরই দিনরাত পড়ে।

অনঙ্গ ঈষদ হাসিয়া বলিল—'তা বোন এখনযে পড়া বড় শক্ত হয়ে উঠেছে! কেমন গুরুমহাশয় হয়েছে!'

মৃগেন্দ্র বিরক্তস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল—'তোমাদের বড়বড়ানিতে যে আরও মাথা ধরে উঠ্‌ল। ইচ্ছে হয় চুপ করে বাতাস কর না হয় চলে যাও।'

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'আমাদের বড়বড়ানি যদি ভাল না লাগে তবে যার মিটে সুর তাকেই নয় এনে দিচ্চি।

মধুমতী। দাদা, মাথায় একটু পুরাণ ঘি দেবে?

মৃগেন্দ্র কর্কশ স্বরে বলিল—'দূরহ হতচ্ছারি। মাথায় ঘি দেবে!'

সুন্দরীরা একটু মৃদু হাসিল। তারপর অনঙ্গ সুন্দরী বলিল—

'চ'ল্ বন্ চ'ল্ ঠাকুরপো আমাদের থাকায় বিরক্ত হচ্চে। যার প্রত্যাশায় কলেজ পলায়ন তার আগমনে বাধা দেওন ত উচিৎ নয়।'

মৃগেন্দ্র। আমি বুঝি গিছে করে কলেজ পালিয়ে এসেছি?

অনঙ্গ। না, তাকি আমি ব'লচি। মাথা ব্যথা পড়েচে বলে ত কলেজ হ'তে এসেচ, তবে ল্যাভেণ্ডার আর বোনপোড়ার মুখীর পুরাণ ঘিয়ে এসব

ব্যথা যাবে না। এর একটা ঔষধ আমি একজন কলেজ 'বএর' কাছে শিখে-ছিলাম সে ওষুধ এনেছি। ঠাকুরঝি তুই একটু হাওয়া করত ভাই আমি ঔষধটা খুঁজে আনি।'

কথা সমাপ্ত হইলেই অনঙ্গসুন্দরী গৃহ হইতে দ্রুতপদে বাহির হইল, এবং মুহূর্ত্তকাল পরে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী একটী বালিকাকে বহু আয়াসে অঙ্কে বহন করিয়া প্রত্যাগমন করিল এবং হাসিয়া বলিল—'বলি ঠাকুরপো, জোড় হাতে ঔষধ নিয়ে মাথায় পর, এখনই মাথা ছেড়ে যাবে। দেখ যেন মাটিতে নাবাইও না!

মধুমতী হাস্য করিয়া চুপে চুপে বলিল—'দাদা বুঝি মাথা হ'তে ওষুধ ভুঁয়ে ফেলে না? মরি কি গুনের ওষুধ রে!

'স্ত্রী ত পুরুষের মাথার মণি'—অনঙ্গ সুন্দরী হাসিতে হাসিতে কথা বলিয়া অঙ্কস্থিত বালিকাকে মৃগেন্দ্রের পার্শ্বে নিক্ষেপ করিল। তারপর সুন্দরীদ্বয় উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

যে অবগুণ্ঠন দিয়াছিল সে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে গৃহের চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টি করিল। তারপর তাহার স্বচ্ছ তরল প্রশান্ত নয়ন দুটী ধীরে ধীরে নিমিলিত চক্ষু মৃগেন্দ্রের মুখের উপর ন্যস্ত হইল, এবং একখানি ক্ষুদ্র সুকোমল গৌরাঙ্গ করপল্লব তাহার কপোলে সঞ্চালিত হইল। মৃগেন্দ্র নয়ন উন্মিলিত করিল। চারি চক্ষুর মিলন হইল; দুইটী চক্ষু অমনি অবনত হইল।

সেই বালিকার নাম লাবণ্যময়ী। বিবাহের পর লাবণ্যময়ী এই প্রথম শ্বশুরঘর করিতে আসিয়াছে। তার এখনও লাজ টুটে নাই। স্বামীর সহিত চড়বড় করিয়া কথা কহিতে সে এখনও শিক্ষা করে নাই। লাবণ্য পল্লি-গ্রামের মেয়ে, স্বামীর নিকট সে এখনও জড়সড়, সরমে তার কথা ফুটে না। কেবল কাঁদিয়া ফেলে। আমাদের লাবণ্যময়ীর মত লজ্জাবতী ক'নে এখন বঙ্গগৃহে আছে কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সুন্দরী পাঠিকাগণ 'এমন নেকি ত দেখি নাই' বলিয়া যেন নাসিকা কুঞ্চিত না করেন এইটুকু আমাদের প্রার্থনা। সে যাহা হউক কিন্তু নব্য সম্প্রদায় ভুক্ত মৃগেন্দ্র লাবণ্যের এই নেকামি পচ্ছন্দ করিবে কেন? মৃগেন্দ্র সেক্সপিয়ার ও মিল্টনের ছাত্র কবির ঐন্দ্রজালিক কল্পনা তাহার মানসপটে কি সুন্দর প্রেমচিত্র সকল অঙ্কিত

করিয়া রাখিয়াছে! প্রণয় সম্ভাষণের মাধুর্য্য আত্মসমর্পণের একাগ্রতা ও নির্ভিকতা, মিলনের ব্যাকুলতা এবং সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা তাহার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে খোদিত হইয়া আছে। সেই সকল প্রদীপ্ত চিত্রের পার্শ্বে তোমার এই ঘ্যান ঘ্যেনে প্যান পেনে মেয়ে! হরি হরি আশার ইন্দ্রধনু কোথায় মুছিয়া গেল! কল্পনার শুকতারা সহসা নির্ব্বাপিত হইল। মৃগেন্দ্র ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইল। বালিকার সঙ্কুচিত ও সশঙ্কিত ভাব তাহার বড়ই বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। লাবণ্যের ব্রীড়াসম্ভূত কচিত দুই একটী অস্ফুট সম্ভাষণ তাহার উষ্ণপ্রেম পিপাসার একটুও শান্তি করিতে সক্ষম হইল না। মৃগেন্দ্র এখন বুঝিতে পারে না লাবণ্যের এত লজ্জা এত সঙ্কোচ কিসের। আদর,—তা মৃগেন্দ্র ত যথেষ্ট করে; কৈ লাবণ্য ত মুখ ফুটিয়া সে আদরের প্রতিদান দেয় না। 'এমন করিয়া কলেজ পলাইয়া মাতার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া ভ্রাতৃজায়ার নিকট সম্ভ্রম খোয়াইয়া একটী মিষ্ট কথার আশায় চাহিয়া রহিয়াছি তাহা কি গো সে বুঝিতে পারে না?'

লাবণ্য বুঝি তাহা বুঝিল না। চক্ষুত অবনত হইল, হস্তও মৃগেন্দ্রের কপোল হইতে অপসারিত হইল। মৃগেন্দ্র আবার চক্ষু নিমীলিত করিল। বন্ধু প্রিয়নাথের পত্নির বাসঘরেই গীতাভিনয়ের কথা মনে আসিল, সতীশের নবপরিণিত ভার্য্যার রঙ্গরসের গল্প স্মরণ হইল। অমনি তাহার দুঃখ আরও গাঢ় হইল। মৃগেন্দ্র নয়ন আবদ্ধ করিয়া কত কি চিন্তা করিল। আশার নৈরাশ্য, অশিক্ষিতার বিবিধ জঞ্জাল, বঙ্গসমাজের অধঃপতন এবং সর্ব্বশেষে নিজের হতভাগ্য, এই সকল তত্ত্বের কতই আলোচনা করিল। মৃগেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। লাবণ্যময়ী যেমন বসিয়াছিল সেইরূপ বসিয়া রহিল। সে যেন কাষ্ঠ পুত্তলিকার মূর্ত্তি!

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। মৃগেন্দ্র চক্ষুমিলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল এবং লাবণ্যের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিল। মৃগেন্দ্র সেই লাবণ্যমাখা মুখখানি দেখিয়া অমনি পূর্ব্বের বিরক্তি অসন্তোষ বিস্মৃত হইল এবং পত্নীর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—'মরি এ গোলাপ কি ফুটিবে না?

পোড়ারমুখী লাবণ্য স্বামীর কর হইতে মুখখানি অপসারিত করিল। মৃগেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল—'বলি এত লজ্জা কেন? ঘরে ত কেউ নাই,

দুটা কথা কও, না কেবল ঘোমটা দিয়ে মাকাল হয়ে বসে থাকবে ? এল খুব সরম হয়েছে—এই বলিয়া মৃগেন্দ্র পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে টানিয়া লইল।

লাবণ্য বলপূর্ব্বক স্বামীর বক্ষ হইতে ছিন্ন হইল। এবার কথা ফুটিল লাবণ্য অস্ফুট স্বরে বলিল—'মাথাটা কি ভাল হল ?' মৃগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, এতক্ষণে ঠাকুর বুঝি সিন্নি নিলেন তাই মুখ হতে কথা খস্‌ল ?

লাবণ্য চুপ করিয়া রহিল।

মৃগেন্দ্র। তোমার এত লজ্জা কিসের, কথাইবা কওনা কেন ? দেখ স্বামী স্ত্রীতে মনের কথা না খুলিয়া কহিলে—

লাবণ্য বস্ত্রাদি গুছাইয়া উঠিবার আয়োজন করিতেছিল। মৃগেন্দ্র কথা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার বস্ত্র ধরিয়া বলিল—'উঠে যাও কোথা ?

লাবণ্য মৃদুস্বরে বলিল—'আমি যাই, মা, দিদি, ঠাকুরঝি এরা কি মনে ক'রবে ?

মৃগেন্দ্র।' কি আবার মনে করবে। তুমিত অপর পুরুষের কাছে থাক নাই যে ভয় !

লাবণ্য কাপড় ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—'না আমি যাই আমার লজ্জা করে।'

মৃগেন্দ্র। লজ্জা আবার কি ! কেন, দেখতে পাওনা কি বউ কতক্ষণ দাদার ঘরে থাকে !

লাবণ্য। না ! ওরা যে বড়।

মৃগেন্দ্র বলপূর্ব্বক লাবণ্যের বস্ত্র ধৃত করিয়া রহিল, সুতরাং তাহার আর পলায়ন হইল না। মৃগেন্দ্র পুনরায় আরম্ভ করিল—

দেখ প্রিয়নাথের স্ত্রী সরলা কেমন গান গাইতে পারে, কেমন হারমনিয়া বাজায়

লাবণ্য আবার কথা কহিল মৃদুস্বরে বলিল—'সে বুঝি ভাল ? ওযে গোরা বিবির কারখানা।'

মৃগেন্দ্র। কেন বেশ ত ! হারমনিয়া বাজিয়ে স্ত্রী গান গাইবে আর স্বামী শুনিবে সে কেমন সুখের ? আমার বড় সাদ্‌ তোমার ঐ চাঁপা ফুলের মত আঙ্গুল গুলিতে হারমনিয়া বাজাও।

লাবণ্য চুপ করিয়া রহিল, মৃগেন্দ্র পুনরায় আরম্ভ করিল

যখন জ্যোৎসনায় স্ফটিক ফুটিবে তখন ছাদে ফুলের গাছের মাঝে বসিয়া তুমি যেন নিম্‌ফ এব বনদেবীর ন্যায় গান গাইবে! আমি তোমার পাশে শুইয়া শুনিব। কি সুন্দর বল দেখি?

লাবণ্য বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছিল, কোন কথা কহিল না।

মৃগেন্দ্র। তুমি পড়াশুনা করনা কেন? পড়তে আরম্ভ কর। কেমন ভাল ভাল গল্পের বই আছে, সে সব পড়ে কত আমোদ পাবে। এ সব জান্‌তে ইচ্ছা করে না?

লাবণ্য আর একটু বলপূর্ব্বক বস্ত্র টানিয়া অতি অস্ফুট স্বরে বলিল 'ছাড়না।'

মৃগেন্দ্র। অত ব্যস্ত কেন? ভাল কি বলিতেছিলাম—'হ্যা—বিষবৃক্ষ ব'লে একখানা গল্পের বই আছে, সেখানা যদি পড়! গল্পটা একটু বলি শুন, নগেন্দ্র নামে একজন ভদ্রলোক—

গল্প বলিবার বড় সুবিধা হইল না। কেন না লাবণ্য বস্ত্র ধরিয়া বড় টানা টানি আরম্ভ করিয়াছে। মৃগেন্দ্র কিছু বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া উঠিল, একটু রুক্ষ স্বরে বলিল,—'পাড়াগেঁয়ে ন্যাড়া আর কি! ভাল কথা বললে শুনিবে না। মুখ যেন ছুঁচে সেলাই করে দিয়েছে; মুখে কথা নাই।'

লাবণ্যের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল মৃগেন্দ্র তাহা দেখিল না। সে তখন রাগিয়াছিল।

মৃগেন্দ্র। আমার কথা শুন, লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ কর, (একটু স্নেহস্বরে বলিল) মনে কর আমি বিদেশ গিয়াছি, তখন চিঠি না লিখিতে জানিলে কি হবে?

লাবণ্য এবারও কোন কথা কহিল না। মৃগেন্দ্র আরও স্বর নম্র করিয়া বলিল, দেখ দেখি কেমন সুন্দর কবিতা

"কোথা ছিলে প্রিয়তমে অভাগায় ভুলে!
জীবন প্রভাত আগে
স্মৃতি মম পুন জাগে
পড়ে মনে পূর্ব্ব কথা শত শত মিলে
কোথা ছিলে প্রিয়তমে অভাগায় ভুলে"

সে যে গো অনেক কথা
ফুল তুলে মালা গাঁথা
কত হাসি কত খেলা মন্দাকিনী কূলে
কোথা ছিলে প্রিয়তমে অভাগায় ভূলে।”

শ্রোতা যে কবিতার আবৃত্তিতে বিশেষ অমনোযোগী তাহা তাহার চঞ্চলতা, চতুর্দ্দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ ও বস্ত্রের আকর্ষণেই বিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। সুতরাং মৃগেন্দ্র ক্ষুব্ধচিত্তে আবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি হইল। ফুলশয্যার দিনে মৃগেন্দ্র এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিল;—মনে মনে আশা করিয়াছিল যে সেই সুখ রজনীতে ফুলদলে গাথিয়া এই ফুলকুলেশ্বরীকে জীবনের প্রথম আহ্বান উপহার দিবে। কিন্তু হায় সে আশা ত তাহার পূর্ণ হইল না। রাত্র প্রভাত হইল, কোকিলের কণ্ঠ ফুটিল কিন্তু নব বধুর ত কথা ফুটিল না। ক্ষোভিত মর্ম্মপীড়িত বর তাহার যত্নের কবিতাটী খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া গেল। কতকদিন পরে মৃগেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইল, আবার আশা দেখা দিল। সে সেই কবিতাটী পুনরায় লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিল। এতদিন পরে আবার সেই কবিতা, কিন্তু হায় এবারও সেই অদৃষ্ট! ধৈর্য্য বুঝি আর থাকে না! সাধের বাসনায় নৈরাশ হইয়া মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে ক্রোধে চুপ করিয়া রহিল।

লাবণ্য এত কথা ভাবিয়াছিল কি না জানি না। সে বস্ত্র টানাটানি করিতে করিতে আবার মৃদুস্বরে বলিল—আ! ছাড়না! আমি যাই।

মৃগেন্দ্রর মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে কর্কশ স্বরে বলিল—‘নাও এই তোমার কাপড়। কোথা যাবে যাও। কথা নেই বার্ত্তা নেই কেবল য্যাই য্যাই। পাড়াগেঁয়ে ভূত অসভ্য তার আবার কত ভাল হবে?

লাবণ্যের বদন আরক্ত হইল চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। কিন্তু মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়াছিল সে ইহা লক্ষ্য করিল না। সে সেইরূপ কর্কশ কথন বা বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল

‘পাড়াগেঁয়ে বর্ব্বরের হাতে জীবনের সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট হল। না জানে লিখতে না জানে পড়তে! দুই খানা ভাল বই পড়বে, খপরের কাগজ পড়ে জগতের খপর রাখবে। তবে ত স্ত্রীর সহিৎ কথাবার্ত্তায় সুখ।

তা নয়, কেবল বোবার মত বসে থাকবে আর কথা কহিলে কেবল ঘ্যান ঘ্যান করবে। পাড়াগেঁয়ে ভূত, দুট কথা বলতেও জানে না!

লাবণ্যের চক্ষে যে অশ্রু আসিয়াছিল তাহা ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু মৃগেন্দ্রের সে দিকে দৃষ্টি নাই। বাক্যস্রোতে তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে আরও বলিতে লাগিল—

'তখনই মাকে বলিয়াছিলাম যে অমন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে মা ঘরে এন না। তা তখন কেউ আমার কথা শুনলে না। কনের চাঁদমুখ দেখে সকলেই একেবারে ভূলে গেলেন আর কি। যেন স্থলপদ্ম! কেবল জাঁকাল চেহারা খানাই আছে। এক ফোঁটা গুণ নাই।

কথাগুলা বুঝি বালিকার প্রাণে বড়ই আঘাত করিয়াছিল। তাই বুঝি সে একবার ঈষদ্ শব্দ করিয়া রোদন করিয়া ফেলিল। মৃগেন্দ্র ইহাতেও শান্ত না হইয়া রুক্ষস্বরে বলিল—ন্যাকামি করে আবার লোক জানাতে বস্‌লেন!

মগেন্দ্র রাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেল।

(২)

লাবণ্যের অশ্রু উছলিয়া ধারা বহিয়া পড়িতেছে এমন সময়ে সিঁড়িতে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুত হইল। অমনি বালিকা শশব্যস্তে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিয়া ফেলিল—এ দিকে বড় বধূ অনঙ্গসুন্দরী ও ননদিনী মধুমতী হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল এবং একেবারে সমস্বরে বলিল—'কিলো রাই-কিশোরী! বেলা যে পড়ে এল, তবু ঘর হতে বরছেড়ে বেরুতে চাস্‌নে যে। বলি খুব রঙ্গরসে ছিলি নয়?

লাবণ্য কিন্তু পাছে বস্ত্র আর্দ্র ইহা ধরা পড়ে এই আশঙ্কায় সেই দিকে সতর্ক হইবার জন্য বিশেষ মনোযোগী ছিল। জা ও ননদিনীর কথায় কোন উত্তর করিল না।

মধুমতী। বল না ভাই, ছোট দাদার সঙ্গে কি এত কথা কইলি। ননদিনীর স্নেহ মাথা কথায় লাবণ্য কেবল একটু হাসিল।

অনঙ্গ। কি গানটী ঠাকুরপোর কাছে গাইলি সেটী গানা।

লাবণ্য আশ্চর্য্যসূচক স্বরে বলিল—সে কি দিদি! আমি কেন গান গাব।

মধুমতী। তবে বুঝি ছোট দাদা গাইলে? আচ্ছা সেই গানটীই গা।

লাবণ্য হাসিয়া বলিল—তোমরা আচ্ছা যা হউক ভাই, আমি পাড়া-গেঁয়ে ভূত, আমি গানটান জানি না।

লাবণ্য ঐ নিন্দা সূচক বাক্যটা এমন ভাবে উচ্চারণ করিল যে তাহা শুনিয়া অনঙ্গ ওষ্ঠ বিকৃত করিয়া বলিল—তোকে বুঝি ঠাকুরপো ঐ সব কথা বলেচে? কি আমার ওঁরা সহুরে রে। আমাকেও ভাই ঐ কথা ব'লে ও ঠাট্টা করে। দেখে বাঁচিনে!

মধুমতী। তা যাই বল ভাই পাড়াগেঁয়েরা ভাই বড় অসভ্য।

অনঙ্গ। কি আমার সভ্যরে। ডাকনা—আয়নার কাছে দাঁড়াগ্ তখন দেখা যাবে কে অসভ্য!

সহোদর দ্বয় অবশ্য সুন্দর কিন্তু বধূদ্বয়ের ন্যায় তাহাদের শ্রী উছলিয়া পড়ে না, মধুমতীও বুঝি অত সুন্দর নয়। সুতরাং সৌন্দর্য্যের গৌরবে মধুমতী 'হটিল'।

মধুমতী। পুরুষের আবার চেহারা কি, আমার ভেয়েদের মত অত গুণ কার শরীরে?

অনঙ্গ। ইস্, সে গুণ করেছে কে? বলি যে বশ হয় তার গুণ বেশী, না যে বশ করে তার গুণ বেশী?

মধুমতী অনঙ্গসুন্দরীর বাক্যচাতুর্য্যের জালে আবদ্ধ হইল, সে দেখিল এ পথেও ভ্রাতৃজায়া অজেয়।

মধুমতী। তা যা বল ভাই, পাড়াগেয়ে লোকেরা বড় অসভ্য।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—এই অসভ্যরাই আবার মাথার মণি হয়।

এই বাক্যযুদ্ধের মধ্যে থাকিয়া লাবণ্য পূর্ব্ব অনাদরের কথা ভুলিয়া গেল। সেও হাসিতে লাগিল।

মধুমতী। সে কথা যাগ্। ছোট বউ, ভাই তুই একটা গান গা না শুনেছি পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা নাকি পুকুরে সাঁতার কাটে আর মাঠে লুকিয়ে গান শেখে।

অনঙ্গ। আর সহুরে মেয়েরা বুঝি ছাতে উঠে ভাতার খোঁজে?

মধুমতী। ভ্যালা! তোকে কিছুতেই পারবার যো নেই ভাই। এখন ও সব কথা যাক্। ছোট বউকে একটা গান গাওয়া।

অনঙ্গসুন্দরী লাবণ্যের চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—লক্ষ্মী বনটী আমার, একটী গান গাওত।

নন্দিনী বিনোদিনী ছুটে আয়না ভাই।
সিং দোয়ারে পড়ে বুঝি ঠাকুর জামাই॥

লাবণ্য ও মধুমতী হাসিয়া উঠিল।

মধুমতী। তুই না হয় একটা গান গা।

অনঙ্গ। হাঁ! এখন সব আফিস্ হতে আসবার সময় হল, এখন গান গাইবার সময় বটে।

কিন্তু মধুমতী বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, সুতরাং অনঙ্গসুন্দরী দুই একবার অস্বীকার করিয়া শেষে গান গাহিল।

(আমি) মনের কথা সই বলব কারে।
হৃদয়ের জ্বালা যত গাথা স্তরে স্তরে॥
ফুল তুলি বন পথে বসে থাকি মালা গেঁথে
যদি সে গো আসে নিশিতে।
শুখায় লো ফুল মালা দেখা ত দেয় না কালা
সকলই আশার ছলা
পরাণ রেখেছি সখি বৃথা আশা ধরে॥

বঙ্গের কুলকামিনী এইরূপ গৃহের কোণে লুকাইয়া যদি গান গায় তাহা কতদূর দূষনীয় সে বিচারের ভার সুবিজ্ঞ পাঠকের উপর অর্পণ করিলাম। অনঙ্গসুন্দরী গীতটী একবার সমাপ্ত করিল। লাবণ্য অতি মৃদুস্বরে বলিল দিদি আর একটীবার গাও না। অনঙ্গ হাসিয়া আবার গাইল

ফুল তুলি বন পথে বসে থাকি মালা গেঁথে
যদি সে গো আসে নিশিতে

এমন সময়ে ধীরে ধীরে একটী যুবক নিঃশব্দে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা কাহারও লক্ষ্য হইল না। রমনীকণ্ঠে অনঙ্গ গাহিল—

শুথায় লো ফুল মালা দেখা ত দেয় না কালা

এবার মধুমতীও ভ্রাতৃজায়ার সহিৎ কণ্ঠ মিলাইয়া গাইল

দেখা ত দেয় না কালা—

ঠিক্ এই সময়ে লাবণ্য 'ও মা কি হবে!' বলিয়া ঈষৎ চিৎকার করিয়া এক হস্ত পরিমিত অবগুণ্ঠন টানিয়া পালঙ্কের পার্শ্বে পলাইয়া গেল। অনঙ্গসুন্দরী এবং মধুমতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল বিজয় প্রসাদ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

অনঙ্গসুন্দরী দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া অবগুণ্ঠন দিল। মধুমতীও মস্তকে বস্ত্র ঈষদ্ টানিয়া দিল। বিজয় হাসিতে হাসিতে বলিল—বউ দিদি বেশত গাইতেছিলেন, গান না, আমরা একটু শুনি।

সকলে বুঝিল যে আফিস হতে বড় বাবু ও জামাই বাবু উভয়েই আসিয়াছেন। বিজয়প্রসাদ কখন কখন আফিস হইতেই শ্বশুরালয়ে আসেন।

মধুমতী অগ্রসর হইয়া ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিল—আমরা যা করি না কেন, তুমি এখানে এলে কেন?

মধুমতী ও অনঙ্গসুন্দরী সমবয়স্কা, তাই মধুমতী তাহার সাক্ষাতে স্বামীর সহিত দুই একটা কথা কহে।

মধুমতীর বাক্যে বিজয়প্রসাদ হাস্য করিয়া বলিল—'কেন কিছু কি অন্যায় হয়েছে? আমি সংবাদ দিতে এলাম যে বউঠাকুরুণের আর বিরহ বেদনায় কাজ নাই, ওদিকে শ্যামচাঁদ এসে হাজির হয়েছেন। শীঘ্র গিয়া প্রভাসমিলন করুন, আমাদের দেখে নয়ন স্বার্থক হউক।

মধুমতী স্বামীর প্রতি ঈষৎ প্রেমকটাক্ষ করিয়া অনঙ্গসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অনঙ্গসুন্দরীও ঈষৎ মৃদু হাস্য করিল। অনঙ্গ ঠাকুরজামাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা কহে না। বিদ্রূপ আদি করিতে হইলে পরিচারিকার সাহায্য অবলম্বন করিয়া কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে অনঙ্গসুন্দরী বিজয়প্রসাদের কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বিজয়প্রসাদ তথা হইতে প্রস্থান করিলে তিন জনে মিলিয়া অনেক হাস্য করিল। তারপর অনঙ্গসুন্দরী 'যা ভাই আফিস্ বাবুর তত্ত্ব লইগে' বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ক্রমশঃ

দুগ্ধের গুণাগুণ।

জগতে দুগ্ধ ব্যতীত এমন কোন খাদ্য নাই, কেবল যাহার প্রতি নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করা যায়। 'ক্ষীরং জীবনীয়াং প্রবরং' জীবন হিতকর পদার্থের মধ্যে ক্ষীরই শ্রেষ্ঠ। যখন জননীগর্ভে সন্তানের সঞ্চার হয়, তখন তাহার নাভি-নাড়ী মাতার রসবাহিনী নাড়ীর সহিত সম্বদ্ধ থাকে। সেই নাড়ী, মাতার আহার রস বহন করিয়া, সন্তানকে বর্দ্ধিত করে। কোমল-দেহ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, কিরূপে জীবনধারণ করিবে, বিধাতা তাহারই বিধান করিয়া, কোমল মাতৃস্তনে এই অমৃতের সঞ্চার করিয়া দেন। সদ্যোজাত শিশু তাঁহারই প্রদত্ত মৃদুশক্তি-প্রভাবে সেই জীবনপ্রদ অমৃতটুকু পান করিয়া দিন দিন পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বালকের জীহ্বা ও ওষ্ঠের শক্তি যেরূপ, তাহাতে ভগবানের এই কৌশলে জীবের অশেষ উপকার হয়।

"ধমন্যঃ সংবৃতদ্বারাঃ কন্যানাং স্তন-সংস্থিতাঃ।
তাসামেব প্রজাতানাং গর্ভিণীনাস্ত তাঃ পুনঃ॥
স্বভাবাদেব বিবৃতা জায়ন্তে সম্ভবস্ত্যতঃ।
রসঃ প্রসাদো মধুরং পক্বাহার-নিমিত্তজঃ।
কৃৎস্ন দেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তং স্তন্যমিত্যভিধীয়তে॥"

যে রমণীগণের সন্তান জন্মে নাই, তাঁহাদের স্তনস্থিত ধমনী সকলের দ্বার সংরুদ্ধ থাকে। গর্ভিণী এবং প্রসূতা রমণীদিগের স্তনস্থিত ধমনী সকলের দ্বার ভগবানের ইচ্ছায় উন্মুক্ত হয়। সেই উন্মুক্ত পথে মাতার আহারীয় দ্রব্য পরিপাক হইয়া যে রসের উৎপত্তি হয়, সেই রসের উত্তম সারভাগ-নির্ম্মল ভাগ-সকল, দেহ হইতে স্তনে সঞ্চারিত হইয়া, দুগ্ধরূপে নিঃসৃত হয়।

"ধমনীনাং হৃদি স্থানাং বিবৃতত্বাদনন্তরং।
চতুরাত্রাত্রিরাত্রাদ্বা স্ত্রীণাং স্তন্যং প্রবর্ত্তে।"

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, ঐ উন্মুক্ত পথে চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে।

"আহার-রস-জনিত্বাদেবং স্তন্যমপি স্ত্রিয়ঃ।
তদেবাপত্য সংস্পর্শাদ্দর্শনাৎ স্মরণাদপি।

গ্রহণাচ্চ শরীরস্য শুক্রবৎ সংপ্রবর্ত্ততে।
স্নেহো নিরুত্তর স্তত্র প্রস্রবে হেতুরুচ্যতে॥"

দুগ্ধ, রমণীগণের আহার-রস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, অপত্য দর্শন, অপত্য স্পর্শন, অপত্য স্মরণ এবং সন্তানের শরীর গ্রহণ মাত্র নিঃসৃত হইতে থাকে। মাতৃ-স্নেহই দুগ্ধ-নিস্রবের একমাত্র হেতু। প্রত্যেক মাতাই এই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

আমরা দেখিতেছি, শিশুর গর্ভাবস্থান কালে মাতার আহার-রস তাহাকে পুষ্ট করে এবং ভূমিষ্ট হইলেও ঐ রসের সারভাগ তাহাকে বর্দ্ধিত করে। সে তাহার দেহপোষণোপযোগী পদার্থটি একেবারেই প্রাপ্ত হয়।

শিশু ছয়মাসকাল কেবল স্তন্যদুগ্ধ বা স্থলবিশেষে স্তন্য ও গব্য দুগ্ধ পান করিয়াই জীবিত থাকে। সুতরাং শিশু প্রথমে ক্ষীর-ভোজী, পরে দন্তোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরান্নভোজী, তৎপরে কেবল অন্নভোজী হইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আমি দেখিতে পাই, ক্ষীরভোজীশিশু কেবল ক্ষীর পান করিয়াই জীবনধারণ করিতে পারে; কিন্তু অন্নাহার-কালে এক-প্রকার অন্নগ্রহণ করিয়া কখনই জীবন-রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; তজ্জন্যই এক সঙ্গে নানাবিধ আহারীয় দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। সেই নানাবিধ সামগ্রী হইতে শরীরের পোষণ হইয়া থাকে। তাহা হইতেই রসের উৎপত্তি হয়। এই রস সপ্তধাতুর মূল; আহারীয় দ্রব্যের পরিপাক হইলে যে রস জন্মে, শিশুরা তাহারই সারাংশ দুগ্ধরূপে প্রাপ্ত হয়; তাহাতেই তাহারা শরীর পোষণোপযোগী পদার্থ পাইয়া থাকে। এই পদার্থে শরীর রক্ষার উপযোগী যে যে সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহাই বিদ্যমান থাকে; শুতরাং স্তন্যপায়ী শিশু কেন বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইবে না?

এখন, এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "রসাদ্রক্তং স্ত্রিয়াস্তন্যং" এক রস হইতে লোহিত বর্ণ রক্ত এবং শঙ্খবৎ ধবল দুগ্ধের উৎপত্তি কিরূপে হইল? এখানে স্বভাবকে স্মরণ করিতে হইবে। যেমন স্বভাব, একটি কুসুমের বিভিন্ন দলে বিভিন্ন রঙ পরাইয়া দেয়, তেমনই এখানেও এক এক স্থানে রস ধাতুকে এক এক রঙে রঞ্জিত করিয়া দেয়। অথবা দৈহিক উত্তাপের তারতম্য বশতঃ রক্ত এবং স্তন্য বিভিন্ন রঙ প্রাপ্ত হয়। পিত্তই আমাদের দৈহিক

তাপ, পিত্তের সংস্রবেই রস রক্তে পরিণত হয়। আর দুগ্ধ রসের সারাংশ বলিয়া শুভ্র। নারীদুগ্ধের গুণঃ—

"জীবনং বৃংহনং সাতম্যং স্নেহনং মানুষং পয়ঃ।
নাবনং রক্তপিত্তেচ তর্পণং চাক্ষিশূলিনাং॥"

মহামুণি চরক বলেন,—নারীদুগ্ধ জীবন বৃদ্ধিকারী, দেহের স্থূলতা-কারক, সুখদায়ক। রক্তপিত্তরোগে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, স্তন্য-দুগ্ধের নস্য লইলে তাহার শান্তি হয়। চক্ষুশূল হইলে উহা দ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে যাতনা দূর হয়। স্তন্য দুগ্ধের শেষোক্ত গুণ দুইটী বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

"নার্য্যাস্তু মধুরং স্তন্যং কষায়ানুরসং হিমং।
নস্যাশ্চোতনয়োঃ পথ্যং জীবনং লঘুদীপনং॥"

সুশ্রুত বলেন, নারীদুগ্ধ মধুর, ঈষৎ কষায়রস (কষা), লঘু এবং অগ্নি-বৃদ্ধিকারী।

নারীস্তন্য আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বলিয়া, অগ্রে তদ্বিষয় উল্লিখিত হইল।

মানবগণ প্রধানতঃ আট প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে। যথা;—

"আবিক্ষারমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যৎ।
উষ্ট্রীণামথনাগীনাং বড়বায়াঃস্ত্রিয়স্তথা॥"

মেষ, ছাগ, গো, মহিষ, উষ্ট্র, হস্তী, ঘোটক এবং স্ত্রীদুগ্ধ। এই সকল দুগ্ধের সাধারণ গুণ এই—

"প্রায়শো মধুরং স্নিগ্ধং শীতং স্তন্যং পয়োমতং।
প্রীণনং বৃংহণং বৃষ্যং মেধ্যং বল্যং মনস্করং॥
জীবনীযং শ্রমহরং কাসশ্বাসনিবর্হণং।
হন্তি শোণিত-পিত্তঞ্চ সন্ধানং বিহতস্য চ॥
সর্ব্ব প্রাণভৃতাং সাতম্যং শমনং শোধনস্তমা।
তৃষ্ণাঘ্নং দীপনীয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং ক্ষীণক্ষতেষু চ।
পাণ্ডুরোগেহম্ল পিত্তে চ শোষে গুল্মে তথোদরে।
অতীসারে জ্বরে দাহে শ্বয়থৌ চ বিধীয়তে॥
যোণি শুক্রপ্রদোষে চ মূত্রেষু প্রদরেষু চ।
পুরীষে গ্রথিতে পথ্যং বাতপিত্ত-বিকারিণাং॥

নস্যালেপাবগাহেষু বমনা স্থাপনেষু চ।
বিরেচনে স্নেহনে চ পয়ং সর্ব্বত্র যুজ্যতে ॥"

অধিকাংশ দুগ্ধই মধুর রসবিশিষ্ট (কেবল নারীদুগ্ধ এবং ছাগদুগ্ধ ঈষৎ কষায় রস-যুক্ত), স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, এবং শীতবীর্য্য বলিয়াই অম্লপিত্তনাশক, স্নিগ্ধ ও মধুর রস হওয়ায়, দুগ্ধ বায়ুনাশকারী। দুগ্ধ কফ বৃদ্ধিকারক; কফ জন্য রোগে ইহার ব্যবহার বিধেয় নহে।

"জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবর্দ্ধন্তি মানবং ॥"

জীর্ণজ্বরে এবং ক্ষীণকফে দুগ্ধ অমৃততুল্য কার্য্য করে; তরুণজ্বর এবং তরুণকফে দুগ্ধ পান করিলে, উহা বিষবৎ মনুষ্যকে নষ্ট করে।

যে নারীর স্তনে দুগ্ধের অভাব, তাঁহাকে নিয়মমত দুগ্ধ পান করাইলে, প্রচুর স্তন্য দুগ্ধ জন্মিতে পারে। দুগ্ধ অত্যন্ত প্রীতিকর পদার্থ। পিপাসায় কিছু দুগ্ধ পান করিলে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করা যায়, পিপাসারও শান্তি হয়। ক্ষীণদেহ পুষ্ট করিতে দুগ্ধের তুল্য আর কিছুই নাই। ইহা অত্যন্ত শুক্র হিতকারী। নিয়মমত দুগ্ধ পান করিলে, স্মরণ-শক্তি-বিহীন ব্যক্তির স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত হয়। দুগ্ধ মনের অনুকূল পদার্থ, জীবনের হিতকারী অর্থাৎ আয়ুবর্দ্ধক। শ্রমক্লিষ্ট ব্যক্তির শ্রান্তিহারী, শ্বাস-কাস দমনকারী। রক্তপিত্তরোগে ইহা মহৌষধ। দুগ্ধপানে ভগ্নাস্থি সংযুক্ত হয়। ইহা যথা-সম্ভব প্রাণিগণের অতীব সুখপ্রদ। ইহা মলের দোষনাশক, অগ্নি বৃদ্ধিকারী শুক্র ক্ষীণ রোগে শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডু, গুল্ম, অম্লপিত্ত উদরদাহ এবং শোথে বিশেষ উপকারী, যোনিদোষ, মূত্রদোষ এবং প্রদরে পথ্য। দুগ্ধে যেরূপ বহুগুণ বিদ্যমান, আমাদের অন্য কোন আহারীয় দ্রব্যে এরূপ গুণবাহুল্য দৃষ্ট হয় না। একমাত্র দুগ্ধই আমাদের জীবন রক্ষার উপযোগী।

উল্লিখিত আট প্রকার দুগ্ধের মধ্যে নারীদুগ্ধই আমাদের দেহ-পোষণ জন্য প্রথম পানীয়, যখন নারী-দুগ্ধে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, তখন গব্যদুগ্ধ আমাদের জীবন-রক্ষার অবলম্বন হয়। গোদুগ্ধের বিশেষ গুণ—

"গোক্ষীরং অনভিষ্যন্দি স্নিগ্ধংগুরু রসায়নং।
রক্তপিত্তহরং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
জীবনীয়ং তথা বাতপিত্তঘ্নং পরমস্মৃতং ॥"

গো-দুগ্ধ—বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই ত্রিদোষ এবং রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র প্রভৃতি সপ্তধাতু ও মল, শিরা এবং ধমনীর ক্লেশ-জনক নহে। এই দুগ্ধ স্নিগ্ধ, গুরু জরা-ধ্বংশকারী, রক্তপিত্ত হর, শীতগুণ বিশিষ্ট, রসে ও পাকে মধুর, আয়ুবর্দ্ধক অত্যন্ত বাতপিত্ত নাশক।

"স্বাদুশীতং মৃদুস্নিগ্ধং বহুলং শ্লক্ষ্ণ পিচ্ছিলং।
গুরু মন্দ প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ॥"

চরক বলিয়াছেন, স্বাদুতা, শীতলতা, মৃদুতা, স্নিগ্ধতা, বহুলতা (ঘনত্ব) মসৃণতা, পিচ্ছিলতা, গুরুতা, মন্দতা, প্রসন্নতা, (নির্ম্মলতা) গোদুগ্ধের এই দশ গুণ।

গো-দুগ্ধের কর্ম্ম সম্বন্ধে চরক বলেন,—

"তদেবং গুণমেবৌজঃ সামান্যাদভি বর্দ্ধয়েৎ।
প্রবরং জীবনীয়ানাং ক্ষীরমুক্তং রসায়নং॥"

আমাদের হৃদয়ে ওজঃ নামক একটী পদার্থ আছে। তাহাই আমাদের তেজ এবং বল। এই ওজঃ গোদুগ্ধের তুল্য গুণবিশিষ্ট। আমাদের ওজঃ নষ্ট হইলে, আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। চরক বলেন,—

"——প্রাণায়াতনমুত্তমং।
দেহস্তাবচবস্তেন ব্যাপ্তো ভবতি দেহিনাং।
তদভাবাচ্য শীর্য্যন্তে শরীরাণি শরীরিণাং॥"

ওজঃ প্রাণের উত্তম আধার। দেহাদিগের সকল অবয়ব তৎকর্তৃক ব্যাপ্ত থাকে ইহার অভাবে শরীরিদের শরীর নষ্ট হয়। এই ওজঃ ক্ষয় হইলে, তত্তুল্য গুণবিশিষ্ট দুগ্ধ পান করা নিতান্ত আবশ্যক। ওজঃ বৃদ্ধির জন্য ও দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। জীবন-হীতকর যত দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে গো-ক্ষীর শ্রেষ্ঠ—ইহা জরারূপ ব্যাধি-নাশকারী।

"গোক্ষীরং ক্ষীরাণাং হিততম্।"

যত প্রকার ক্ষীর আছে, তন্মধ্যে গো ক্ষীরই হিতকারী।

"গব্যতুল্য-গুণং ত্বাজং বিশেষাচ্ছোষিণাং হিতং।
দীপনং লঘুসংগ্রাহী শ্বাসকাসাস্রপিত্তনুৎ॥"

সুশ্রুত বলেন, ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধের তুল্য গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ রাজযক্ষা রোগগ্রস্তের পক্ষে উপকারী, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাকী, মলসংগ্রাহী, হাঁপকাশ ও রক্তপিত্ত-নাশক। ক্রমশঃ।

বসন্তের প্রারম্ভে মেঘোদয়।

"মেঘালোকে ভবন্তি সুখিনো, পুণ্যথাবৃত্তিশ্চেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনীজনে কিং পুনর্দূর সংস্থে॥"

(১)

আজ এ মাঘের শেষে, এ বিদেশে ভাবি ব'সে,
এই যে শীতের অন্ত, হয় হয় হয় না!—
বসন্ত আসিবে বোলে, প্রাণান্ত প্রভাত কালে,
ঝর্ ঝির্ সমীরণ, বয়্ বয়্ বয়্ না!
পল্লব মুকুল ফুল, অলিকুল সমাকুল,
কি যে কথা মনমাঝে, আসে যায় রয় না;
থেকে থেকে প্রাণাকুল, কাজকর্ম্মে হয় ভুল,
কুলবধু কি যে কথা, কয় কয় কয় না!
যাই যাই নিরজনে, প্রাণ যেন সদা টানে,
গুরুজন দরশনে ভয় ভয় যায় না;
চমকিয়া শুনি কানে, কোকিল কোকিলাসনে
কুঞ্জবনে কুহুকুহু গায় গায় গায় না!
এ বড় বিপদ ভাবি, বুঝেও বুঝিতে নারি,
যে কাজেতে হাত দেই হয় হয় হয় না!
ইচ্ছা করে নিরজনে, ভাবি বোসে এক মনে,—
কি যে ভাবি—মন যেন, বুঝেও তা বোঝে না!

(২)

বাসন্তি, বসন্ত এল, না বোলে কি করি বল?—
কা'ল যে নিশির শেষে, কাদম্বিনী ঘটা লো?
গুরু গুরু গরজন, মৃদুমন্দ বরষণ!
তার মাঝে সে যে ভাই, সৌদামিনী ছটা লো?
নিরখি আকুল প্রাণ, প্রাণে যেন হানে বাণ!
নয়ন উদাস করি, চারিদিকে চাই লো!

কি যে দেখে আঁখি দুটি, প্রাণ করে ছুটা ছুটি!—
অসময়—সে সময় কার কাছে যাই লো?

(৩)

হাসিয়া বাসন্তি বলে, এই হল এই কালে,
বসন্তের যেই ভাব সেই ভাব এই লো!
আসিছেন ঋতুরাজ, ভবে তাঁর এই কাজ,
তোমার আমার আর কাজকর্ম্ম নাই লো!
বসন্ত আসিবে মাত্র, শুনি মোর দহে গাত্র,—
তেঁই সেই প্রিয়পাত্রে নেত্রে নেত্রে রাখি লো!
নির্জ্জনে নিরত থাকি, মুদিত করিয়া আঁখি,
যদি সে শ্রীমুখছবি হৃদয়েতে দেখি লো!

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

অন্নকষ্ট।

ভারতমাতার এত দুর্দ্দশা কেন? তাঁহার কোটী কোটী সন্তান শীর্ণ বিশীর্ণদেহ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হইয়া অন্নাভাবে ক্লিষ্ট কেন? কেন তাহারা "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে? কেনই বা "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে? এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। চিরকালইত ভারতের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। তবে এই শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? আজি কালি অনেকেই এই শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এ প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষতা বা বিপক্ষতা অবলম্বন করা উদ্দেশ্য নহে। নিরপেক্ষভাবে এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

অন্নকষ্টের প্রধান ও প্রথম কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। যখন ইংরেজেরা এদেশে প্রথম আধিপত্য স্থাপন করেন, সেই সময়ে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে বহু অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূমি লোকশূন্য ও বিনা আবাদে পতিত ছিল।

কিন্তু এক্ষণে বঙ্গদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে যে ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যে দুই কোটী দশ লক্ষ লোক প্রাণধারণ করিত, সেই ভূমিকে এক্ষণে প্রায় সাত কোটী অধিবাসীকে প্রতি-পালন করিতে হইতেছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। অরাজকতা দস্যুভয় প্রভৃতি বহুদিন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। যদিও মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক উপস্থিত হইতেছে কিন্তু তাহাতেও বিশেষ লোকসংখ্যা কমিতেছে না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিবিধানে স্বতই তৎপর। কোনও স্থানে কোন সংক্রামক রোগ বা মড়ক উপস্থিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ দলে দলে চিকিৎসক ও ঔষধ ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া সেই প্রদেশবাসীদিগের প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেই অন্নসত্র খোলা হয় ও সক্ষম ব্যক্তিদিগকে কার্য্য করাইয়া আহার দেওয়া হয়। ইহাতে যে কত লোকের জীবন রক্ষা হয়, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। যদিও এই সকল বিষয়ে নিম্নতম কর্ম্মচারীর অনেক ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় কিন্তু এতদ্দ্বারা যে অধিকাংশ লোক মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখুন, দেশে শান্তি স্থাপন ও লোকের প্রাণরক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কতই অন্যায় কার্য্য করিতেছেন!

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে জীবন সংগ্রাম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রতিবর্গ মাইল ভূমিতে ২৪৩ জন লোক প্রতি-পালিত হইয়া থাকেন। কিন্তু দেশীয় ও করদ রাজ্য সমূহে কেবল ৮৯ জন লোক প্রতিবর্গ মাইল ভূমি ভোগ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় ও করদ রাজ্য অপেক্ষা ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে গড়ে তিন গুণ অধিক লোক প্রতিবর্গ মাইল ভূমি ভোগ করিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত তুলনায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় এত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উর্ব্বরা ফ্রান্স ভূমিতেও ১৮০ জন লোক প্রতিবর্গ মাইল ভূমি অধিকার করিয়া থাকে। এমন কি লোকাকীর্ণ ইংলণ্ড ভূমিতে যে যে স্থলে প্রতিবর্গ মাইলে দুই শতের অধিক লোক হয় তখন অতিরিক্ত লোকদিগকে কল কারখানা প্রভৃতিতে কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। আয়র্লণ্ডের ঘোর দারিদ্র্যের বিষয় সকলেই

অবগত আছেন। কিন্তু আয়র্লণ্ডেও বিগত লোকসংখ্যা গণনা অনুযায়ী ১৬৯ জন লোক প্রতিবর্গ মাইল ভূমি অধিকার করিয়া থাকেন। আয়র্লণ্ডের আয়তনের সহিত উত্তরভারতের তেরটী জেলার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, উক্ত জেলা কয়েকটীতে প্রতিবর্গ মাইল ভূমিতে ৬৮০ জন লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গণনার সহিত বিনা আবাদি, পতিত ও জলা জমি বাদ দেওয়া হয় নাই। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট পাঠে দৃষ্ট হইবে বঙ্গদেশের দুই তৃতীয়াংশ কৃষক প্রত্যেকে ২ বা ৩ একার ভূমি অধিকার করিয়া থাকে। যদি প্রত্যেক কৃষক পরিবারে গড়ে চারিজন লোক থাকে, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দুই কোটী চল্লিশ লক্ষ লোকে এক কোটী পাঁচ লক্ষ একার ভূমি অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে অর্দ্ধ একার ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যে বহু কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে। ভারতবর্ষীয় ভূমি এই জীবন সংগ্রাম সহ্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। আয়র্লণ্ডে অনেক কল কারখানা আছে, তাহাতে বহু লোক প্রতিপালিত হয় কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অধিকাংশ লোক ভূমিকর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স শতকরা ৪২ জন লোক নগরে বাস করে ও কল কারখানায় কর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু ইংরাজাধিকৃত ভারতে শতকরা পাঁচ জন লোক অর্থাৎ বিশ জনের মধ্যে একজন নগরে বাস করে ও তন্মধ্যে অনেকেই চাকুরী ইত্যাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে। শতকরা নব্বুই জন লোক কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাণধারণ করে। যতই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই জীবনসংগ্রামও কঠোরতর হইতেছে। লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কঠিন পরিশ্রম করিয়াও যথেষ্ট আহার পাইতেছে না, ব্যয় সংকুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এইরূপে কত লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে ?

ভারতবর্ষীয় ভূমির উৎপাদিকা শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে লোক সংখ্যা অল্প ছিল, তজ্জন্য জমির অভাব ছিল না। কেবল উৎকৃষ্ট ভূমিসকল কর্ষিত হইত ও বহু জমি "পতিত" থাকিত। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল ভূমিও কর্ষিত হইতে লাগিল। এক্ষণে জমি এক বৎসরের জন্যও

বিশ্রাম পায় না, এমন কি সহস্র সহস্র একার ভূমিকে বৎসরে দুইবার করিয়া ফসল উৎপন্ন করিতে হয়। সুতরাং জমির উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। অধিকন্তু বন সকল পরিষ্কার করিয়া ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছে সুতরাং প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় ইন্ধনের অভাবে গোময় ব্যবহার করিতে হইতেছে। এই প্রকারে ভূমি দুইটী অর্থাৎ কাষ্ঠ ভষ্ম ও গোময়ের অ্যামো-নিয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও প্রধান প্রধান সার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। বিশে-ষতঃ এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় গোজাতি ও তত পরিশ্রম করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে বঙ্গ দেশে ভয়ঙ্কর গো-মড়ক উপস্থিত হয়। তাহাতে সহস্র সহস্র গো পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সার ও বিশ্রামাভাবে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইতেছে। গো কুল আহারাভাবে ও পীড়ায় দুর্ব্বল সুতরাং কঠিন পরিশ্রমে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও গো-কুলকে সবল করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাহা না করিলে আর গত্যন্তর নাই। উপরে যাহা উক্ত হইল তাহা অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হয় না। যে যে স্থলে লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সেই স্থলে উক্তরূপ ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানে লোক সংখ্যার সমতা নাই। মধ্য ভারত এক্ষণে লোকাভাবে ও বিনা আবাদে পতিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে মধ্য ভারত মহারাষ্ট্রীয় ও জাট্ দস্যুদিগের লীলানিকেতন ছিল। ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও উপদ্রব ও অরাজকতায় লোকশূন্য হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সেরূপ কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। সহৃদয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সমগ্র ভারতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। সুতরাং সেই সেই স্থলে লোক চালনা করিয়া বাস স্থাপন করিলে অন্নাভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু যেরূপ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাও তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। অবাধ বাণিজ্য বন্ধ না হউক নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। চাউল ও গম প্রভৃতি বিদেশে এত প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইতে থাকিলে অন্নকষ্ট কিছুতেই ঘুচিবে না।

দেশের অর্থশালী লোকদিগকে যৌথ কারবার করিয়া কল কারখানা খুলিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইবে। বিদেশে গমন করিয়া কল কারখানা সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায়

আজ এত উন্নতি কেন? ইংলণ্ড জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন কি প্রকারে? পাঠক, বোধ হয় বলিতে হইবে না যে ব্যবসা ও বাণিজ্য ইহার মূলীভূত কারণ। ইংলণ্ডের এত উন্নতির কারণ ব্যবসা। ভারতাধিকারের জন্য ইংলণ্ড হইতে বৃহৎ রণতরী আসে নাই। আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে একখানি ক্ষুদ্র পোত উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে ভারতোপকূলে আসিয়া লঙ্গর করিল। পোতারোহী কতিপয় মাত্র শ্বেত পুরুষ ভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে ভারত শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে ব্যবসার জন্য একখণ্ড ভূমি ভিক্ষা করিয়া লইল। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে কালে সেই শ্বেত পুরুষদিগের উত্তরাধিকারীগণ ভারতের একাধীশ্বর হইবেন।

এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীময় ইংলণ্ডের বাণিজ্যপোত দেখিতে পাইবেন। এই দেখিলেন যে তাহারা ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া বাণিজ্য তরী লইয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই দেখিতে পাইবেন তাহারা তুহিনাবৃত গ্রীণল্যাণ্ডের বরফরাশি বহু কষ্টে ভেদ করিয়া চলিয়াছে। এইরূপ অধ্যবসায়ী জাতির উন্নতি অনিবার্য্য; তাই আজ ইংলণ্ডের নিকট সকলেই নতশীর।

ভারতবাসিগণ! আর ঘুমাইলে চলিবে না। কুম্ভকর্ণের ন্যায় আর আর কতদিন ঘুমাইবে? এক্ষণে উঠ জাগ্রত হও। তোমাদের শিক্ষা গুরু জগতের আদর্শ ইংলণ্ডের অনুসরণ করিতে শিক্ষা কর। তোমাদের অন্নকষ্ট চলিয়া যাইবে। আবার ভারতের প্রাচীন গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীমঃ—

———

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

৪র্থ ভাগ। } চৈত্র, ১৩০৩ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

ফাগোৎসব।

বাসন্তী পূর্ণিমা, মাধুরীর সীমা, জগতে নাহিক যার।
শূন্যে জলে স্থলে, দশ দিগঞ্চলে, বহিছে প্রীতির ধার॥
পূর্ণ কলেবর, চারু সুধাকর, শশটি লইয়া কোলে।
প্রসন্ন বদনে মরত ভুবনে, জোছনা দিতেছে ঢেলে;
বাছিয়া বাছিয়া, তারাগুলি নিয়া, পেতেছে রসের হাট।
সারারাতি ধ'রে, গগণে বিহরে, জানে সে কতই ঠাট॥
ভাবেতে বিভোর, কৌতুকী চকোর, চাহিয়া চাঁদের পানে।
ছাঁকিয়া ছাকিয়া, সুধা আস্বাদিয়া, উড়িছে প্রফুল্ল প্রাণে॥
আহা কিবা ধীর, মলয় সমীর, গায়ে পরিমল ঢালা।
পত পত রবে, নাচায় পল্লবে, নাচায় তরঙ্গ-মালা॥
কেমন উদার, স্বভাব তাহার, ছোট বড় নাহি ভেদ।
দীন রুগ্ন পাপী, ছিন্ন, ভগ্ন, তাপী, কাহার রাখেনা খেদ॥
এ হেন রজনী, শঠ শিরোমণি, অমনি যেতে কি দেয়।
অর্দ্ধেক শর্ব্বরী, শয্যা পরিহরি, শ্রীহরি বাহিরে যায়।
দশদিকে শোভা, অতি মনোলোভা, নিরখি সরস মন।
করিতে কৌতুক, হইয়া উৎসুক, করিলেন আয়োজন॥
হয়ে কুতূহলী, মোহন মুরলি, অধরে যোজনা করি।
"রাধা" "রাধা" স্বরে, হরিষ অন্তরে, বাজান সঘনে হরি॥

কোকিল নিদ্রিত, চির পরিচিত, সে স্বর শুনিয়া ত্বরা।
চারু কুঞ্জবনে, মধুর কুজনে, ঢালিল সুধার ধারা॥
কাননে শিখিনী, সহ কুরঙ্গিনী, নাচিতে লাগিল সুখে।
যমুনার জল, আনন্দে বিহ্বল, বহিল উজান মুখে॥
ত্বরিতে তখন, মলয় পবন, ল'য়ে সে মধুর তান।
রাধিকার কানে, ঢালিল যতনে, জুড়াতে তাহার প্রাণ॥
মৃত সঞ্জিবনী, পরশে যেমনি, নির্জীব পরাণি পায়।
আছিল নিদ্রিতা রাজার দুহিতা, জাগিল অমনি তায়॥
বাহিরে আসিয়া, দেখিল চাহিয়া, তখন(ও) রজনী আছে।
ভাবে এ সময়, কেন রসময়, ডাকিছে যাইতে কাছে॥
ঘুমাতে ঘুমাতে, শুনিল কানেতে, যেন সে শ্যামের ডাক।
সত্য কি স্বপন, নাহি নিরূপন, কি জানি এ কোন পাক॥
ভাবিতে ভাবিতে, আবার শুনিতে, পাইল শ্যামের বাঁশি।
আনন্দে অধির, হইলা বাহির, অধরে ধরে না হাঁসি॥
শত পদ রাধা, না যাইতে বাধা, পড়িল বিষম জ্বালা।
খসিল কবরী, কটিতটে সাড়ী, আলুথালু রাজবালা॥
দক্ষিণ করেতে, কবরী বাঁচাতে, যতন করিল ধনি।
দিয়া বামকর, কটির উপর, ধরিল বসনখানি॥
এমত প্রকারে, হাত নিতে নারে, শিথিল আঁচল ঝোলে।
কিবা ক্ষতি তায়, তবু বামা ধায়, ক্ষীণ কটি ঘন দোলে॥
নর্ত্তকীর বেশ, দেখি হৃষীকেশ, হাঁসিয়া তখন কয়।
"অয়ি চারুশীলে, এ কবে শিখিলে, উর্ব্বশী করিলে জয়॥
হয়ে ম্রিয়মানা, কহে বরাননা, এ সব তোমারি কাজ।
এস ত্বরা করি, বাঁধসে কবরী, করোনা করোনা ব্যাজ॥
রসিক রতন, কহেন তখন, বেণী না বাঁধিতে জানি।
ছাড় বামকর, পরাব অম্বর, ইতে কি আছে লো হানি॥
কহেন কিশোরী, সে হবে না হরি, তোমারে চিনিত মোরা।
হরিতে বসন, কে আছে এমন, তুমি ত বসন চোরা॥

কহ বিবরণ, কি হেতু এখন, দাসীরে স্মরণ কর।
চ'খে নিদ্রা নাই, গিয়াছে বালাই, সারারাতি বনে ফের॥
আমরা ললনা, কোমল পরাণা, এ সব ভাল না বাসি।
আধ ঘুম চক্ষে, আসিয়াছি রেখে, শুনিয়া তোমার বাঁশি॥
"রাধা রাধা" বলি, সেধেছ কি বুলি, আমি না ছুটিতে
পরাণি ছোটে।
চঞ্চল চরণে, চলিতে এ বনে, চরণে কণ্টক ফোটে॥
নিজে ঘুমাবে না, ঘুমাতে দেবে না, এ তব কেমন রীতি।
পরের যাতনা, দেখিয়া দেখ না, আপন প্রীতিতে প্রীতি॥
কহে বনমালী, জানি তা সকলি, মন যে মানে না মানা।
যে হেতু স্মরণ, শুন তা এখন, অবধানে বরাননা॥
দেখ দেখি ফিরে, তমালের শিরে, কেমনি বিরাজে, চেয়ে।
একটি কোমল, পল্লব শ্যামল, মাধবী জড়িত হয়ে॥
পবন হিল্লোলে, মৃদু মৃদু দোলে, কৌমুদী মাখিয়া গায়।
দেখি ও মাধুরী, অমনি সুন্দরী, দুলিতে মানস যায়॥
রচিয়াছি দোলা, করিবারে খেলা, সহায় হওসে প্রিয়ে।
ব'স বামে আসি, লয়ে মৃদু হাসি, পদ'পরে পদ দিয়ে॥
ভুজগনিন্দিতা, দিয়ে ভুজলতা, মাধবী লতার মত।
ছাঁদি গ্রীবা মোর, আনন্দে বিভোর, দোলনে হওসে রত॥
শুনি বিনোদিনী আনন্দে তখনি, বসিলা শ্যামের বামে।
বিদ্যাধরগণ, পুষ্প বরিষণ, করিল গোকুল ধামে॥
পবন আসিয়া, যতন করিয়া, আপনি দুলা'য়ে দিল।
আঁখি ছিল যার, সে নব বাহার, কৌতুকে দেখিয়া নিল॥
সখিগণ আসি, প্রেমনীরে ভাসি, কুঙ্কুম ছড়ায় গায়।
রঙ্গিয়া কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল, কি শোভা হইল তায়॥
উচ্চচূড়া দোলে, মৃদুল হিল্লোলে, প্রেমে দোঁহে গলাগলি।
যত সখীগণ, ভরিয়া বদন, দিল সবে হুলাহুলি॥
দোলে বিশ্বনাথ, দেখিতে সাক্ষাৎ, আসিল অমরগণ।
এ বিষম লীলা, বুঝিতে নারিলা, বিস্ময়ে মোহিত মন॥

মুনীন্দ্রাদি যত, পরম ভকত, যোড় করে করে স্তুতিঃ।
"তুমি লীলাময়, অচ্যুত, অব্যয়, নিখিল জগৎপতি ॥
মায়া বিরচিয়া, আপনি ভুলিয়া, জগৎ ভুলাও হরি;
হাঁসি অশ্রুমাঝে, বল কোন্ কাজে, সদাই ভুলিয়া মরি ॥
কোথা হ'তে আসি, কোথা যাই ভাসি, ভাবিয়া মরি যে ত্রাসে।
ওহে দয়াময়, হইয়া সদয়, ভুলা(ই)ও না আর দাসে ॥

প্রাণের পিপাসা।

আমরা এক মহা অশান্তির রাজ্যে বাস করিতেছি যেথানে যাই সেই-থানে অশান্তি। জগতের উচ্চতম শৈলশৃঙ্গ হইতে অনন্ত বিশ্বব্যাপি-তরঙ্গ বিক্ষোভিত মহাসাগর পর্য্যন্ত অশান্তি সমভাবে বিরাজ করিতেছে, কোথাও শান্তি মিলিতেছে না। এ অশান্তিব কারন কি? আমি বলি পিপাসা এই অনন্ত অশান্তির কারণ। মানুষের সম্মুখে অনন্ত পিপাসা রহিয়াছে, একটী মিটিতে না মিটিতে আর একটী আসিয়া জুটিতেছে। অনন্ত বালুকাময়ী সাহারা মরুভূমের উপর দিয়া পথিক চলিয়াছে, মস্তকের উপর প্রখর সূর্য্য-তাপ নিম্নে প্রতপ্ত বালুকা—পিপাসায় প্রাণ আকুল—সুদূরে ওয়েসিস্ দেখিয়া সে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ছুটিয়াছে—ক্ষণিক পিপাসা নিবৃত্তি হইল বটে কিন্তু তাহার সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত মরুভূমি তাহার সহিত অনন্ত পিপাসাও চলিয়াছে শান্তিময় স্রোতস্বতী নীল নদ পৌছিতে এখনও অনেক বিলম্ব। মানুষের প্রাণের ভিতর—হৃদয়ের অভ্যন্তরেও ভীষণ মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে, তাহার কণ্ঠ বিশুষ্ক শান্তিবারির জন্য সে হাহাকার করিতেছে তাহার পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সে ছুটাছুটি করিতেছে কিন্তু হায় সে যে দিকে যাইতেছে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। তবে কি এ প্রাণের পিপাসা মিটিবে না? মিটিবে বৈ কি। যদিও তোমার পশ্চাতে মরুভূমি সম্মুখে অত্যুচ্চ শৈলমালা হিংস্র জন্তু সমাকুল ভয়ঙ্কর বৃহদারণ্য তত্রাপি নিরাশ হইও না—নিশ্চয় জানিও ঘোর তমসাবৃত অমানিশার পর জ্যোৎস্না-ময়ী পূর্ণিমা জগৎকে পুলকিত করিবে। জীবন পথে অনেক বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে কর্ষণাভাবে বহু কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে, কণ্টকে সমস্ত শরীর ক্ষত

বিক্ষত হইবে তত্রাচ পশ্চাৎপদ হইওনা অগ্রসর হও, ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া নির্ভয়ে চল শান্তি-নদীর তটে গিয়া উপনীত হইবে, তথায় তোমার প্রাণের পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। সেখানে আর মরুভূমির দৃশ্য তোমার নয়নপথে নিপতিত হইয়া তোমায় ব্যাকুল করিবে না, স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তুমি বিমুগ্ধ হইবে। ঐ দেখ কত লোক এই নদীর তীরে আসিবার জন্য বহির্গত হইয়া কুপথে গিয়া দিশাহারার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিছুতেই পথ না পাইয়া হতাশ্বাস হইতেছে। ঐ দেখ প্রাচীন ম্যাসিডনের দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার অসংখ্য সেনানী সমভিব্যাহারে কত শত রাজ্য বিধ্বংস করিয়া পৃথিবীকে নররক্তে প্লাবিত করত এ নদী লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছেন, কিন্তু তিনি কৈ? তিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াও এই নদী হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছেন, আর একটী পৃথিবী জয় করিবার জন্য পাইলেন না, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটিল না দেখিয়া অশ্রু মোচন দ্বারা পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিতেছেন। ঐ দেখ সামান্য ফরাসী যুবক বিপ্লবরূপ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাটিকা প্রশমিত করত তদ্দেশের নিয়ন্তা রূপে সমগ্র ইয়োরোপখণ্ড প্রকম্পিত করিয়া জীবনের শেষ দশায় স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। মহাসাগর মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে বন্দীরূপে দুঃখ, অশান্তিতে তাঁহার জীবনের শেষ নিশ্বাস নিপতিত হইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। নেপোলিয়ান স্বীয় পিপাসা নিবৃত্তির জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া লক্ষ লক্ষ মানবের রক্ত পান করিয়াছিলেন তথাপি পিপাসা মিটিল না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—শত শত নৃপতির রাজ মুকুট পদদলিত করিয়া চলিলেন তথাপি শান্তি পাইলেন না। আবার এদিকে নেত্রপাত কর, ঘোর অন্ধকার রজনী অর্দ্ধজগৎ সুষুপ্ত—দুগ্ধফেননিভ সুখসয্যা ত্যাগ করত ঐ দেখ কপিলবস্তুর রাজকুমার পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া শান্তিনদীর দিকে ছুটিয়াছেন, ঐ দেখ মার্ তাঁহাকে কত প্রলোভন দেখাইতেছে, তথাপি তিনি ধীর গম্ভির ও প্রশান্ত, তাঁহার প্রতিজ্ঞা অচল ও অটল কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার নহে—ভারতমহাসাগর সমগ্র ভারতবর্ষ এমন কি অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বতকে প্লাবিত করিয়া লইয়া যাইতে পারে তথাচ সিদ্ধার্থকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ বিচলিত করিতে পারিবে না, মার্ কত মনোমুগ্ধকারী স্তোতবাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া স্বীয়

রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে কিন্তু সিদ্ধার্থ স্থির প্রতিজ্ঞ তিনি বজ্রগম্ভীরস্বরে 'যাব্ আমার সম্মুখ হইতে দূর হ' বলিবামাত্র মার্ ধূলিকণার ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল। এই প্রকারে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত তিনি শান্তি নদীর তটে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রাণের পিপাসা নিবৃত্ত হইল বটে কিন্তু তাহাতেও তিনি পরিতৃপ্ত নহেন, তাঁহার কোটী কোটী মানব ভ্রাতা বিপথে গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না। তাহাবা পিপাসায় আকুল হইয়া রহিয়াছে সিদ্ধার্থ কি এমনই স্বার্থপর যে কেবল নিজে পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন? না কখনই নহে ঐ দেখ তিনি তাঁহাব ভ্রাতাদিগকে সুপথে আনিবার জন্য ছুটিয়াছেন ঐ শুন তিনি সকলকে আহ্বান কারয়া বলিতেছেন "এস ভাই আমি পথ প্রদর্শক আমার উপর নির্ভর করিয়া চল, আমি তোমাদিগকে শান্তিনদীর তীর দেখাইয়া দিব তথায় যাইলে তোমাদের পিপাসা মিটিবে। তোমরা শান্তি পাইবে।

আবার ঐ দেখ সূত্রধর পুত্র যীশু স্বীয় পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া জগৎবাসীকে পিপাসা মিটাইবার জন্য আহ্বান করিতে গিয়া স্বীয় জীবন হারাইলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন তথাপি তাঁহার বিকার নাই, রক্ত দর দর করিয়া পড়িতেছে কিন্তু তাঁহার বদন হাস্যময় ও প্রশান্ত তিনি ধীরে ধীরে উর্দ্ধে নেত্রপাত করিয়া ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা করুণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।" আজ সমগ্র সভ্যজগৎ তাঁহার পদপ্রান্তে সমাসীন। প্রাণের পিপাসা যদি পরিতৃপ্ত হয় তাহা হইলে শত শত নির্য্যাতন অম্লান বদনে সহ্য হয় যীশু তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

আর এক বার এই দিকে দৃষ্টিপাত কর। কি দেখিবে? ঐ দেখ চতুর্ব্বিংশতি বয়ঃক্রমে নিমাই পণ্ডিত গভীর রজনীতে পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া সংসারের মায়া মমতা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ছুটিয়াছেন ক্রমে তাঁহার পিপাসা নিবৃত্ত হইল। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদিগকে আকুল দেখিয়া সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। ঐ দেখ তিনি দুই বাহু প্রসারণ করিয়া বলিতেছেন "আয় ভাই আমার কোলে আয় আমি তোকে বুকে করিয়া শান্তিময়ের কাছে লইয়া যাইব তোর প্রাণের পিপাসা মিটিবে।" ঐ দেখ তাঁহার কথা শুনিয়া

মদমত্ত জগাই মাধাই তাঁহাকে কলসী ছুড়িয়া মারিল, তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই "মারলি যদি কলসী খানা তা বলে কি কোল দিব না" বলিয়া তিনি রুধিরাক্ত কলেবরে তাহাদিগকে কোলে লইবার জন্য ছুটিলেন। এবম্প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে গৃহে প্রেম বিলাইতে বিলাইতে বঙ্গদেশকে মাতাইয়া ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

জগতের প্রত্যেক লোক ভিন্ন ভিন্ন রূপ পিপাসায় আকুল। কেহ বা যশপিপাসা নিবৃত্তির জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে—সে চায় জগতের প্রশংসা সে দরিদ্রকে দান করে, লোকে দাতা বলিবে বলিয়া—সে বিপন্নকে সাহায্য করে, পরোপকারী বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইবার জন্য। জগতের অনেক লোকেই এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাহারা যশ কামনা করে তাহারা কেবল হাস্যাস্পদ হয় তাহাদের যশপিপাসা মিটে না। নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিয়া যাও যশ মিলিবে, জীবিত কালে যশঃসৌরভে জগৎকে আমোদিত না করিতে পার কিন্তু কে বলিতে পারে ভবিষ্যতে সুমহান যশোমন্দিরে সংস্থাপন পূর্ব্বক লোকে তোমায় পূজা করিবে না। কেহ বা সম্মান পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া এই ভবের হাটে সম্মান কিনিবার জন্য ঘুরিতেছে, এ হাটে অনেক ব্যাপারী নানারূপ দরদস্তর হইতেছে, কেহ বা দর শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে, কেহ বা যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া কিনিয়া এই হাটে মান বা টাইটেল্ কিনিতেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া 'রাজা' 'মহারাজা' K. C. S. I. প্রভৃতি উপাধি ক্রয় করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিতেছে। কিন্তু হায় জগতের লোক এই ক্রেতাদিগকে তাহাদিগের আশানুরূপ সম্মান প্রদান করে না সুতরাং ক্রেতাদিগের টাইটেল্ পিপাসা মিটিতেছে না। একটীতে সম্মান না পাইয়া আর একটী কিনিতে ব্যগ্র হইতেছে কিন্তু এ পিপাসা মিটিবার নয়। সম্মান পিপাসা মিটাইতে চাও তো শুন ঐ যে লক্ষ লক্ষ টাকা বৃথা অপব্যয় করিতেছে উহা দ্বারা জগতের কতই না হিত সাধন হইতে পারে। তুমি কি তোমার স্বদেশবাসী দরিদ্র দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কৃষক মণ্ডলীর আর্ত্তনাদ—তাহাদের গগনভেদী চিৎকার শুনিতে পাইতেছে না, তাহাদের হাহাকার ধ্বনি কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিতেছে না। যাও ভাই ঐ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তাহাদিগের সাহায্যার্থে প্রদান কর তুমি হৃদয়ে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে। ঐ লক্ষ লক্ষ লোক তোমাকে তাহাদের

হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া তোমায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা উপহার দিবে। তোমার প্রাণের পিপাসা প্রশমিত হইবে। অধুনাতন সময়ে আর একরূপ পিপাসা আসিয়া জুটিয়াছে। এখন ঘোর জীবন সংগ্রামের সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর শত শত গ্রাজুয়েট বাহির হইতেছে তাহাদের প্রাণের পিপাসা চাকুরী লাভ। এই জীবগণ অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার উপর চক্ষুর অবস্থা এতদূর শোচনীয় যে কৃত্রিম চক্ষু ব্যতীত এক পদ অগ্রসর হইবার যো নাই। তাহারা চাকুরী পিপাসায় হাহাকার করিতে করিতে ঘুরিতেছে কিন্তু প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অনেকেই বিফল মনোরথ হইয়া নিরাশ হইতেছে।

প্রত্যেক লোকেরই একটা না একটা প্রাণের পিপাসা আছেই। কেহ বা জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির জন্য অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিতে ব্যাপৃত, গ্যালিলিও, নিউটন্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। গ্যালিলিওর প্রাণের পিপাসা ইহ জগতে মিটিল না বটে কিন্তু যদি পরজন্ম থাকে, যদি ক্রমবিকাশ ও উন্নতিতে বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটিয়াছে। নিউটনেরও এ জগতে পিপাসা মিটে নাই। তিনি মুমূর্ষকালে বলিয়া গিয়াছেন "অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র আমার পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আমি কেবল মাত্র উপকূলে উপল খণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি" কিন্তু কে অস্বীকার করিবে যে তাঁহার প্রাণের পিপাসা পরজন্মে মিটে নাই ?

আর এক শ্রেণীর লোকও পিপাসায় আকুল। তাহারা স্বদেশ প্রেমিক। স্বদেশহিতব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা অম্লান বদনে কঠোর নির্য্যাতন এমন কি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের প্রাণের পিপাসা স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি সাধন। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়াসিংটান্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই শ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদের সকলের পিপাসা মিটিয়াছিল, ইঁহারা ইহজগতে স্বদেশের সৌধরাজির উপর স্বাধীনতার বিজয় নিশান উত্তোলিত দেখিয়া সুখে ও শান্তিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল স্বদেশ প্রেমিকের ভাগ্যে এ সুখ ঘটে না, বর্ত্তমান সময়ে কসুথ্ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে মনঃকষ্টে সম্প্রতি তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

তবে প্রকৃত প্রাণের পিপাসা কি? যাহা একবার পরিতৃপ্ত হইলে আর থাকে না। তাহা ধর্ম্মপিপাসা, ইহা সকলের সার। ধর্ম্মপিপাসা প্রবল হইলে সকল অন্ধকার দূর হইয়া যায়; তখন আলোক বিমণ্ডিত বর্ত্ম সাদরে আহ্বান করিয়া শান্তিনদীর তীরে লইয়া যায়। তাই বলি প্রকৃত ধর্ম্ম লাভের জন্য মন প্রাণ সমর্পণ কর, আমিত্ব ভুলিয়া যাও, নিষ্কাম ভাবে পরোপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তোমার পাপ, তাপ ঘুচিয়া যাইবে। পাপে তোমার কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়াছে, তুমি আকুল প্রাণে 'জল' 'জল' করিয়া চিৎকার করিতেছ, এই জগতের জল যতই পান করিতেছ, তোমার পিপাসাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। তোমার পিপাসা মিটিবার একমাত্র উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিলে তুমি চিরকালের জন্য অনুপম স্বর্গীয় শান্তি সুখ উপভোগ করিবে তোমার পিপাসাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কালের জন্য ঘুচিয়া যাইবে। ভাই একবার প্রাণ ভরিয়া হরিনামামৃত পান কর, তোমার সকল দুঃখ কষ্ট ঘুচিবে, তোমার প্রাণের পিপাসা মিটিবে।

দুগ্ধের গুণাগুণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ছাগ সকল ক্ষুদ্র শরীর; কটু, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করে, এবং অতি অল্প পরিমাণে জল পান করে বলিয়াই ইহার দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক।

মহিষ দুগ্ধ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

"মহিষীণাং গুরুতরং গব্যাং শীততরং পয়ঃ।
স্নেহান্ন্যূনমনিদ্রানামত্যগ্নিভ্যো হিতঞ্চ তৎ॥"

চরকের মতে—মহিষদুগ্ধ, গোদুগ্ধ হইতে শীতল এবং গুরু। মহিষদুগ্ধ গোদুগ্ধাপেক্ষা স্নেহপদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। যাহাদের নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে এই দুগ্ধ বিশেষ উপকারী। যাহাদের অত্যগ্নি, তাহাদের পক্ষেও ইহা হিতকারী।

"আবিকক্ষীরং ক্ষীরাণাং অপথ্যতমং।
আবিকক্ষীরং শ্লেষ্মপিত্তজনানাং॥"

মেষ-দুগ্ধ ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য—চরক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। চরকের মতে মেষক্ষীর ক্ষীরের মধ্যে অপথ্যতম; শ্লেষ্ম-পিত্ত-জনক যত পদার্থ আছে, তন্মধ্যে এই দুগ্ধই প্রধান। সুতরাং ইহার গুণের বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। হস্তী, উষ্ট্র এবং ঘোটকদুগ্ধ আমাদের দেশে বাহুল্যরূপে প্রচলিত নহে। আজকাল ডাক্তারেরা গর্দ্দভের দুগ্ধ বাহুল্যরূপে ব্যবহার করেন, সুতরাং তাহার গুণ এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য।

"উষ্ণং ঐকশফং বল্যং শাখাবাতহরং পয়ঃ।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং লবণানুরসং লঘু॥"

একশফ অর্থাৎ অশ্ব গর্দ্দভাদির দুগ্ধ উষ্ণ, বলকারী, হস্তপদাদির বাত-নাশক, মধুরাম্লরস, ঈষৎ লবণ-রসযুক্ত, লঘু।

দুগ্ধ-ব্যবহার প্রণালী।

"পয়োঽভিষ্যন্দি গুর্ব্বামং প্রায়শঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
তদেবোক্তং লঘুতরং অনভিষ্যন্দি বৈশৃতম্॥"

অপক্ক দুগ্ধ—বায়ু-পিত্ত-কফ, রস-রক্তাদি ধাতু, এবং স্রোত সকলের অত্যন্ত ক্লেদজনক, এবং পক্ক দুগ্ধ লঘুতর ও ক্লেদজনক নহে। সুতরাং পক্ক-দুগ্ধই ব্যবহার্য্য। কাঁচাদুগ্ধ গুরুপাকী বলিয়া শীঘ্র পরিপাক হয় না।

"ধারোষ্ণং গুণবৎক্ষীরং বিপরীতমতোঽন্যথা।"

ধারোষ্ণদুগ্ধ অত্যন্ত গুণকারী; দোহনকালীয় উষ্ণতা-রহিত হইলে, অর্থাৎ কাঁচা শীতল দুগ্ধ, অপকারী। মেডিকেল কলেজ হাস্পিটালে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা অপকারী দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। ডাক্তারেরা বলেন, কাঁচাদুগ্ধ কোষ্ঠ পরিষ্কারক। আয়ুর্ব্বেদবিদ্গণ বলেন, কাঁচাদুগ্ধ অজীর্ণকারী এবং সারক। যদি ডাক্তারগণ ধারোষ্ণ দুগ্ধ রোগীদিগকে পান করাইতে পারেন, তবে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

"ধারোষ্ণমমৃতোপমং॥"

বৃদ্ধ ... ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃত তুল্য।
... প্রতি তিনি ইহজ... ারী, সুতরাং উহা জ্বাল দিবে না।

দুগ্ধ অতিরিক্ত জ্বালে গুরুপাকী হয়। ঘনদুগ্ধ শরীরের পুষ্টিকারক।

"অনিষ্টগন্ধমম্লঞ্চ বিবর্ণং বিরসঞ্চ যৎ।
বর্জ্জ্যং সলবণং ক্ষীরং যচ্চ বিগ্রথিতং ভবেৎ॥"

যে দুগ্ধের গন্ধ সুখদ নহে, যাহার স্বাদ অম্ল এবং যাহা বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়াছে, সেই দুগ্ধ পরিত্যজ্য। দুগ্ধ লবণাক্ত এবং বিগ্রথিত (অর্থাৎ যাহা ডিম ডিম হইয়াছে) ব্যবহার্য্য নহে।

"প্রায়ঃ প্রাভাতিকং ক্ষীরং গুরু বিষ্টম্ভি শীতলং।
রাত্রৌ সোমগুণত্বাচ্চ ব্যায়ামাভাবতস্তথা॥"

রাত্রিকালের শীতলতা এবং গবাদির ব্যায়ামের অভাব বশতঃ, প্রাতঃকালের দুগ্ধ গুরুপাকী, মলস্তম্ভক (কোষ্ঠবদ্ধকারক) এবং শীতল।

"দিবাকরাভি তপ্তানাং ব্যায়ামানিলসেবনাৎ।
বাতানুলোমি শ্রান্তিঘ্নং চক্ষুষ্যং চাপরাহ্লিকং॥"

উহারা দিবসে সূর্য্যকিরণে বিচরণ করে। পরিশ্রম ও বায়ুসেবন করে বলিয়াই, অপরাহ্নের দুগ্ধ, বায়ুর অনুলোমকারী, শ্রমনাশক, চক্ষুর হিতকারী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাতের দুগ্ধ অপেক্ষা, অপরাহ্নের দুগ্ধ হিতকারী।

"গব্যং পূর্ব্বাহ্লিকালে স্যাদপরাহ্লে তু মাহিষং।
ক্ষীরং সশর্করং পথ্যং যদ্বা সাত্ম্যঞ্চ সর্ব্বদা॥"

গো-দুগ্ধ পূর্ব্বাহ্নে, এবং অপরাহ্নে মাহিষদুগ্ধ পান করা বিধেয়। সশর্কর দুগ্ধ পথ্য; অথবা যে দ্রব্যের সহিত সেবনে কোন ব্যাধি জন্মিতে পারে না, তৎসহ দুগ্ধ সেবনীয়।

"ক্ষীরং নভুঞ্জীতকদাপ্যতপ্তং।
তপ্তঞ্চনৈ তল্লবণেন সার্দ্ধং।
পিষ্টান্ন সন্ধানক মাষমুদ্গা।
কোষাতকী কন্দফলাদিকৈশ্চ॥"

কখনও অনুষ্ণ ক্ষীর পান করিবে না। উষ্ণ দুগ্ধ লবনের সহিত সেবন বিধেয় নহে। পিষ্টান্ন, কাঁজি, মাষকলায়, মুদ্গ, ঝিঙা, এবং মূলফলাদির সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

"তথাচ মৎস্য মাংস গুড় মুদ্গ মূলকৈঃ কুষ্ঠমাবহতি সেবিতং পয়ঃ।
শাকজাম্বব রসাদি সেবিতং মারয়ত্য বুধমাশু সর্পবৎ॥"

মৎস্য, মাংস, গুড়, মুগ ও মূলার সহিত দুগ্ধ সেবিত হইলে নিশ্চয়ই কুষ্ঠরোগ জন্মে। শাক এবং জামের রসের সহিত সেবন করিলে সর্পের ন্যায়, দুগ্ধ সেবনকারীকে নষ্ট করে।

"ক্ষীরং গবাজকাদের্মধুরং ক্ষারং নবপ্রসূতায়াঃ।
রুক্ষঞ্চ পিত্তদাহং করোতি চ রক্তাময়ং কুরুতে॥"

গো, অজাদির দুগ্ধ মধুর রস, নবপ্রসূতার দুগ্ধ ক্ষাররস, রুক্ষপিত্ত ও দাহজনক, সুতরাং নবপ্রসূতার দুগ্ধ পরিত্যাজ্য।

তোমারই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অনঙ্গ ঘরে আসিলে অমরেন্দ্র বলিল "আজ নৃগেনের ঘরে এত আমোদ কিসের?" অনঙ্গসুন্দরী কতক হাস্যে কতক বাক্যে মধ্যাহ্নের বিবরণ বলিল। অমরেন্দ্র শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিল, "ভায়া বুঝি কলেজ পালাতে আরম্ভ করেছেন। কিছু হবে না তাহার যোগাড় দেখছি।"

অনঙ্গ। তুমিও তো ও রকম কলেজ হইতে পালিয়া আসিতে। অমরেন্দ্র হাতে হাতে ধরা পড়িয়া একটু শান্ত হইয়া বলিল, "তা বটে সে সব কীর্ত্তির তুমিই মূল কিন্তু তাহাতে আমার লেখা পড়ার কোন অনিষ্ট হয় নাই।"

অনঙ্গ। ঠাকুর পোরও আমার মত একজন মূল আছে তোমার মন্দ হয় নাই তাহার মন্দ হবে! নিজের বুদ্ধিকে সকলেই মস্ত দেখে।

এমন সময় মধুমতী নিম্ন হইতে ডাকিল 'বৌ একবার নিচেয় এসতো, মা কি বলছেন শুনে যাও।'

অনঙ্গসুন্দরী দ্রুতবেগে নিম্নে চলিয়া গেল।

(৩)

দিনের পর দিন চলিয়া গেল—সংসার যেমন চলিতেছিল সেইরূপই চলিতে লাগিল—অমরেন্দ্র আফিস যায়, অনঙ্গ সেইরূপই কৌতুক ও আমো-

দে রত—মৃগেন্দ্র কলেজ যায়, লাবণ্য যেম্নি ক'নে বৌ তেম্নি আছে, বাহ্য দৃশ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু অলক্ষ্যে যে একটী গভীর অশান্তির স্রোত দুইটী হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না? মাসের পর মাস গত হইল কিন্তু তবুও লাবণ্যময়ীর লজ্জা গেল না। লজ্জাভি-ভূতা বালিকা এখনও হৃদয় খুলিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতে শিখিল না। ইহাতে মৃগেন্দ্রের বিরক্তি দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। মৃগেন্দ্রের জীবন এখন উৎসাহহীন, স্ফূর্ত্তিহীন ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট। কিন্তু অন্তরে যত দারুণ জ্বালা হউক না বাহিরে মৃগেন্দ্র তাহা প্রকাশ হইতে দিল না। লোকের কৃপাসম্ভূত সহানুভূতি সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। কিন্তু প্রশান্ত হৃদয়া রমনীর নয়নে আবরণ প্রদান করা অসম্ভব, এত হাস্য কৌতুক হর্ষ স্রুর মধ্যেও অনঙ্গসুন্দরীর কোমল হৃদয়তন্ত্রী একটু যেন বেসুরা বাজিতে যেন কোথায় একটা গুপ্ত তার ছিঁড়িয়াছে যেন হাস্যরহস্যের জীবনী শাকে কে হরণ করিয়া লইয়াছে। রাত্রির পর রাত্রি অনঙ্গ মৃগেন্দ্রের শয়ন কক্ষে "আড়ি পাতে" কিন্তু কোন শব্দই শুনিতে পায় না। দম্পতীর আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় কত কথা কত গল্প কত হাসি. কৈ তাহার একটু লক্ষণও তো অনঙ্গ দেখিতে পায় না। নিশীথে বহির্জগত নীরব মৃগেন্দ্রের শয়ন কক্ষও নীরব। অনঙ্গসুন্দরীর সন্দেহ ক্রমে গাঢ়তর হইল। লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করিলে সে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না, রমণীর সন্দেহ একবার উদ্রেক হইলে তাহা যতক্ষণ না দূরীভূত হইবে ততক্ষণ কোন উপায়ই অপরীক্ষিত রাখে না। অনঙ্গ মৃগেন্দ্রের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল। একদিন রহস্য-চ্ছলে মৃগেন্দ্রকে ইঙ্গিতে এই সম্বন্ধে দু একটা কথা বলিল মৃগেন্দ্র পড়াশুনার ওজর করিল। অনঙ্গ মনে মনে বলিল "সেতো অনেক দেখিয়াছি এখন আসল ব্যাপারখানা কি তাহা দেখা যাক।" আরো কিছু দিন গেল অনঙ্গ স্পষ্ট বুঝিল যে মৃগেন্দ্র ও লাবণ্যে যেমন হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। তখন অনঙ্গ মধুমতীকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। তার পর একদিন উভয়ে লাবণ্যকে ধরিয়া বসিল। উভয়ে অনেক ছলে কৌশলে কথার কথা বাহির করিয়া ভিতরের কিছু কিছু আভাস পাইল। আর একদিন অনঙ্গ-সুন্দরী মৃগেন্দ্রকে আটক করিল কিন্তু সেখানে বড় একটা কিছু হইল না কিন্তু অনঙ্গ পশ্চাৎপদ হইবার নহে। সে একদিন মৃগেন্দ্রের চাবি চুরি করিয়া.

তাহার বাক্স খুলিল, খাতাপত্র অনুসন্ধান করিল। একখানা দৈনিক বহি (Diary) পাইল, বহিখানি খুলিয়া পড়িল—হরি হরি এতদিনে সংশয় ঘুচিয়া গেল।

একি—"৩০শে ফাল্গুন—অসহ্য! অসহ্য!! অসহ্য!!! সারারাত একটীও কথা নাই। এত সাধিলাম এত মিষ্ট করিয়া বুঝাইলাম তবু একবার মুখ খুলিল না! একি লজ্জা! না মনের কিছু অন্যভাব! এমন পাড়াগেঁয়ে ন্যাকা স্ত্রীলোক দেখিনি তো! ছাইপাঁশ কিছু ভাল লাগিতেছে না। দূর হউক Diary লিখিতে আর ভাল লাগে না।"

আবার কয়েক তারিখ ফাঁক তারপর কোন এক তারিখে দুই একটা কথা মাত্র এইরূপে দুই মাসের ডায়েরী পূর্ণ হইয়াছে যেখানে যে দুএক কথা লেখা আছে তাহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে লেখকের অন্তরে বিষম বিরক্তি ও নৈরাশ্য বিরাজ করিতেছে।

আর এক তারিখ—"৬ই জ্যৈষ্ঠ, ষষ্ঠী—জামাই ষষ্ঠির তত্ত্ব আসিয়াছে এম্নি তখন রাগ হইয়াছিল আর একটু হলেই বৌয়ের কাছে ধরা পড়িতুম। প্রকাশ কখনই করিব না প্রাণের বেদনা প্রাণেই সব। মনে করিব আমার বিবাহ হয় নাই এই তো এতদিন কাটিয়া গিয়াছে তখন কটা লাবণ্য ছিল? ভাবি না কেন ও আমার কেউ নয়! তা কি আর ভাবিতে পারা যায় না খুব যায়!" রোজ নামচা পাঠ করায় একটু মৃদু ম্লান হাস্য রমণীদ্বয়ের বদনে বিকাশ হইল। অনঙ্গ দৈনিক বহি খানি পূর্ব্ববৎ বাক্সে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল।

মধুমতী বলিল, "তাইতো বৌ ভিতরে ২ এত কাণ্ড কিছুই তো বোঝা যায় নাই ভাই।"

অনঙ্গ। তাই তো দেখছি, ঠাকুরপোর রোজ লেখা দেখে দুঃখও হয় হাসিও পায়।

মধুমতী। ছোট বৌটা তো খুব ন্যাকা মেয়ে দেখছি! আমাদের সঙ্গে তো বেশ কথা কয় ছোট দাদার কাছে এত ন্যাকা সাজে কেন?

অনঙ্গ মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "ভাই সকলে কি আর তোমার মত বাসর ঘরে বরের সঙ্গে কথা কইতে পারে, তা দেখো দুদিন পরে আবার খৈ ফুটবে।"

(৪)

চিরদিন কখনই সমান যায় না, অশান্তির পর শান্তি দেখা দিল। একটী সামান্য কারণে দুইটী মন একটী হইল। পূর্ব্ব ঘটনার ৫।৬ মাস পরে একদিন মৃগেন্দ্র শয়ন কক্ষে একখানি কাগজ পাইল তাহাতে বড় অক্ষরে লেখা ছিল "স্বামী মেয়ে মানুষের দেবতা এ-কথা সবাই জানে তাকে কে ভক্তি করে না? আমার কথা কহিতে বড় লজ্জা হয় তাকে ভাল বাসি খুব ভাল বাসি সে রাগ করিলে আমার কষ্ট হয়" উক্ত লেখার পর খানিক ফাঁক পরে লেখা "লাবণ্য মৃগেন্দ্রচন্দ্র বসু" "লাবণ্য দাসী" মৃগেন মৃগেন মৃগেন মৃগেন ও লাবণ্য। মৃগেনের লাবণ্য। না তা নয় লাবণ্যের মৃগেন, আমি তোমারই তোমারই তোমারই।"

বীরবর চণ্ড।

মিবারাধিপতি রাণা লাক্ষ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন এক্ষণে জীবনের শেষ কয়দিন পরমার্থ চিন্তায় অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ তাহা কে খণ্ডন করিবে বল? রমণী রাজপুত হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা সেই দেবতার প্রতি অতি সামান্য শিষ্টাচারের অসদ্ভাব হইলে রাজপুতগণের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগে তাহাদের রোষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে তাহা নির্ব্বাণ করিতে কত শত রাজ্য বিধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? পূর্ব্বাপর না চিন্তা করিয়া রাণা লাক্ষ বিদ্রূপচ্ছলে এই শিষ্টাচারের সামান্য ব্যতিক্রম করায় রাজ্যের একটী চিরন্তন বিধির ব্যত্যয় হইল ও মহা অমঙ্গল হইয়াছিল। একদা রাণা লাক্ষ আমাত্য ও সামন্তবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজ সিংহাসনে সমাসীন আছেন, এমন সময় মারবারাধিপতি রণমল্লের নিকট হইতে রাজপুতদিগের রিত্যনুযায়ী বিবাহ সম্বন্ধ সূচক একটী 'নারিকেল' লইয়া একজন দূত উপস্থিত হইল। মহারাজ রণমল্ল যুবরাজ চণ্ডের সহিত স্বীয় দুহিতার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া ঐ 'নারিকেল' প্রেরণ করিয়াছিলেন। চণ্ড সে সময় রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। রাণা কথোপকথন করিতে করিতে উপহাসচ্ছলে বলি

শুশ্রু মর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন 'আমার বোধ হয় আমার ন্যায় শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের জন্য আপনারা এরূপ ক্রীড়ার দ্রব্য প্রেরণ করেন না।' রাণার এই পরিহাস শ্রবণে সভাস্থ সকলেই তাঁহার সুমধুর বাকপটুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতেছে এমন সময় চণ্ড তথায় উপনীত হইয়া, সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন। চণ্ডের হৃদয়ে একটী কূট চিন্তার উদয় হইল। চণ্ড ভাবিলেন যে যখন সে সম্বন্ধ পিতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার বলিয়া মনে করিয়াছেন তখন সে সম্বন্ধে বদ্ধ হওয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত কার্য্য। সুতরাং তিনি এই বিবাহে কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিলেন না। রাণা তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, অনেক উপদেশ দিলেন, অনুরোধ করিলেন, অবশেষে ভয় প্রদর্শনও করিলেন কিন্তু চণ্ড স্থিরপ্রতিজ্ঞ। রাণা পুত্রের আচরণে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন; যে পুত্রকে তিনি হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন, যাঁহাকে না দেখিলে তিনি এক দণ্ড স্থির থাকিতে পারেন না, যাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন, মনে করিয়াছিলেন সেই পুত্রের এবম্বিধ ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহাকে অতিশয় তিরস্কার করিতে লাগিলেন কিন্তু চণ্ডের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন 'আচ্ছা আমি মারবারাধিপতির দুহিতার পাণিগ্রহণ করিব কিন্তু তুমি শপথ কর যে সেই রমণীর গর্ভে যদি কোন পুত্রসন্তান প্রসূত হয় তাহা হইলে তোমাকে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে'। চণ্ড এই বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি স্থির ও গম্ভীর স্বরে ভগবান একলিঙ্গদেবের নামে শপথ করিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। পঞ্চাদশদ্বর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পরিণয় সম্পন্ন হইল, এই সম্মিলনের ফলে একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল, তাহার নাম হইল 'মকুলজী'। মকুলজীর বয়ঃক্রম যখন পঞ্চম বৎসর তখন রাণা লাক্ষ ৺গয়াধাম হইতে যবনদিগকে বিতাড়িত করিতে সমুদ্যত অন্যান্য রাজপুত নৃপতিগণের সহিত যোগদান করিয়া, স্বীয় জীবন ধর্ম্মযুদ্ধে বিসর্জ্জন করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। তিনি মিবার পরিত্যাগের পূর্ব্বে রাজকর্ম্ম পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করণোদ্দেশে চণ্ডকে আহ্বান করিয়া বলিলেন 'আমি যে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহা উদ্যাপন

করিয়া স্বদেশে জীবন লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব সে আশা নাই, তাহা হইলে মকুলের উপজীবিকার উপায় কি? কোন্ সম্পত্তি তাহার জন্য নির্দিষ্ট হইবে?" বীরবর চণ্ড ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "মিবারের রাজসিংহাসন"। ইহা বলিয়া চণ্ড নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মকুলের অভিষেকের মহা আয়োজন করিয়া, রাণা লাক্ষ মিবার পরিত্যাগের পূর্ব্বেই, অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন।

পঞ্চম বর্ষীয় বালক মকুল রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে পর, চণ্ড সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদান করিয়া, তাঁহার অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তিনি এই উদারতার প্রতিদানস্বরূপ মিবারের সর্ব্বোচ্চ মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করিলেন, ও দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

এরূপ উদারতা, এরূপ ত্যাগস্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। এই স্বার্থপর জগতে সকলেই স্বীয় স্বীয় স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত কিন্তু বীরবর চণ্ড জগতে যে নিঃস্বার্থ ত্যাগস্বীকার দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়, সামান্য মানবের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণরূপ অসম্ভব, চণ্ড নরাকারে দেবতা। পাঠক অন্য কোনও দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন না, জগতের আদিম সভ্যতার রঙ্গভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন এরূপ মহাত্মার আবির্ভাব সম্ভবে না।

চণ্ডের এই অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার সন্দর্শন করিয়া মিবারের আবালবৃদ্ধ-বণিতা তাঁহার যশোগানে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে মকুলজননীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি হিংসা ও বিদ্বেষের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া বীরবর চণ্ডের প্রতিকূলতাচরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

বীরবর চণ্ড যেরূপ দক্ষতার সহিত সরলভাবে শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন তাহাতে রাজমাতা কোনও রূপেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। চণ্ডের এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, তাহা মিবার রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন, সে বিষয়ে তিনি সং লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? রাজমাতা এক্ষণে পিশাচী

ও রাক্ষসীর রূপ ধারণ করিয়া চণ্ডের সদ্গুণরাশী—তাঁহার আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার বিস্মরণ হইলেন। অকৃতজ্ঞা রাজমাতা কোনও ছিদ্র অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে চণ্ডের নামে অপ্রকৃত গ্লানিকর বাক্য সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইহা চণ্ডের কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, তাঁহার পবিত্র ও সরল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল, তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। এরূপস্থলে তিনি মিবার রাজ্যে থাকা বিধেয় নহে বিবেচনা করিয়া, উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মান্দুরাজ্যে গমন করিয়া, তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। মান্দু-রাজ্যে গমন করিবার পূর্ব্বে, তিনি বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সরলভাবে সুমিষ্ট তিরস্কার করিয়া ধীর ভাবে বলিলেন 'আপনি ভুল বুঝিয়া-ছেন, মিবার রাজসিংহাসনে বসিবার আমার যদি ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে কে তাহা রোধ করিতে পারিত? কে আপনাকে রাজমাতা বলিয়া সম্বোধন করিত? সে যাহা হউক, আমি চিতোর পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। রাজ্য শাসনের ভার আপনার উপর রহিল; আপনার উপর এত লোকের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে চিতোরের মহা সর্ব্ব-নাশের দিন ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে; দেখিবেন যেন শিশোদীয় বংশের গৌরব অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট না হয়।" রাজমাতা এই বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, চণ্ড চলিয়া গেলেন, কোথায় রাজমাতা তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিতোরে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিবেন, তাহা না করিয়া, তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন বলিয়া সবিশেষ আনন্দিতা হইলেন। এই অকৃতজ্ঞতার ফল তাঁহাকে শীঘ্রই পাইতে হইবে।

চণ্ড মিবার পরিত্যাগ করিবার অনতিকাল পরে মারবারাধিপতি রণমল্ল মিবারে উপনীত হইলেন। তিনি স্বীয় দৌহিত্রকে ক্রোড়ে করিয়া রাজসিংহা-সনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি সমস্ত উচ্চপদ গুলিতে মারবারের আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি সেই চিতোরের সিংহাসনে বসিয়া কতই সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, মনে মনে কতই কল্পনা করিলেন, ক্রমে বাপ্পারাওলের সিংহা-সনের মায়ায় তিনি অভিভূত হইলেন—সে মায়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না। স্বীয় দৌহিত্রকে উপলক্ষ রাখিয়া শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, এখন

তাহাতেও মন উঠিল না, স্বয়ং চিতোরাধিপতি হইবার মানস করিলেন। সকলেই তাঁহার মনের ভাব বুঝিল কিন্তু কেহই তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। মকুলের শুভানুধ্যায়ী ধাত্রী এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া মকুলের জন্য অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইল। সে কিছুতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া মকুল জননীর নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিল। মকুল-জননী বুঝিলেন যে তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তিনি তাঁহার পিতার নিকট তাঁহার এবম্বিধ ব্যাবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গমন করিলেন, প্রত্যুত্তরে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা শুথাইয়া গেল, তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে তাঁহার প্রিয়তম তনয় মকুলের জীবন নাশ করিবার জন্য দুরাত্মা রণমল্ল উদ্যোগ করিতেছে। সেই সময় আবার শুনিলেন যে রাণালাক্ষের দ্বিতীয় পুত্র রঘুদেব ঐ দুরাচার কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। রাজমাতা আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। কি করিয়া প্রাণ কুমার মকুলের জীবন রক্ষা করিবেন সেই ভাবনায় অস্থির হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসঘাতক ছদ্মবেশী রণমল্লের অনুচরবর্গ ভ্রমণ করিতেছে, রাজমাতা কাহাকে বিশ্বাস করিবেন? তিনি স্বীয় পদে স্বয়ং কুঠারাঘাত করিয়াছেন তিনি স্বয়ং এই আসন্ন বিপদের জন্য দায়ী, ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, শত শত বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। আজ যদি চিতোরে বীরবর চণ্ড থাকিতেন, কাহার সাধ্য তাঁহার প্রাণের কুমার মকুলের কেশাগ্র স্পর্শ করে? তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

রাজমাতা কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না, যে দিকে যান সেইদিকে শত্রু—তাঁহার রাজপুরী এখন শত্রুপুরীতে পরিণত হইয়াছে। সকলেই পাপিষ্ঠ রণমল্লের বশীভূত, সকলেই তাঁহার বিপক্ষ, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মস্তক বিলোড়িত হইল। এমন কি কেহ নাই যে বাপ্পারাওলের বংশধরকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে? এমন কি কেহ নাই যে শিশোদীয় বংশের প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে পারে? কৈ চিতোরে তো এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। কাহার এমন সাধ্য যে রণমল্লের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়? যদিও অনেকের মনোগত ভাব অনুরূপ ছিল তথাপি প্রকাশ্যভাবে মকুলের অনুকূলতাচরণ করিতে কেহ সাহসী হইল না। রাজমাতার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে এক মহাত্মা আছেন যিনি ইচ্ছা

করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন। একমাত্র দেবোপম উদারচেতা বীরবর মহাত্মা চণ্ড তাঁহাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। চণ্ডের বিদায়কালীন বাক্যগুলি আবার তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন উহা বড়ই কর্কশ বোধ হইয়াছিল, এখন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে চলিল দেখিয়া তিনি নিদারুণ অনুতাপে বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চণ্ডকে সাহায্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। চণ্ড বিদেশে থাকিয়াও 'স্বর্গাদপী গরীয়সী' মাতৃভূমি চিতোরের বিষয় প্রত্যহ সংবাদ লইতেন, তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে তাঁহার সাহায্য ব্যতীত রাজমাতার উদ্ধারের উপায় নাই। সেই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। বিমাতার নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাঁহার সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন। বীরবর চণ্ড যখন চিতোর পরিত্যাগ করিয়া যান সে সময় দুই শত আহেরীয় পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত মান্দু নগরে গমন করিয়াছিল। এক্ষণে তিনি তাহাদিগকে চিতোর দুর্গ মধ্যে যাইতে আদেশ করিলেন, দ্বারপালগণ আহেরীয়দিগের উদ্দেশ্য বুঝিল না, মনে করিল পরিবারবর্গের সহিত তাহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। এদিকে বীরবর চণ্ড গোপনে রাজমাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তাঁহাদিগকে কৌশলক্রমে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া দেওয়ালীর দিন গোসুন্দপুরে আসিতে হইবে, না আসিলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এই আশ্বাস বাণি পাইয়া রাজমাতা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া, সদুপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি চণ্ডের উপদেশ প্রতিপালনে বিশেষরূপে যত্নবতী হইলেন ও 'দেওয়ালীর' দিন মকুল ও ধাত্রী সমেত গোসুন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। অদ্য কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, গাঢ় অন্ধকারে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল, তবু চণ্ডের দেখা নাই, সকলেই চিন্তাকুল হইলেন। অদূরে অশ্বের খুর নিঃসৃত ধ্বনি শ্রুত হইল, দেখিতে দেখিতে চল্লিশ জন অশ্বারোহী বীর পুরুষ সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন, সর্ব্বাগ্রে ছদ্মবেশী বীরবর চণ্ড। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা চিতোরের সিংহদ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন ও কৌশলক্রমে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দ্বারপালগণ মনে করিল রাজকুমার মকুল দেওয়ালী দেখিয়া অনুবর্গ সহ প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু যখন চণ্ডের অনুচরবর্গ দুর্গাভ্যা

প্রবেশ লাভের চেষ্টা পাইল তখন তাহাদের চৈতন্যের উদয় হইল। তখন ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। চণ্ড বজ্রগম্ভীরস্বরে অনুচরবর্গকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন, তাঁহার পরিচিত স্বর শ্রবণে তাঁহার অনুগত আহেরীগণ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বারপালদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। কার্য্যকুশল বীরবর চণ্ড দুর্গপতি ভট্টিসর্দ্দারকে আক্রমন করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিলেন কিন্তু দুর্গপতির বিক্ষিপ্ত তরবারীর আঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনি দ্বিগুণতর উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া সেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর অন্ধকার রজনীতে শত্রু বিনাশে রত হইলেন। হতভাগ্য রণমল্ল মদিরা ও অহিফেন সেবন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, হঠাৎ বিপৎপাতে স্তম্ভিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু এই অসংখ্য শত্রু সৈন্যের মধ্যে সে একা কি করিবে? একটী বন্দুক নিক্ষিপ্ত গুলি প্রহারে দুরাচার ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। চণ্ড এইরূপে চিতোর দুর্গ অধিকার করিয়া রাজমাতা ও তদীয় প্রাণকুমারকে তাহা অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

বহুকাল হইল চণ্ড ইহজগত হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণের বিষয় কেহ বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার নিঃস্বার্থ ত্যাগস্বীকার যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ জগতে প্রচারিত থাকিবে। ধন্য ভারতভূমি! তুমি রত্নগর্ভা, ভীষ্ম ও চণ্ডের ন্যায় সন্তান প্রসব করিয়া তুমি জগতে যে অতুল কীর্ত্তিরাশী সঞ্চয় করিয়াছ তাহা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে।

সিপাহী-বিদ্রোহের কাহিনী।

ইংরাজ আজ বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, আজ ভারতের গৌরবরবি অস্তমিত, পঞ্চবিংশতি কোটী ভারত সন্তান আজ ইংরাজের পদানত—কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে ইংরাজ এ হেন শক্তিমান? কোন্ অলৌকিক প্রভাবে আজ ইংরাজ, বীরপ্রসবিনী "সুজলাং সুফলাং" ভারত-মাতাকে অঙ্গুলিহেলনে শাসন করিতেছেন? কোন্ ক্ষমতাবলে আজ সুদূর ইংলণ্ডস্থিত মুষ্টিমেয় ব্রিটিসবাহিনী বীরদর্পে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেছে ও প্রতি পদে পদে ভারতসন্তানের মর্ম্মে মর্ম্মে ব্রিটীসের অতুল শক্তিমত্তার পরিচয় অঙ্কিত করিতেছে? দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই দুইশত বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে ইংরাজ কত সমররঙ্গে মাতিয়াছেন, কত ভূপতিকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, কত শত হোলকার, গোয়ালিয়ারকে ভুজবলে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়াছেন তাহাও দেখিবার প্রয়োজন নাই; সিপাহী-বিদ্রোহের সাময়িক দুই একটী ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—ইংরাজ কোন্ বলে আজ ভারতের অধীশ্বর।

মঙ্গল পাঁড়ে।

১৮৫৭ খৃঃ অঃ ২৯শে মার্চ্চ তারিখে ব্যারাকপুরের প্যারেড ভূমিতে বিদ্রোহ সংক্রান্ত একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। দীর্ঘাকৃতি, সুগঠিত উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সৈন্যেরা সমর সাজে সজ্জিত ছিল। ইহাদিগের পশ্চাতে বহুসংখ্যক সিপাহী একত্রিত হইয়াছিল, কেহ সশস্ত্র কেহ অস্ত্র বিহীন, কেহ রণসাজে, কেহ অন্য পরিচ্ছদে, কিন্তু সকলেই উৎসাহমদে মত্ত। ৩৪ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের প্রায় শত হস্ত দূরে মঙ্গল পাঁড়ে নামক জনৈক সিপাহী ইতস্ততঃ বীরগর্ব্বে বিচরণ করিতে-ছিল। মঙ্গল ভাঙ্ খাইয়া অর্দ্ধোন্মত্ত কিন্তু ধর্ম্মমদে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্থ। গাদা বন্দুকটা হস্তে লইয়া সে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে ও চীৎকার করিয়া বলি-তেছে "সকলে বাহির হও, ইংরাজ আমাদের বিরুদ্ধ, টোটার প্রচলন করিয়া আমাদের জাতিনাশের চেষ্টায় ইংরাজ দৃঢ়সংকল্প।" বৈদ্যুতিক বেগে মঙ্গলের

এই বাক্য সিপাহীগণের মধ্যে প্রচারিত হইল। উৎসাহে, ক্রোধে, দম্ভে প্রত্যেকের হৃদয়তন্ত্রী বীরনাদে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিতস্রোত বেগে প্রবাহিত হইল। দলে দলে অন্যান্য সিপাহী আসিয়া যোগদিল—এইবার তুমুল সংঘর্ষণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

সহসা তথায় কার্য্যদক্ষ ও সমরপটু সেনাপতি বাফ্ সাহেব (Lieutenant Baugh) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অশ্বারোহণে ঘটনাস্থলে আসিতেছিলেন, অশ্বের খুরধ্বনি শুনিয়া ও তাঁহার রণসাজ দেখিয়াই সিপাহীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিদ্রোহীর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয় হয় হইয়া উঠিল। মঙ্গল পাঁড়েও যোদ্ধা মন্দ নহে। সে বন্দুক হস্তে লইয়া বাফ্ সাহেবের পথ আটক করিল কিন্তু বাফ্ সাহেব পশ্চাৎপদ না হইয়া তাহার পুরবর্ত্তী হইলেন—সহসা বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আরোহী ও অশ্ব ভূমীশায়ি হইলেন—অশ্বটী আহত হইয়াছিল, বাফ্ অল্পই আঘাত পাইয়াছিলেন সুতরাং তিনি অতিকষ্টে উত্থিত হইয়া পিস্তল হস্তে মঙ্গলের দিকে ছুটিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে মঙ্গলের তরবারি আঘাতে ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। বাফ্‌কে অন্যায়রূপে হত্যা হইতে দেখিয়া একটী মুসলমান সিপাহী আর থাকিতে না পারিয়া মঙ্গলকে জড়াইয়া ধরিল। পুনর্ব্বার অশ্বের খুরধ্বনি শ্রুত হইল, আবার ইনি কে? ইনি অন্য একজন ইংরাজ সেনানী, ইনিও মঙ্গলের দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহীর প্রকোপ সহ্য করিতে পারিলেন না, ইনিও হত হইলেন।

সম্মুখে দুইটী ইংরাজ সেনানীকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া সিপাহীদের উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। ৩৪ সংখ্যক পদাতিক দল কয়েক পদ অগ্রসর হইল, দলস্থিত কয়েকটী সিপাহী "মড়া" ইংরাজ দুইটীকে "খাঁড়ার ঘা" দিতে ভুলিল না। ইতি মধ্যে কতিপয় ইংরাজ সেনানী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ৩৪ সংখ্যক রেজিমেণ্টের কর্ণেলও আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বিদ্রোহী মঙ্গলকে ধৃত করিবার নিমিত্ত নিজ রেজিমেণ্ট মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিলেন কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

মঙ্গল পাঁড়ের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিচলিত হইলেন, প্রাণে আতঙ্কের ছায়া পড়িল, তিনি মঙ্গল পাঁড়েকে ধৃত করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ

করিলেন, ব্রিগেডিয়ারকে আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার এই আচরণে সিপাহীদিগের স্পর্দ্ধা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল।

ইত্যবসরে সেনাপতি হিয়ার্সে (Brigadier General Hearsay) তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার দুইটী পুত্রও তাঁহার অনুগমন করিল, নিমেষের মধ্যে তিনি সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া লইলেন, ইংরাজের ধূল্যবলুণ্ঠিত মৃতদেহ দেখিলেন, ক্ষিপ্তপ্রায় সিপাহীদিগকে দেখিলেন, দুর্দ্দমনীয় বিদ্রোহী মঙ্গলের বিরাট মূর্ত্তিও দেখিলেন। —বীরদর্পে সম্মুখীন হইলেন, ও পুত্রকে বলিলেন "জন্—আমি যদ্যপি মরি তুমি যে কোনও উপায়ে হউক ইহাকে দমন করিতে ভুলিও না।" এই কথা বলিয়া হিয়ার্সে মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন, কিন্তু তিনি নিস্ফল হন নাই, সবেগে তাঁহার পিস্তল হইতে গুলি নির্গত হইয়া শত্রুশরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া আনন্দে শত্রুশোনিত পান করিল। কিন্তু আঘাত গুরুতর হয় নাই, মঙ্গল আত্ম হত্যা করিবার মানসে বন্দুক লইয়া নিজ শরীরে গুলি করিল কিন্তু কঠিন প্রাণ ইহাতেও বাহির হইল না, মঙ্গল ধৃত হইল, এই ঘটনার সাত দিন পরে তাহার ফাঁসি হইয়াছিল।

বিদ্রোহের কারণ।

এই বিদ্রোহের কারণ কি? সহসা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে কোথা হইতে প্রবল ঝড় আসিয়া সমুদ্রবক্ষ আলোড়ন করিল? কোথা হইতে একখানি কাল মেঘ আসিয়া পূর্ণ শশধরকে গ্রাস করিল? জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীকে অমানিশার ঘোর অন্ধকারে কে আবৃত করিল? অতুল শক্তি সম্পন্ন, স্থির, ধীর ব্রিটীস সাম্রাজ্যের মধ্যে কে এ হেন উত্তাল তরঙ্গ তুলিল? এলগিন্! বোধ হয় তোমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়! বুঝি এই সংঘর্ষণে বনিকবেশী ইংরাজকে ভারত ছাড়িতে হয়! বুঝিবা ইংরাজের আশালতা মুকুলিতা হইবার পূর্ব্বেই শুষ্ক হয়!! না, না, এখনও হ্যাভ্লক্, ক্লাইভ্, লরেন্স, আউটরাম জীবিত, এখনও "ব্রিটীস প্রেসটীজ" অটুট, অক্ষত।

১৮৫৭ খৃঃ অঃ ১০ই মে ইংরাজের কি দুর্দ্দিন! নানা ইতিবেত্তা বিদ্রোহ সম্বন্ধে নানা প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় কেহই সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু বৃথাই মনস্তাপ এপর্য্যন্ত থিউসিডিডিস্ কিম্বা নেপিয়ারের ন্যায় কেহ এই ঘটনা লিখিতে সক্ষম হইলেন না।

ট্রেভিলিয়ান্ কানপুরের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িতে পড়িতে যথার্থই রোমাঞ্চ হয় কিন্তু তিনি কেবল মাত্র এই বহুদিন-ব্যাপী বিদ্রোহের একটী মাত্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, অন্যান্য বিষয়ে কিছুই লেখেন নাই।

জাষ্টিন্ ম্যাকার্থি "Our Own Times" নামক পুস্তকে বিদ্রোহ সংক্রান্ত কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি এই সিপাহী বিদ্রোহ কে "A Struggle for Home Rule" বলিয়া মনে করেন। "It was not a mutiny like that at the Nore, it was a revolution like that in France at the end of the last Century. It was a 'national and religious' war, arising of the many races of India against the all conquering Saxon. The native princes were in it as well as the native soldiers."

কিন্তু এ কারণ গুলি সর্বাংশে ঠিক নহে। কেবল মাত্র একটী প্রদেশেই বিদ্রোহানল প্রবল বেগে প্রজ্জলিত হইয়াছিল এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কেবলমাত্র দুই জন ইহার সহায়তা করিয়াছিলেন, নানাসাহেব ও ঝান্সীর রাণী। পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা প্রায়ই শান্তমূর্ত্তি ছিল। বিদ্রোহের সময়ে ভারতবর্ষে ৩৮,০০০ মাত্র ইংরাজ সৈন্য ছিল। বাস্তবিকই যদি সমগ্র ভারতবাসী বিদ্রোহী হইত তাহা হইলে মুষ্টিমেয় ইংরাজের পরিত্রাণ কি অসম্ভব হইত না?

বিদ্রোহ সংক্রান্ত কয়েকটী কারণ একটু মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলায় দেশীয় সৈনিকগণের মধ্যে আদৌ শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম ছিল না, দেশীয় সৈন্যেরা একটু স্বাধীনতা পাইলেই অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করিত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ও রাজপুত। জাতিগত গর্ব্বে তাহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই স্ফীত, আত্মাভিমানে ও মূর্খতায় হৃদয় পরিপূর্ণ। তাহাদের ধারণাছিল ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা কেবল মাত্র ১০০,০০০। যখন বিদ্রোহ দমনার্থে হাইল্যাণ্ডারেরা এদেশে আসিয়াছিল, তখন সকলে কানাকানি করিয়াছিল যে বিলাতে আর পুরুষ নাই, এইবারে মেয়েরা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। এই সকল ধারণা যাহাদের হৃদয়ে স্থান

পায় তাহারা যে "টোটা কাটার" জনরবে জাতি নাশের আশঙ্কায় বিদ্রোহী হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? সর্ব্বদা দম্ভ, অহঙ্কার, মূর্খতা ও কুসংস্কার যাহাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছে তাহারা যে ইংরাজ "টোটা কাটাইয়া" তাহাদের জাতি নাশের ব্যবস্থা করিতেছেন এই সংবাদে বিচলিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কু-বাতাস।

যে সমুদায় দেশীয় সৈন্যেরা ব্রিটীস গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল যাহাদের অন্তরে মূর্খতা, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে ক্রমশঃ একটী কুবাতাস বহিল। ব্রাহ্মণ সৈনিকদিগের কৌশলে জাতি নাশ করিবার জন্য চর্বি দিয়া গভর্ণমেণ্ট টোটা প্রস্তুত করিয়াছেন, ময়দার সঙ্গে মানুষের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছেন—এবং ইংলণ্ডেশ্বরী আজ্ঞা দিয়াছেন যে সমস্ত লোক ক্রিমিয়ার যুদ্ধে হত হইয়াছে তাহাদের বিধবা স্ত্রীদিগকে বলপূর্ব্বক সিপাহীদিগের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে, সকল সেনানিবাসেই উক্তরূপ মিথ্যা জনরব উঠিল। রাজ্যচ্যুত দুই একটী রাজাও এই জনরবানলে ঘৃত নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা সিপাহীদিগকে বুঝাইলেন যে তাহাদের বাহুবলেই ইংরাজ ভারত জয় করিয়াছেন, অতএব উপস্থিত ক্ষেত্রে সিপাহীরা কেন সেই ভারত সাম্রাজ্য ইংরাজের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং শাসন না করে?

৩১শে মে সিপাহী-বিদ্রোহের দিনধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজের সৌভাগ্যবশতঃ মিরাটে ধার্য্যদিনের পূর্ব্বেই সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল—যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনার অবতারণা হইত।

বর্ত্তমান সময়ে এখানে ব্রিটীস সৈন্য সংখ্যায় ৭৪,০০০ এবং সিপাহীর সংখ্যা ১,৫০০০০, কিন্তু ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে কেবল মাত্র ভারতে ৩৮,০০০ ইংরাজ সৈন্য ছিল এবং সিপাহীরা প্রায় ২০০,০০০ এবং অধিকাংশ কামানই তাহাদের হস্তে। ধরিতে গেলে বাঙ্গালায় ব্রিটীস সেনা ছিল না, অধিকাংশই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তসীমা রক্ষায় নিযুক্ত। বেনারস, এলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি বড় বড় নগরেও ইংরাজ সৈন্য ছিল না। সমগ্র আউদ

প্রদেশে কেবল মাত্র একটী "British battery of artillery" ছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোষাগার, অস্ত্রাগার ও সকল রাস্তাই সিপাহীদের হস্তে ছিল। মিরাট হইতে দানাপুর পর্য্যন্ত এই ১২০০ মাইলের মধ্যে কেবল অতি সামান্য দুইটী ব্রিটীস রেজিমেণ্ট ছিল সুতরাং বিদ্রোহ দমনার্থে ইংরাজ রাজকে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

বিদ্রোহের বিভিন্ন অবস্থা।

লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও দিল্লীতেই বিদ্রোহানল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। "অবস্থা" সম্বন্ধে বিচার করিলেও আমরা ইহার তনটী অবস্থা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, মে হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত যখন মিরাটে সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহী হয়, এই কয়েক মাসই সিপাহী-বিদ্রোহ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, ইহাকেই ইংরাজিতে "Heroic Stage" বলে। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে নূতন সৈন্য আনয়ন করিতে হয় নাই, এই সময়ে কানপুরে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু ব্রিটীস সৈন্য অকুত সাহসে সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া দিল্লী দখল করিল, কানপুর হত্যাকাণ্ডের যথাযথ শাস্তিবিধান করিল এবং এই সময় হ্যাভ্‌লক্‌ লক্ষ্ণৌ দখল করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

১৮৫৭ খৃঃ অঃ অক্টোবরের প্রারম্ভ হইতে ১৮৫৮ খৃঃ অঃ মার্চ্চ বিদ্রোহের "দ্বিতীয় অবস্থা" এই সময়ের মধ্যে বিদ্রোহ দমনার্থে ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আসিয়াছিল, এবং কলিন্‌ ক্যাম্প্‌বেল্‌ লক্ষ্ণৌ দখল করিয়া বিদ্রোহ এক প্রকার দমন করিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অঃ শেষভাগ পর্য্যন্ত বিদ্রোহের "তৃতীয় অবস্থা" এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহ দমন হইয়াছিল।

বিদ্রোহ দমনে ব্রিটীস সিংহ যেরূপ কৌশলপূর্ণ শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ইহা দেখিয়াই কর্ণেল হড্‌সন বলিয়াছিলেন "A nation which could conquer a country like the Punjab with a Hindoostanee army, then turn the energies of the conquered Sikhs to subdue the very army by which they were tamed; which could fight out a position like Peshawar for years in

[illegible] teeth of the Afghan tribes, and [illegible], when suddenly deprived of the regiments which effected this, could unhesitatingly employ those very tribes to disarm and quell those regiments when in mutiny—a nation which could do this is destined indeed to rule the world!"

যে [illegible] পঞ্জাবের ন্যায় বীর প্রসবিনী প্রদেশ সিপাহী সৈন্য দ্বারা জয় করিয়া, পুনর্বার সেই পরাজিত শিখদিগকে লইয়া সিপাহীদিগকে দমন করিয়াছিল, যে জাতি দুর্দ্ধর্ষ আফগানদিগের সুতীব্র ভ্রূভঙ্গি, অসীম অত্যাচার বহুবৎসর ধরিয়া সহ্য করিয়াও পেশওয়ার পরিত্যাগ করে নাই, এবং যে সকল সৈন্যের সাহায্যে পেশওয়ার দখলে রাখিয়াছিল তাহারাই যৎকালে বিশ্বাসঘাতাচরণ করিল তখন আবার সেই আফগানদিগকে লইয়াই যে জাতি বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহারা যে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত ইহা আর বিচিত্র কি?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

The Calcutta Monthly. Vol. II, No. 2 Feb.—কলিকাতা Mahomedan Sporting Club হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকা পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এই পত্রিকা খানি মুসলমান সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ঐ সম্প্রদায়েরই উহা এক খানি মুখপত্র। ইহার লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য অনেক হিন্দু যুবকও আছেন। হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্যের দিনে এইরূপ পত্রিকা প্রকাশ করিয়া মুসলমান সমিতি সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সখা ও সাথী। সাথীর সহিত সখা মিলিত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বালকবালিকাগণের উপযোগী এরূপ সুখপাঠ্য পত্রিকা আর নাই।

সমাজ ও সাহিত্য। মাসিক পত্র ও সমালোচন। এই নবপ্রকাশিত পত্রিকাখানি স্থায়ী হইলে আমরা সুখী হইব।